একটুকু বাসা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

EKTUKU BASA

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ বিজন ভট্টাচার্য

মতার্দ কলাম প্রকাশিত এই লেখকের

সাধ সংখ স্বপ্ন

একটুকু বাসা

অনেকদিন ধরেই কথা হচ্ছিল। দীপালি প্রায় বলে, 'এস একদিন আমাদের বাড়িতে, সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে।'

প্রভাস সকৌতুকে তার অফিসের কলীগের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'অচেনা জায়গায় অচেনা লোকজনের মধ্যে আমি কথা বলতে পারিনে।'

দীপালি বলে, 'বাব্বা, তুমি আবার কথা বলতে পারো না। কত লোকের সঙ্গে তোমার কত আলাপ। রিক্রিয়েশন ক্লাবের সেক্রেটারী তুমি। কত শিল্পী সাহিত্যিকের সঙ্গে তোমার পরিচয়।'

প্রভাস বলে, 'বাধ্য হয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ-টালাপ রাখতে হয়। নইলে আমি তেমন সামাজিক নই, ঘরকুনো।'

নিজের অন্য একটি রূপ দীপালির কাছে তুলে ধরে প্রভাস। এটা একেবারে যে মিথ্যা কথা তা তো নয়। সব মানুষই কোন কোন মুহূর্তে নিঃসঙ্গতা ভালবাসে, নিঃসঙ্গ হয়েও।

প্রভাস দত্তের অবশ্য সঙ্গীর অভাব নেই। একান্নবর্তী পরিবারে বাপ মা ভাইবোনদের নিয়ে সে বাস করে। অফিসেও ছোট বড় অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ পরিচয় আছে। রিক্রিয়েশন ক্লাবের অন্তত গোটা ছয়েক করে ফাংশান হয় বছরে। পাবলিক স্টেজ ভাড়া নিয়ে একটা করে নাটক প্রতি বছরেই তারা অভিনয় করে। সবই প্রভাসের তত্ত্বাবধানে হয়। এছাড়া অফিসের ইউনিয়নের সে একজন পাণ্ডা। এক্জিকিউটিভ কমিটির সদস্য। সবাই তাকে চতুর বুদ্ধিমান বলে জানে। নিরীহ ভাল মানুষ ধরনের ছেলে সে মোটেই নয়। তবে পারতপক্ষে কারো অনিষ্ট সে করে না, উপকারই করে। অফিসে মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে সবার সঙ্গেই তার মেলামেশা আছে। সরকারী অফিস সত্ত্বেও তাদের ডিপার্টমেণ্টে সে অনেক রীতিনীতির পরিবর্তন করে ফেলেছে। প্রবীণ সহকর্মীদের সে দাদা বলে ডাকে, অবশ্য সেই সঙ্গে নামটি জুড়ে

দেয়। মেয়েদের মধ্যে যাঁরা বয়সে বড় তাঁদের নাম ধরে দিদি বলে ডাকে। আর যারা সমবয়সী কি কম বয়সী তাদের নাম ধরেই ডাকে প্রভাস। তার ডাকবার ভঙ্গিতে এমন একটা সহজ অন্তরঙ্গতার সুর থাকে যে কেউ কিছু মনে করতে পারে না।
মেয়ে পুরুষ সবার সঙ্গেই তার সৌহৃদ্যের সম্পর্ক, বিশেষ করে সমবয়সী কি কমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেই তাকে আপন মনে করে। যেন প্রত্যেকের সঙ্গেই তার গভীর অন্তরঙ্গতা। প্রভাস নিজে জানে এবং তার দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও জানে। সত্যিই তো কেউ আর 'বসুধৈব কুটুম্বকম' হতে পারে না। বন্ধু নির্বাচনে যাচাই বাছাই করতেই হয়। তবে আর পাঁচজনের সঙ্গে সৌজন্য ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে হয়।
আরো পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে প্রভাসের যেমন ভদ্রতার সম্পর্ক দীপালির সঙ্গেও তাই। কিন্তু দীপালি যেন তাকে একটু বিশেষ চোখে যেন বিশেষ ধরণের অন্তরঙ্গ মনে করে। এই নিয়ে দীপালির আড়ালে আবডালে রঙ্গকৌতুকও কম হয় না।
বিজন মল্লিক প্রভাসের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে বলে, 'ও হে দত্ত, ব্যাপারটা কি বল দেখি।'
প্রভাস হেসে বলে, 'কিসের ব্যাপার ?'
বিজন বলে, 'মিস দত্তের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা যেন ক্রমেই বাড়ছে।'
প্রভাসও হাসে, 'ও দীপালিদির কথা বলছ ? তোমার হিংসা হচ্ছে বুঝি ?'
দীপালি দেখতে সুন্দরী নয়। স্বভাব খুবই সরল। বয়স পঁয়ত্রিশ হবে। স্বাস্থ্য তেমন ভাল না। হজমের গোলমাল আছে। দীপালিকে যে চিরকুমারী থাকতে হবে এটা প্রায় স্হির। অফিসে আরো কয়েকটি মেয়ে অবশ্য আছে। কেউ কেউ বিয়ের পরেও অফিসে নিয়মিত আসছে। দু-একজন সিঁথিতে সিঁদুর পরবার পর ফেরেনি।
দীপালির সম্বন্ধে সহকর্মীদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। আবার আড়ালে আবডালে হাসিঠাট্টাও তাকে নিয়ে হয়। যাকে মানুষ ভালবাসে তাকে নিয়ে কি আর রঙ্গ কৌতুক করে না ?

প্রভাস বলে, 'বড় মুশকিলে পড়েছি। দীপালিদি ওঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছেন।'

বিজন বলে, 'লক্ষণ তো ভাল নয়। আমি লক্ষ্য করেছি তোমার প্রত্যেকটি ফাংশানে দীপালিদি উপস্থিত থাকে। তুমি যখন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আর্টিস্টদের নাম ঘোষণা করতে থাক, কি সেক্রেটারীর ভাষণ দাও, দীপালিদি খুব মনোযোগ দিয়ে তোমার বক্তৃতা শোনে, তার চোখ দুটিও নিস্ক্রিয় থাকে না। অপলকে একখানি মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।'

প্রভাস লজ্জিত হবার ভঙ্গি করে বলে, 'কী যে বলেন, দীপালিদি আমার চেয়ে অন্তত বয়সে পাঁচ-ছয় বছরের বড়।'

ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেণ্টের সুবোধ হালদার জবাব দেয়, 'স্নেহ প্রীতি ভালবাসা কি অঙ্কের হিসাবে আসে, না অঙ্কের হিসাবে যায় প্রভাস ?'

বিজন বলে, 'ব্যাপারটা তা নয়। দীপালিদির নিজের স্বয়ম্বরা হবার মতলব নেই। তবে কয়েকটি কালো কালো বোন আর ভাইঝি আছে শুনেছি। আমাদের প্রভাস দত্তর কাঁধ তো খুব চওড়া। ওই কাঁধে একজনকে গছিয়ে দেওয়ার সদিচ্ছা থাকলেও থাকতে পারে।'

সহকর্মীদের মধ্যে প্রভাস একাই যে অবিবাহিত যুবক তা নয়, সলিল অজয় নির্মলরাও আছে। তবু যাদের অনূঢ়া মেয়ে ভাইঝি ভাগ্নী কি বোন আছে এমন সব প্রবীণ সহকর্মীর লক্ষ্য প্রভাসের দিকেই।

প্রভাস দেখতে মোটামুটি সুপুরুষ। ফর্সা রং, ছিপছিপে লম্বা চেহারা। বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালই। মানুষ হিসাবে প্রভাস সামাজিক সদালাপী কিন্তু বিয়ের দিকে এখনো তেমন যেন কোন ঝোঁক নেই প্রভাসের। তা ছাড়া ভিতরে ভিতরে ওর পছন্দ অপছন্দ বড় কড়া। তাই অনেকে যেমন তার দিকে নজর রেখে-ছিলেন তেমনি চোখ ফিরিয়েও নিয়েছেন। মেয়ের বাপরা তার সম্বন্ধে কি ভাবেন কি মন্তব্য করেন তাও কিছু কিছু কানে গেছে প্রভাসের। তাদের ধারণা প্রভাসের পাত্রী ঠিক হয়েই আছে।

সেইজন্যেই বিয়ের প্রস্তাবে সে এত নিস্পৃহ।
আসল ব্যাপারটা প্রভাস নিজে জানে। রীণাই তার মনে প্রণয় আর পরিণয় সম্বন্ধে এমন বীতস্পৃহা এনে দিয়েছে। চার পাঁচ বছর ধরে মন জানাজানির পর প্রভাস দেখতে পেল রীণার মনের খবর সে একেবারেই জানে না। অর্থসম্পদ গাড়ি বাড়ির দিকেই তার আকর্ষণ। বাবা মা'র দোহাই দিয়ে সে একটি বিত্তবান ছেলেকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছে।
দুঃখ লজ্জা অপমানে প্রভাস কিছুদিন মুষড়ে পড়েছিল ঠিকই। আবার সামলেও উঠেছে। ভেবে দেখেছে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে রীণার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। বরং নিজের সময় সামর্থ্য এবং মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলবে। তাই সে অফিসের কাজ ছাড়াও ক্লাবের কাজকর্মে আরো বেশি মনোযোগ দিয়েছে। রিক্রিয়েশন ক্লাবের লাইব্রেরী আছে ম্যাগাজিন আছে আলোচনাচক্র রিহার্সেল আছে। কাজের অভাব নেই। কিন্তু মেয়েদের ওপর একটা ঘৃণা আর বিদ্রূপের মনোভাব যেন স্হায়ী হয়ে গেছে প্রভাসের মনে। যত কাজকর্মই করুক একটি ক্ষতচিহ্নের কথা প্রভাস কিছুতেই ভুলতে পারে না। সে যেন কাজ দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। অনেকসময় ভুলে থাকেও। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন কষ্টের সীমা থাকে না।
মনের এই অবস্হা সত্ত্বেও বাবা মা তাকে বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করেছেন। ছোট বোন ছন্দাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।
ছন্দা বলে, 'দাদা, 'তুমি যদি সেই কারণে বিয়ে করব না বলে প্রতিজ্ঞা করে থাক তাহলে তোমার পক্ষে সেটা একটা বড় ডিফিট।'
প্রভাস চটে ওঠে, 'আমি কেন বিয়ে করব না ঠিক করেছি তা তুই জানিস ?
ছন্দা শান্তভাবে বলে, 'দাদা, বাড়ির সবাই তা জানে। আমাদের চেনাজানার মধ্যে কারোরই তা জানতে বাকি নেই। মুখে বলে না তাই।'
প্রভাস বলে, 'জানে তো জানুক, আমার তাতে কিছু এসে যায় না।'

তবু নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধের প্রস্তাব আসে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাবা মা আলাপ আলোচনা চালিয়ে যান। মেয়ে দেখার পালাও চলে। প্রভাস নিজে ক্বচিৎ কখনো দেখতে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাবা মা'র পছন্দ হয় না, কি ছন্দার মনঃপূত হয় না। দু-একটি ক্ষেত্রে মা কি ছন্দার পীড়াপীড়িতে দেখতে যেতে হয়। তারপর হতাশ হয়ে ফিরে আসে।
মা রাগ করে বলেন, 'তুই ইচ্ছা করে সবাইকে অপছন্দ করছিস। এ তোর একটা জেদ।'
প্রভাস জবাব দেয়, 'তোমাদেরও তো জেদ কম নয়। পছন্দ না হলেও আমার কাউকে পছন্দ করতে হবে?'
মা বলেন, 'কী করে তুই পছন্দ করবি বল। আমি তো সবই বুঝি। সেই একজনের মুখ তোর চোখের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। তুই আর কোন মুখকেই সুন্দর দেখতে পারিসনে।'
যাকে আজ প্রভাস চূড়ান্তভাবে ঘৃণা করে তার সম্পর্কে অনুরাগের কথা শোনায় মা'র ওপরও তার ঘৃণার সীমা থাকে না। তার মনে হয় অতীতের দুর্বলতার ইঙ্গিত দিয়ে পরিবারের সকলেই তাকে অপমান করতে চায়।
তারপর কিছুদিন ধরে বিয়ের প্রসঙ্গ আর ওঠে না। প্রভাসের ওপব সবাই যেমন বিরক্ত হয়ে রয়েছে সে নিজেও তেমনি কম উত্যক্ত হয়নি।

নতুন নাটকের রিহার্সেলের ব্যাপারে প্রভাস সেদিন গিয়েছিল বেলগাছিয়ায় সুলতা মজুমদারের কাছে। অভিনেত্রী সুলতা মজুমদার। অ্যামেচার ক্লাবের থিয়েটারে অভিনয় করে, প্রভাসদের অফিস ক্লাবেও দু-একবার অভিনয় করেছে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেই সে এসেছিল। কিন্তু ওদের বাড়িতে এসে দেখল সুলতা বেরিয়ে গেছে।
সুলতার মা কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। ফিল্ম ডিরেক্টর শ্যামল সিকদার এসেছিলেন। নতুন কি একটা ছবি করছেন তিনি। ডেকে নিয়ে গেলেন। আমাকে সুলতা সব বলে

গেছে। কালই আপনার সঙ্গে নিজে দেখা করবে।'

প্রভাস ফিরে যেতে যেতে ভাবল অফিস ক্লাবের সেক্রেটারীর চেয়ে ফিল্ম ডিরেক্টরের দাবি নিশ্চয়ই বড়। সেখানে প্রাপ্তিযোগও বেশি। সুলতাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবু মনটা অপ্রসন্ন হয়ে গেল প্রভাসের। সেই ভবানীপুর থেকে এসেছে। মিছামিছি আজ সারা সকালটাই নষ্ট হল।

হঠাৎ প্রভাসের মনে পড়ল এই পাড়াতেই দীপালিদিরা থাকেন। একবার গেলে হয় খোঁজ নিতে। অনেকদিন ধরেই বলে আসছেন দীপালিদি। একবার গিয়ে দেখে এলে হয় কোন্ রত্ন আছে তাঁর ঘরে। কেন এত আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ।

পকেটের নোট বই বার করে ঠিকানাটা একবার দেখে নিল প্রভাস। অন্তত এই একটা বিষয়ে সে খুব মেথডিক্যাল। সামান্য পরিচিত ব্যক্তিরও নাম ঠিকানা, ফোন থাকলে ফোন নম্বর সে নোট বইতে টুকে রাখে।

হাউসিং স্টেটের সারি সারি ব্লক। চূড়ায় একটি করে ইংরেজী অক্ষর। ওতেই নাম গোত্রের পরিচয়। পি ব্লকটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল প্রভাস। অবশ্য ঠিক বিনা দ্বিধায় এগোতে পারল না। মনে মনে একবার এগোল আর একবার পিছোল। প্রভাস ভাবল কেন এলাম। মিছামিছি সময়টাই নষ্ট হবে। দীপালিদিকে তো এতদিন ধরে দেখছি। মূর্তিমতী একটি আইস ব্যাগ। কথা বলতে পারে না ভাল করে। অবশ্য বলবার মত কথা থাকলে তো বলবে। দীপালিদির সঙ্গে দেখা করে লাভ কি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে ফেলল প্রভাস। এসেই যখন পড়েছে ভদ্রতা রক্ষা করার জন্যে একবার যাওয়া ভাল। মিনিট পাঁচেকের বেশি না থাকলেই হল।

গিয়ে বলবে, 'দীপালিদি, কথা দিয়েছিলাম তাই এলাম। দেখলেন তো, কথা দিলে আমি রাখি।' এমনি দু' এক কথায় সাধারণ সৌজন্য বিনিময়। তার পরই বিদায় সম্ভাষণ।

প্রভাস প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলল। তারপর তিনতলায় উঠে পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দোর খুলে গেল। দীপালিদির পরিচিত মুখখানি সামনে দেখতে পেল প্রভাস। মুখখানি সুন্দর নয় কিন্তু আন্তরিক আনন্দে উদ্ভাসিত।

'আরে প্রভাস তুমি! আমি ভাবতেই পারিনি, সত্যি তুমি আসবে। কী অশ্চর্য, এস এস। দু' মিনিট দেরি হলেই আর দেখা হত না।'

প্রভাস বলল, 'আমার সৌভাগ্য!'

দীপালি বলল, 'না, সৌভাগ্য আমারই, আমি তোমাকে কতদিন ধরে বলছি। এতদিনে তোমার সময় হল।'

প্রভাস বলল, 'তাও তো অসময়ে। আপনার কাজের ব্যাঘাত হল।'

দীপালি বলল, আরে না না। ব্যাঘাত আবর কি। এই কিউ ব্লকে আমার বন্ধুর ছের্লের অন্নপ্রাশনের নেমতন্ন। সেখানে যাচ্ছিলাম। একটু বাদে গেলেও চলবে, অসুবিধে হবে না। এস, ভিতরে এস।'

প্রভাসের মনে হল অনেকদিন বাদে কেউ যেন তাকে ভিতরে যাওয়ার জন্যে ডাকল। এতদিন সে জগৎ-সংসারের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রভাস ঘরের ভেতরে ঢুকল। ঘরে আসবাবপত্র সাজানো। দক্ষিণ দিকে দু'খানা তক্তপোষ পাশাপাশি পাতা রয়েছে। তার উপর বিছানা গুটানো। উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে এক জোড়া ছোট টেবিল চেয়ার একটি বইয়ের আলমারি আর একটি জামা কাপড় রাখার আলনা।

দীপালি চেয়ারখানা টেনে দিয়ে বলল, 'বোসো প্রভাস। আর একটু আগে এলে মাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।'

প্রভাস বলল, 'মাধু কে?'

দীপালি বলল, 'মাধুরী আমার বোন। বি. এ. পাস করে বসে ছিল। এবার একটা মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি পেয়েছে। খুব খুশি। মাধুও গেছে আমার সেই বন্ধুর ছেলের জন্মদিনের নেমতন্ন রাখতে। মাধুকে বলেছি তোমার কথা। তুমি যে আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারী।'

প্রভাস লক্ষ্য করল দীপালি অফিসে যেমন মুখচোরা নিজের বাড়িতে তেমন নয়। অফিসে তার উপস্থিতি অনেক সময় টেরই পাওয়া যায়

না। কিন্তু নিজের বাড়িতে তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট।

'মা দেখ এসে কে এসেছে। সেই যে যার কথা বলেছিলাম। আমাদের অফিসের প্রভাস দত্ত।'

পাশের ঘর থেকে একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা এসে দাঁড়ালেন, 'ও তুমিই প্রভাস! তোমার কথা দীপালি প্রায়ই বলে। খুব গুণী ছেলে তুমি।'

প্রভাস একটু নত হয়ে নমস্কার জানাল, 'গুণের কি আছে। হৈ চৈ করে সময় কাটিয়ে দিই। কাজের কাজ কিছু হয় না।'

দীপালির মা বললেন, 'তাই কি আর হয়! যারা কাজের ছেলে তারা যতই হৈ চৈ করুক, নিজের কাজ ঠিকই করে যায়। তাদের মূলে ভুল হয় না বাবা। বোসো বোসো। আমি হাতটা ধুয়ে আসি।'

প্রভাস ভাবল মায়ের বয়সী ভদ্রমহিলাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেও হত। কিন্তু অনাত্মীয় বিশেষ করে সদ্য পরিচিত, তিনি পুরুষই হন কি মহিলাই হন, তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার অভ্যাস প্রভাসের বহুদিন নেই। সে লক্ষ্য করল ভদ্রমহিলার চোখে মুখে স্নিগ্ধ লাবণ্য আছে। কণ্ঠস্বরও মধুর। যৌবনে তাঁর যে রূপ ছিল তার আভাস পাওয়া যায়।

দীপালি বলল, 'তারপর এত বেলায় এদিকে কোথায় এসেছিলে?'

প্রভাস বলল, 'যদি বলি আপনার এখানে।'

দীপালি বলল, 'মোটেই না। তুমি যে সত্য কথা বলছ না তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। গুরুজনের কাছে মিথ্যে কথা বললে—'

প্রভাস হেসে বলল, 'নরকেও তার স্থান হয় না।'

দীপালি বলল, 'ছি ছি, আমি কি তাই বলেছি।'

একটু বাদে প্রভাসকে দীপালি সামনের বারান্দায় নিয়ে গেল। বাইরে কড়া রোদ। চারদিক স্তব্ধ। দীপালি হঠাৎ বলল, 'ফ্ল্যাটটা কেমন লাগছে?'

প্রভাস বলল, 'বেশ ভাল। বেশ ভাল। বেশ ফাঁকা।'

'ফাঁকা নয়? সামনে কত বড় মাঠ তাই দেখ। কম ভাড়ায় এত

ভাল একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি। আমাদের তো আর চেঞ্জে যাওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু আমার মোটেই ডাল্ লাগে না কখনো। অফিস থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার পর এই বারান্দায় চেয়ার পেতে যখন বসি, মনে হয় কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বাইরে কোথাও এসেছি। চল, পিছনটা দেখবে চল, পিছনটা আরো সুন্দর।'

পিছনে আরো এক চিল্‌তে বারান্দা, ডাইনিং স্পেসে চেয়ার টেবিল পাতা। দক্ষিণ দিকে আরো একখানি ঘর। পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখা যায় দেয়াল ঘেঁষে দুটি দীর্ঘ রাধাচূড়ার গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দীপালি বলতে লাগল, 'ফাল্গুন চৈত্র মাসে এই গাছ দুটিতে কত যে পাখি এসে বসে তার ঠিক নেই। নীল রঙের পাখি সবুজ রঙের পাখি হলদে রঙের পাখি। রাধাচূড়াব ফুলও তো হলদে। সেই পাপড়ির সঙ্গে পাখির দেহের পালক মিশে যায়। আলাদা করে আর চেনা যায় না।'

প্রভাস বলল, 'আপনি তো দারুন কবি দেখছি। আজকাল কবিতাও লেখেন নাকি দীপালিদি?'

দীপালি লজ্জিত হয়ে হাসল, 'সে-সব শুনে আর কি হবে। আমাদের লেখা কি আর কোথাও ছাপা হয়? লিখে লিখে নিজের কাছেই রেখে দিই। মাঝে মাঝে ভাবি, তেমন সমঝদার যদি কাউকে পাই পড়ে শোনাব।'

প্রভাস ভাবল, এই রূপহীন গতযৌবনা শবরীর আর কোন প্রতীক্ষা বোধ হয় আর নেই। শুধু একজন সমঝদার শ্রোতার প্রতীক্ষা। দীপালির মা এসে মেয়েকে অনুযোগ দিলেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু গল্পই করবি নাকি দীপা? প্রভাসকে কিছু খেতে-টেতে দিবিনে?'

প্রভাস বলল, 'না না এই অসময়ে আবার কী খাব।'

মহিলাটি বললেন, 'সে কি হয় বাবা? তুমি এই প্রথম এলে, কিছু মুখে না দিয়ে যদি চলে যাও আমাদের খুব দুঃখ হবে।'

প্রভাস বলল, 'তা হলে দিন কিছু। কিন্তু খুব সামান্য।'

ভদ্রমহিলা একটি প্লেটে কবে আম কেটে নিয়ে এলেন। আর খানিকটা ছানা। হেসে বললেন, 'আজ আমার একাদশী, ছেলে-

মেয়ের সব নেমন্তন্ন, আজকাল দুপুরেই সব নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন হয়, রাত্রে কোন অনুষ্ঠান করতে কেউ ভরসা পায় না। কখন বাস-টাস বন্ধ হয়ে যাবে তার তো ঠিক নেই।'
খেতে খেতে প্রভাস বলল, 'দীপালিদিরা ক' ভাইবোন ?'
'তিন বোন এক ভাই। ছেলেটি সবচেয়ে ছোট। স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। এই তো দেখ, বেলা দুপুর হয়ে গেল এখনো ছেলের দেখা নেই। ছুটির দিন হলে আর তার পাত্তা পাওয়া যায় না। কেবল বাইরেই থাকে।'
'আর মেয়েরা ?'
'বড়টি ওই দীপালি। মেজোটির বিয়ে দিয়েছি। ওই দীপালিই চেষ্টা চরিত্র করে দিয়েছে। দীপা আমার মেয়ে হয়েও ছেলে। ও-ই তো সংসার চালায়। নিজে বিয়ে-থা করল না। ভাই বোনদের কথা বিবেচনা করেই করল না। এখন ছোট বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু আজকালকার দিনে বিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা ? ছোট মেয়েও তেমনি। সে বলে যে বিয়ের জন্যে তোমাদের ভাবতে ভাবতে শুকিয়ে যেতে হয় তেমন বিয়ে আমি কিছুতেই করব না।'
প্রভাস হেসে বলল, 'তাই নাকি ?'
মুহূর্তের জন্যে সেই তেজোময়ী মেয়েটিকে তার দেখবার ইচ্ছা হল। কিন্তু ভিতরের তেজ যে সবসময় আলো হয়ে ফুটে ওঠে তা তো নয়।
ফলাহারের শেষে বিদায় নেওয়ার পালা।
দীপালি ঘরের ভিতরে গিয়ে এতক্ষণ কী যেন করছিল।
এবার বেরিয়ে এল। কাগজে মোড়া একটি চটি বই প্রভাসের হাতে তুলে দিয়ে লজ্জিত ভাবে বলল, 'আমার কবিতার বই। অনেকদিন আগে নিজেই টাকা খরচ করে ছেপেছিলাম। বিক্রি হয়নি। জানতাম বিক্রি হবে না। তবে এখন আর বেশি পড়ে নেই। আত্মীয় বন্ধুদের উপহার দিয়ে দিয়ে প্রায় শেষ করে এনেছি। না, এখন খুলো না ! বাড়িতে গিয়ে দেখ। পড়বার দরকার নেই। শুধু রেখে দিও।'

প্রভাস বলল, 'কী যে বলেন দীপালিদি, আপনার বই নিশ্চয়ই পড়ব।'

অয়েল পেপারে মোড়া প্লাস্টিকের একটি রঙীন পুতুল নিয়ে দীপালি প্রভাসের সঙ্গেই এবার বেরিয়ে এল।

বান্ধবীর ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে যাচ্ছে দীপালি, মনে পড়ল প্রভাসের। প্রভাস বলল, 'আপনার দেরি করিয়ে দিলাম।'

দীপালি বলল, 'না না, কী যে বল। কত যে আনন্দ হল তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কেউ তো বড় একটা আসে না। সবাইকে বলতেও পারিনে। কতজনে কত কি ভাবে। যাকগে।' তারপর একটু হেসে বলল, 'আমাদের ফ্ল্যাটটা কেমন লাগল?'

প্রভাস স্মিতমুখে বলল, 'খুব ভাল।'

দীপালি গেট পর্যন্ত প্রভাসকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

প্রভাস বড় রাস্তায় নামতে নামতে ভাবল দীপালিদির কিসে এত সুখ! একটি পছন্দমত ফ্ল্যাট কি জীবনের সমস্ত অপ্রাপ্তির দুঃখকে ঢেকে দিতে পারে? একথা দীপালিদিকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করা যাবে না। জিজ্ঞাসা করলেও দীপালিদি হয়তো জবাব দেবে না, জবাব দিয়ে উঠতে পারবে না।

সন্ধ্যাবেলায় ছাত্রীকে সেতার শেখাতে এল সুধাময়। স্বপ্নাকে শেখাবার জন্যে সপ্তাহে সে একদিন করেই আসে। কিন্তু সপ্তাহের অন্য সব দিনগুলিতেও স্বপ্না যে তার জন্যে প্রতীক্ষা করে তা সুধাময় জানে। স্বপ্নার ইচ্ছা শুধু একদিন নয় অন্ততঃ আরো দু' একদিন আসুক সুধাময়। শেখাবার জন্যে নয়, গল্প করবার জন্যে। শুধু আসবার জন্যেই আসুক সুধাময়, আগে যেমন আসত। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে। সুধাময়ের টুইশনের সংখ্যা আরো বেড়েছে। দু' একটি গানের স্কুলের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হচ্ছে। এদের সঙ্গে অর্থের তত সম্বন্ধ নেই, বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কোন স্কুলের উপদেষ্টা কার্যকমিটির মধ্যে আছে সুধাময়। কোন স্কুলের সেক্রেটারী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সবাই তাকে প্রত্যাশা করে। সবাই তার সহায়তা চায়। সুধাময় প্রত্যেকেরই যে আশা পূরণ করতে পারে তা নয়। তবে কাউকেই পারত পক্ষে বঞ্চিত করে না। দেব কিঞ্চিৎ না করব বঞ্চিত এই কি তার অঘোষিত আদর্শ? সে কাউকেই কিঞ্চিৎ দিতে চায় না। সে তো সবই দিতে চায়। কিন্তু যারা পায় তাদের মনে ওঠে না।

দমদমের ভিতরে এই রায়বাগান কলোনীর পথ তেমন সুগম নয়। বাস থেকে নেমে আরও মিনিট দশেক হাঁটতে হয়। রাস্তা এখনো পাকা হয় নি। কোন দিন হবে কি না কে জানে। অবশ্য সাইকেল রিক্সা আছে। কিন্তু সুধাময় পারত পক্ষে রিক্সায় ওঠে না, উঠলেই ছ' আনা খরচ। নিজের সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ক' আনা পয়সাও বেশি ব্যয় করতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে সুধাময়ের। জবর দখল কলোনী নয়। কেনা জায়গাতেই এখানকার বাসিন্দারা বাড়ি করেছেন। কিন্তু বাড়িগুলির চেহারা দেখে জায়গাটিকে বিত্তবানের পল্লী বলে মনে হয় না। একতলা বাড়ির সংখ্যাই বেশি। দোতলা

বাড়ি দুটি চারটি আছে। কিন্তু সুধাময় এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ না হয়েও বুঝতে পারে বাড়িগুলি খুব ভালো ম্যাটেরিয়ালের তৈরি নয়। কলোনীটা যেন আপনা আপনি গড়ে উঠেছে। কেউ কোন প্লান করে নি। রাস্তাগুলিও সেই ধরণের। বাড়িগুলির নম্বর এলোমেলো।

আগে আগে স্বপ্নাদের এই বাড়ি চিনতে বেশ অসুবিধা হত। প্রায়ই পথ ভুল হয়ে যেত সুধাময়ের। আজকাল আর হয় না। ওদের বাড়ির পাশের দুটি নারকেল গাছ এই ক' বছরের মধ্যে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। সেই এক নিশানা। তাছাড়া ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় একটি কয়লার দোকান। 'শুক্লা' বলে একটি লণ্ড্রি রয়েছে। সেও আর এক চিহ্ন। অদ্ভুত সমন্বয়। সময়ে সময়ে সুধাময়ের মনে হয় এই কলোনীটি যেন তারই জীবনের প্রতীক। এমনি অগোছালো ; অবিন্যস্ত পরিকল্পনাহীন।

ছোট সাদা বাড়ি। সবুজ রঙের দরজা। ডানদিকের ফাঁকা জায়গায় সেই নারকেল গাছ দুটি। কামিনী ফুল আর গন্ধ লেবুর গাছ। একই সঙ্গে ফুল আর ফলের বাগান।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। যেন দোরের ওপাশে উৎকর্ণ হয়ে কেউ অপেক্ষা করছিল। রোজ স্বপ্নাই দোর খুলে দেয়। আজও সেই পরণে ধানী রঙের শাড়ি। গলায় সাদা পুঁতির মালা, দীর্ঘ বেণীত বেল ফুলের মালা জড়ানো।

ফুল ভারি ভালবাসে স্বপ্না। রোজ ফুলের মালা ওর পরা চাই। কি এক গুচ্ছ ফুল রাখা চাই ফুলদানিতে। সব সময় নিজেদের বাগানে ফোটে না। দাদুকে দিয়ে আনিয়ে নেয়।

ফুল শুধু নিজেই পরে না স্বপ্না, দিতেও ভালবাসে। প্রতি বুধবার কিছু না কিছু ফুল স্বপ্নার কাছ থেকে উপহার পায়। ষবপ্নাও হয়তো আশা করে সুধাময়ও কিছু ফুলটুল নিয়ে আসবে। আগে মাঝে মাঝে আনত। আজকাল আর হয়ে ওঠে না।

স্বপ্না স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুধাময় জানে এ ঠিক দৃস্টি নয় দৃষ্টির ছলনা। চোখের ভিতরের

নার্ভ শুকিয়ে যাওয়ায় বছর চারেক হল দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে স্বপ্নার। এদৃষ্টি ফিরে আসবে বলে ডাক্তারেরা কোন ভরসা দেয়নি। বেশির ভাগ সময় গগলস্ পরেই থাকে স্বপ্না। কিন্তু সুধাময়ের সামনে পরে না। সুধাময় গগলস্ পছন্দ করে না। অনেক আগে একদিন বলেছিল। তখন চোখের দৃষ্টি অবিকল ছিল স্বপ্নার। কিন্তু সেদিনের সেই মন্তব্য সে মনে রেখেছে। এতখানি আনুগত্য, তার রুচির ওপর এই অকারণ নির্ভরতা ভাল লাগে না সুধাময়ের। কিন্তু আপত্তি করলেও স্বপ্না শোনে না।
দোরের দুদিকে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর স্বপ্না বলল, 'এতক্ষণে এলে। আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।'
সুধাময় একটু হাসল, 'সবে তো সাতটা বাজল।'
স্বপ্না বলল, 'সাতটা কি কম নাকি? আগে আগে ছটা সাড়ে ছটাতেও আসতে।'
ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোষ। খান দুই বেতের চেয়ারও আছে।
কার্পেটের ওপর একখানি ফুল কাটা আসন পাতা। স্বপ্নার নিজের হাতে বোনা নয়, কিন্তু পাতে সে নিজের হাতেই। স্বপ্নার অনেক দিনের অভ্যাস। এই আসনখানি দিয়ে সে যেন খানিকটা বিশিষ্টতা দিতে চায় একই সঙ্গে বন্ধু আর গুরুস্থানীয় সুধাময়কে। এই আসন পাতার মাধ্য স্বপ্নার আদর আর যত্নও মেশানো থাকে। সব দিন সুধাময়ের সে কথা মনে পড়ে না। কোন কোন দিন অবশ্য তার মনে হয় এর জন্যে দুটি একটি ভাল কথা স্বপ্নাকে বলাও উচিত। যদিও এই আদর যত্ন পেয়ে পেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে সুধাময়ের তবু কোন কোন সময় একটু কিছু উল্লেখ করা উচিত। কিন্তু বলা হয় না। সুধাময়ের কেমন যেন ভয় হয় যা কিছু সে বলবে ভারি ফরম্যাল শোনাবে। নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগবে।
সুধাময় বলল, 'কই সেতারটা নিয়ে এসো। ঢাকনি খোল।'
স্বপ্না বলল, 'বোসো। আগে চা টা খেয়ে নাও।'
ও নিজেই উঠে যাচ্ছিল দিদিমা এসে ঘরে ঢুকলেন, 'তুই বোস।

আমি চা আর জলখাবার নিয়ে আসছি।'
দিদিমার পরণে লাল পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি। হাতে শাঁখা। মাথার বেশির ভাগ চুলই পেকে গেছে। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। গায়ের রং নাক মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় যৌবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন।
দিদিমা বললেন, 'তুই বোস খুকু। আমি নিয়ে আসছি।'
স্বপ্না বলল, 'কেন দিদা। আমি তো সব পারি।'
দিদিমা বলল, 'পারিস বই কি। চোখে না দেখলেও তুই যে আন্দাজ আন্দাজে সবই আজকাল পারিস তা সুধাময় জানে। তবু ত তুই বাজাতে বসেছিস। বসে বসে বাজা না। আমিই সব নিয়ে আসি।'
তারপর একটু হেসে বললেন, 'তুই না হয় হাতে করে দিস। তা হলেই হবে।'
বৃদ্ধা ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। তারপর বড় একখানি প্লেটে করে লুচি বেগুন ভাজা আর হালুয়া নিয়ে এলেন তিনি।
স্বপ্নার দিকে চেয়ে বললেন, 'নে এবার তুই দে হাতে করে।'
স্বপ্না বলল, 'আহা। আমার দেওয়ার কী আছে। তুমিই দাও।'
সুধাময় খেতে খেতে বলল, 'দাদু কোথায়? তিনি বোধ হয় দাবার আসর থেকে এখনো ফেরেন নি?'
পাশের বাড়িতে রোজ বিকালে ভুবনবাবু দাবা খেলতে যান। একথা জানে সুধাময়।
দিদিমা বললেন, 'এবার ফিরবেন। বুধবার তাড়াতাড়িই ফিরে আসেন। জানেন আজ তুমি শেখাতে আসো। তাছাড়া আজ ওঁর কী একটা জরুরী কথাও আছে তোমার সঙ্গে।'
সুধাময় নিজের মনেই হাসে। জরুরী কথা যে-কী তা সুধাময় জানে। প্রতি সপ্তাহে ওই একই কথা একই অনুরোধ শুনতে হয় তার।
জলযোগের পরে চা এল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভুবনবাবুও এসে ঘরে ঢুকলেন। দোর ভেজানোই ছিল। কড়া আর তাঁকে নাড়তে হল না।
বৃদ্ধের মাথার সমস্ত চুলই সাদা। গোঁফদাড়ি কামানো। গায়ে

সাদা ফতুয়া। পরণে খাটো ধুতি। অনেক শোক তাপ পেয়েছেন তবু মুখে বেশ একটু প্রসন্নতা আছে। দুঃখ দুর্ভাগ্যকে খানিকটা সহ্য করবার খানিকটা বা উপেক্ষা করবার শিক্ষাও যেন আয়ত্ত করেছেন ভুবনবাবু।

সুধাময়কে দেখে তিনি হেসে বললেন, 'এই যে এসেছ। আমি উঠি উঠি করছি অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু মিত্তির কিছুতেই উঠতে দিচ্ছিল না। রিটায়ার্ড স্টেশন মাষ্টার আর পোষ্ট মাষ্টার, রোজ কম্পিটিশন। কোন দিন সে হারে কোন দিন আমি। হারজিৎ নিয়েই জগৎ।'

একটি কোণে বাঁয়া-তবলা রয়েছে। বৃদ্ধ নিজেই সেগুলি নামিয়ে নিয়ে বসলেন। ছোট হাতুড়ীটি নিয়ে তবলা বাঁধতে লাগলেন।

সেতার হাতে নিয়ে স্বপ্না বলল, 'কী বাজাব?'

সুধাময় বলল, 'তোমার যা খুশি।'

বৃদ্ধ বলে দিলেন, 'দেশই বাজা। সুধাময়ের খুব প্রিয় রাগ। সেদিনও রেডিওতে বাজিয়েছিল।'

সুধাময় একটু হাসল।

তারপর যতক্ষণ শেখাবার কাজ চলল সুধাময় মগ্ন হয়ে রইল। নিজেই রেয়াজ করুক আর কাউকে শিক্ষাই দিক যতক্ষণ গান বাজনা নিয়ে থাকে ততক্ষণই যেন সময়টা ভাল কাটে। তবু সুরই তো জীবনের সবখানি নয়। বেসুরো অংশও আছে।

সঙ্গত শেষ করে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। হয়তো ভাবলেন এখানে থাকা অসঙ্গত। এখন গুরু-শিষ্যা সংবাদ চলুক।

তিনি ভিতরের দিকে যেতে যেতে বললেন 'বোস তোরা। যাই এবার তোর দিদার একটু খবর নিয়ে আসি।'

স্বপ্না হেসে বলল, 'অনেকদিন দিদাকে দেখতে পাওনি না দাদু? বহুকালের বিরহী।'

দাদু সে কথা স্বীকার করে হেসে বললেন, 'তাছাড়া কি। পলকে প্রলয় গোণার দিন কি এখনই শেষ হয়েছে?'

তিনি ভিতরে চলে গেলে দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

একটু বাদে সপ্না বলল, 'আজই তো তোমার সেই আমেরিকান বান্ধবীর আসার কথা ছিল। এসেছিলেন তিনি ?'
সুধাময় হেসে বলল, 'বান্ধবী নয়। বন্ধুর স্ত্রী হলেই কি বান্ধবী হয়! মিসেস তরফদারকে আমি এই প্রথম দেখলাম। সমীরণ আর আমি এক সঙ্গে পড়তাম। দুজনে আই. এস. সি. পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর ও বায়োলজিতে অনার্স নিল। ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট হল। এম. এস. সিতেও ভাল রেজাল্ট করল। লণ্ডনে গিয়ে ডক্টরেট হল। এখন আছে ক্যালিফরনিয়ায় বার্কলেতে। ওখানে বাড়ি করেছে, গাড়ি কবেছে এমনকি নারীও।'
সুধাময় হাসল। তারপর একটু বাদে বলল, 'আর আমি পড়ে আছি এক অন্ধকূপে।'
সপ্না বলল, 'অন্ধকূপ! তুমি কি আমার কথা বলছ ?'
ওর আহত গলা অভিযোগেও ভরা।
সুধাময় লজ্জিত হয়ে বলল, 'ছি ছি, তোমার কথা কেন বলব। নিজের মনের অন্ধগহবরের কথাই আমি বলছিলাম। আমার একটি দিন আর একটি দিনেরই রিপিটিশন। আই ফলো দি সেম্ রুটিন। বাঁধা গৎ বাজিয়ে যাচ্ছি। যেমন যন্ত্রে তেমনি জীবনে। কিছুতেই এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে বেরোতে পারছিনে। কেবল বিশুদ্ধতা আর বিশুদ্ধতা। ওস্তাদও সেই কথা বলেন—'
স্বপ্না বলল, 'তুমি কি তা মান না ?'
সুধাময় বলল, 'নিশ্চয়ই মানি। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় নতুন কিছুও করা দরকার। যারা নিগড় ভেঙে বেরিয়ে পড়ল তারাই কিন্তু দুনিয়া জয় করল। আমি ঠিক ওই রকম জয় চাইনে। আবার শুধু ঐতিহ্যের সুতোয় বাঁধা পড়ে থাকতেও মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।'
স্বপ্না কি বুঝল সেই জানে। সে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাকে জোর করে কেই বা বেঁধে রাখতে পারে। তুমি ইচ্ছা করলে বাঁধন পরতে পার, ছিঁড়তেও পার।'
সুধাময় আস্তে আস্তে বলল, 'শুধু ইচ্ছে করলেই কি আর সব পারা যায় ? জানো আমার সেই বন্ধু আর তার স্ত্রী আমাকে আমে-

রিকায় যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। ওখানে নাকি ইণ্ডিয়ান মিউজিকের বেশ সমাদর!'

স্বপ্না বলল, 'কবে যাচ্ছ?'

সুধাময় হাসল, 'ক্ষেপেছ? যাব বললেই কি যাওয়া যায়?'

স্বপ্না হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বন্ধুর স্ত্রী কি খুব সুন্দরী?'

সুধাময় বলল, 'খুব সুন্দরী নয়, তবে সুশ্রী। কিন্তু রূপের চেয়ে গুণই বেশি চোখে পড়ল। ওদের দেশের মিউজিক সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে, অরগান বাজায়। ইণ্ডিয়ান মিউজিক সম্বন্ধেও খুব ইণ্টারেস্ট। সেইজন্যেই সমীরণ স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। বাজনা শোনাবার জন্যে।'

স্বপ্না বলল, 'কী বাজালে।'

সুধাময় হেসে বলল, 'অনেক কিছু। শেষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পর্যন্ত!'

স্বপ্না বলল, 'কতক্ষণ ছিলেন ওরা?'

সুধাময় বলল, 'তা প্রায় ঘণ্টা চারেক। বেলা দেড়টায় ওরা উঠে গেল।'

স্বপ্না আস্তে আস্তে বলল, 'চা-র ঘণ্টা। আর আমাদের এখানে এলে একঘণ্টা যেতে না যেতে তুমি উস্‌খুস করতে থাকো। কোথায় তোমাদের আসর বসেছিল? তোমার মেসের সেই ঘরে?'

সুধাময় বলল, 'না না, মেসের ঘরে জায়গা কোথায়? গ্রে ষ্ট্রীটে আমার এক ছাত্রীর বাড়িতে ব্যবস্থা করেছিলাম। নন্দিতা চ্যাটার্জী —তাদের বাড়িতে। বেশ বড় হল ঘর আছে ওদের। ঘর প্রায় ভরে গিয়ে ছিল।'

স্বপ্না বলল, 'আমাকে বললে না কেন? আমিও যেতাম। দাদুকে নিয়ে চলে যেতাম। না কি তোমার এক ছাত্রীর বাড়িতে আর এক ছাত্রী যেতে পারে না?'

সুধাময় বলল, 'তা কেন, আমি কাউকেই বলিনি। নন্দিতারাই সবাইকে খবর দিয়েছিল।'

স্বপ্না গভীর অভিমানের সঙ্গে বলল, 'তাইতো। আমারই ভুল। আমি আলাদা বলে ভাবলে কি হবে তুমি তো আর তা ভাবনা। তোমার অগুণতি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে আমি নগণ্য একজন। আমি

আর শিখব না তোমার কাছে সেতার। দাদুকে বলে দেব আমি আর শিখব না।'

সুধাময় চুপ করে রইল।

রাগ আর অভিমান থেকে শিক্ষা বন্ধ করার সংকল্প স্বপ্না এমন প্রায়ই করে। দিন কয়েক লাগে ওর মান ভাঙাতে। গতানুগতিক মান আর মান ভঞ্জনের খেলা। আজকাল আর এসবে তেমন উৎসাহ পায় না সুধাময়। কেমন যেন ক্লান্তি লাগে।

স্বপ্না বকতে লাগল, 'আমি তো আর চিরকাল অন্ধ ছিলাম না। আমি তো আর ইচ্ছে করে অন্ধ হইনি। কে বলেছে তোমাকে এই অন্ধকূপে পড়ে থাকতে! তুমিও যাও, আমেরিকায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে বাড়ি কর, গাড়ি কর, সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে কর। কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?'

সুধাময় এবার এক ধমকের সুরে বলল, 'আঃ কী হচ্ছে এ সব? ও ঘরে দাদু দিদিমা আছেন না? কি ভাববেন তাঁরা?'

কিন্তু স্বপ্না এসব কথা কানেও তুলল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে হাতড়ে হাতড়ে সুধাময়ের পা দু-খানি খুঁজে পেল। তারপর সেই পদ যুগলের ওপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি তোমার পথে বাধা দিতে চাইনে। তোমার উন্নতির পথে আমি কাঁটা হয়ে থাকতে আমি চাইনে। তুমি একদিন ভালবেসে-ছিলে বলেই যে চিরদিন ভালবাসতে পার না তা আমি জানি। আমার কী আছে যে তুমি আমাকে ভালবাসবে? আমার যখন চোখ গেছে 'তখন সব গেছে। আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তোমার যেখানে খুশি তুমি চলে যাও।'

এই কি ছেড়ে দেবার নমুনা? কোন মেয়ে দুই পা জড়িয়ে ধরে যদি বলে তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম তাহলে সত্যিই কি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়? অতখানি নিষ্ঠুর হতে আর যেই পারুক সুধাময় চক্রবর্তী পারে না। তাই স্বপ্নাকে সে ধরে তুলল। তার পিঠে হাত বুলাল, মুখে হাত বুলাল ঠোঁটে ঠোঁট বুলিয়ে তবে শান্তি।

তবু স্বপ্নার সংশয় যায় না। সে বলল, 'ওগো তুমি আমাকে

ঠকাচ্ছ না তো ? তুমি যদি ভাল না বেসেও আমাকে আদর কর আমি তা বুঝতে পারব না। আমি তো চোখে দেখিনে।'
সুধাময় বলল, 'কী আশ্চর্য ! চোখে দেখাটাই সব ? চোখে বুঝি সবই দেখতে পাওয়া যায় ?'
স্বপ্না বলল, 'তা জানি তোমার মত মানুষ হয় না। আর যেই ছাড়ুক তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।'
বাইরে দাদুর গলা খাঁকারির শব্দ শোনা গেল। স্বপ্না সরে যেতে যেতে হেসে বলল, 'কী জেলাস দেখেছ ?'
ওর মুখে হাসি। কিন্তু দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোণে এখনো দুবিন্দু জল টলটল করছে।
শ্যাম বর্ণা সাধারণ চেহারার পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটিকে এইরকম এক একটি বিরাট মুহূর্তে ভারি সুন্দরী বলে মনে হয় সুধাময়ের। কিন্তু এই সৌন্দর্য ঘাস ফুলের ওপর শিশিরবিন্দুর মত।
দুজনকে আরো একটু সময় দিয়ে ভুবনবাবু এবার ঘরে ঢুকলেন। তিনি বললেন, 'তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে না সুধাময় ? আমি বলি কি আজ রাত্রে এখানেই থেকে যাও। ঘরের তো অভাব নেই। আর দুটি ডাল ভাতেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'
সুধাময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না দাদু। আজ থাক। আর একদিন এসে থাকব, খাব। ডাল ভাত নয়, মাছ ভাত।'
ভুবনবাবু বেতের মোটা লাঠিখানা নিয়ে সুধাময়ের পিছনে পিছনে এলেন, 'আচ্ছা চল। তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।'
সুধাময় বলল, 'আপনাকে তো আবার একা একা ফিরতে হবে।'
ভুবনবাবু বললেন, 'চলই না কতক্ষণই বা লাগবে।'

রাত দশটাও বাজেনি। এরই মধ্যে কলোনীর বাড়িগুলি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তাগুলিতে লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে।
সুধাময় কলোনী ছাড়িয়ে চওড়া রাস্তায় পড়ল। শান্ত সহরতলী প্রায় পাড়াগাঁর মত। বাঁ দিকে জলে ভরা পুকুর। কোথায় যেন ব্যাঙ ডাকছে।

সুধাময় বলে, 'আপনি আর কতদূর আসবেন !'
ভুবনবাবু বললেন, 'আমার জন্যে ভেব না। আমার হাঁটতে কোন কষ্ট হয় না। সবরকম অভ্যাস আমার আছে? বয়স পঁচাত্তর হল। তবু সব কষ্টই সইতে পারি। নিজের জন্যে আমি ভাবিনে। ওই স্বপ্নার জন্যেই যত ভাবনা। এবার ওর একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করো। অনেকদিন তো হয়ে গেল।'
সুধাময় স্বীকার করে বলল, 'হাঁ এবার কিছু একটা করতে হবে।'
ভুবনবাবু বললেন, 'আমাদেরও বয়স হয়েছে। কবে আছি কবে নেই। যাবার আগে স্বপ্না সুখী হয়েছে যদি দেখে যেতে পারতাম—'
সুধাময় একটু যেন নির্লিপ্তভাবে বলল, 'সে ইচ্ছে তো খুবই স্বাভাবিক।'
বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি তো জানো আমাদের দুজনের ওই একটি মাত্র নড়ি। মেয়ের ঘরের মেয়ে। কোথায় ও অন্ধের নড়ি হবে না নিজেই অন্ধ হয়ে বইল। তুমি তো জানো আমি চিকিৎসার ত্রুটি করিনি।'
সুধাময় বলল, 'তা কেন করবেন। আপনি যথেষ্ট ব্যয় করেছেন।'
বৃদ্ধ বললেন, 'আমার দুর্ভাগ্য। নইলে ওর কপালেই বা এমন হবে কেন। মেয়েটার অনেক গুণ আছে জানো।'
সুধাময় বলল, 'তা তো আছেই। চোখ দুটি যাওয়াব পরেও ও যে আগ্রহ নিয়ে বাজনা শিখছে যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে তা আমার অনেক ছাত্রছাত্রীই পারেনি।'
বৃদ্ধ বললেন, 'তাছাড়া ঘরের কাজও করতে পারে। তুমি শুনলে অবাক হবে জিনিসপত্র দিয়ে উনুনেব সামনে বসিয়ে দিলে রান্নাবান্না পর্যন্ত করতে পাবে স্বপ্না।'
সুধাময় কোন কথা বলল না।
ভুবনবাবু তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন, তাবপর হঠাৎ বললেন, 'তুমি কেন এত দেরি করছ আমাকে খুলে বল, যতদূর জানি তোমারও তো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।'
সুধাময় বলল, 'না তা নেই।'
বৃদ্ধ বললেন, 'তা ছাড়া তোমারও তো বিয়ের বয়স হয়েছে—'
সুধাময় এবার একটু হাসল—'হয়েছে কি চলেই গেছে বলতে পারি

না। আমার এখন ছত্রিশ চলছে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'না না অত মনে হয় না। তাছাড়া তোমার যা চেহারা। এমন সুদর্শন ছেলে আমি কমই দেখেছি।'

সুধাময় একটু হাসল, 'শুধু দর্শনটাই তো সব নয়। মাঝে মাঝে ভাবি এতদিনই যখন গেল আর কেন বৃথা বন্ধনেব মধ্যে যাওয়া। তার বাইবে থাকাই কি ভাল নয় দাদু?'

বৃদ্ধ প্রতিবাদ করে উঠলেন—'না সুধাময়, এ কোন কাজের কথা নয়। এই যে তার যন্ত্র তোমরা বাঁধো, এটা কি বন্ধন? বাঁধো বলেই তো তাতে অমন সুরতরঙ্গ তুলতে পার। সংসারের বাঁধনও তেমনি। বাঁধন না থাকলে ভালবাসার সুর কোত্থেকে ফুটবে?'

সুধাময় কোন জবাব দিল না।

বৃদ্ধ তাব পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন।

তারপর ফের বললেন, 'এর আগে তুমি বলেছ তোমার নির্দিষ্ট রোজগার নেই—'

সুধাময় হাসল, 'এখনো সেই কথাই বলি। অবস্থা বিশেষ বদলায়নি দাদু—'

বৃদ্ধ বললেন, 'তুমিতো চাকরি বাকরির মধ্যে ইচ্ছা করেই গেলে না। আমি পোষ্টমাষ্টার হয়ে রিটায়ার করেছি, কিন্তু শুধু পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট নয় অন্য ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গেও জানাশোনা ছিল। মার্চেণ্ট অফিস-টফিসেও যদি যেতে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। যদি বল এখনো হয়। সরকারি চাকরির বয়স নেই কিন্তু বেসরকারী—'

সুধাময় হেসে বলল, 'না দাদু। আমার সে ইচ্ছে নেই।'

বৃদ্ধ বললেন 'বেশ তো। তাহলে যা নিয়ে তুমি আছো তাই নিয়েই থাকো। আমারও তো কিছু আছে। যাইহোক এই বাড়িটুকু করেছি। দোতলার ফাউণ্ডেশন আছে। তুমি ইচ্ছা করলে ওপরে দুখানা ঘর তুলে নিয়ে একতলাটা ভাড়া দিতে পারবে। আরও যদি সুযোগ পাই আমিই সে সব করে দিয়ে যাব। এছাড়া বারাসতের দিকে কয়েক বিঘে ধানী জমি আছে! ব্যাঙ্কে সামান্য কিছু নগদ ও—। সবই তো তোমরা পাবে। কিছু ভেব না।'

সুধাময় বলল, 'আমি ওসব নিয়ে কিছুই ভাবছিনে দাদু।'
বৃদ্ধ এবার যেন একটু উত্তপ্ত হলেন। বললেন—'তবে কিসের তোমার এত ভাবনা? কিসের এত দ্বিধা, স্বপ্না তো তোমাকে ভালবাসে। অন্তর দিয়ে ভালবাসে। মেয়েদের এই ভালবাসা তুচ্ছ করবার বস্তু নয় ভাই।'
সুধাময় দমদম রোড়ের মোড়ে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ যে রাস্তাটুকু দিয়ে আসছিল তা ভারি মনোরম। দুদিকে স্তব্ধ শান্ত পামগাছের সারি। সেই পামবীথির পাশে একটি পুরোন জীর্ণ বাড়ি। আগে কোন জমিদারের বিলাস কুঞ্জ ছিল। এখন সেখানে হাইস্কুল বসেছে। সেই জীর্ণতার ওপর রাত্রির রহস্যেব ছোঁয়া লেগেছে। সব যেন কোন এক শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি।
সুধাময় বলল, 'দাদু আপনি অনেকদূর এসে পড়েছেন। আমি এখান থেকে বাস নেব। আপনি আব এগোবেন না।'
বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার কাছ থেকে কথা না পেলে আমি পৃথিবীব শেষ পর্যন্ত যাব।'
সুধাময় হেসে বলল, 'না না না। আমি আপাততঃ অতদূর যাব না।'
বৃদ্ধ বললেন, 'তাহলে কবে তুমি ফের কথা বলবে?'
সুধাময় বলল, 'বুধবার। সামনের বুধবারই তো ফের আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'
ভুবনবাবু এবার একটু হাসলেন, 'দেখা তো হচ্ছে। কত বুধবার এল কত বুধবার গেল। কিন্তু কথার মত কথা তুমি বলতে পারলে কই। এই বুধবার কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে স্পষ্ট কথা চাই। আমি এবার দিন তারিখ সব ঠিক করে ফেলব। তোমার কাছ থেকে কথা না পেলে আমি কিন্তু সহজে ছাড়ব না।'
মোটা বেতের লাঠিখানা উঁচু কবে ধরে বৃদ্ধ হাসলেন, 'এখানা ঠিক পিঠে ভাঙব।'
বৃদ্ধের এই সস্নেহ শাসনের জবাব দিল শুধু হাসি দিয়েই সুধাময়। কোন কথা বলল না। বাস এসে পড়েছিল। এবাব সে দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে বাসে গিয়ে উঠল।

বেশি ভিড় নেই। বসবার একটি জায়গা জুটে যায় সহজেই।

জানালার ধারটিতে বসে সুধাময় ভাবতে লাগল। এবার হাঁ কি না স্পষ্ট করে বলে দিতেই হবে। কিন্তু না বলবার শক্তি কি তার আছে? আবার হাঁ বলবার মত জোরও সে পাচ্ছে কই? কিসের এত দ্বিধা সুধাময় নিজেও বুঝতে পারে না। সে কি স্বপ্নার অন্ধত্বকে ভয় করে? না, ভয় তার অন্ধত্বকে নয়। ভয় ওই অন্ধ আসক্তিকে। একান্ত একাধিপত্যের স্পৃহাকে। এই স্পৃহা স্বপ্নার আগেও ছিল। অন্ধ হবার পর যেন আরো বেড়ে গেছে। বিয়ের পর কি আরো বাড়বে না? সেই একাধিপত্য তার সমস্ত শিল্প সাধনাকে পর্যন্ত গ্রাস করতে চাইবে। তার ব্যক্তিসত্তার ওপর আক্রমণ চালাবে। সকলের ওপর অন্ধ অবলার এই অত্যাচার কম দুঃসহ হবে না। বিয়ে? কার সঙ্গে কার বিয়ে? অনুরাগের সঙ্গে অনুকম্পার তীব্র আসক্তির সঙ্গে করুণার প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্বের। এই অক্ষমতার জন্যে সুধাময় নিজেও পীড়িত বোধ করল। কিন্তু এ সত্যকে সে অস্বীকার করবে কী করে? এই নির্মম ঔদাসীন্যকে সে কি কোনদিনই জয় করে উঠতে পারবে?

শিপ্রা প্রথমে বাড়ির সবাইকে বলেই দিয়েছিল, 'আমি বিয়ে করব না, আমার বিযের জন্যে তোমরা কেউ চেষ্টা করবে না।'
মা বলেছিলেন, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে।'
বাবা বলেছিলেন, 'কেন, বিয়ে না করবার কী হয়েছে।'
শিপ্রা জবাব দিয়েছিল, 'আমাকে কেউ ঘৃণা করবে, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অনুকম্পা করবে তা আমি চাই না।'
বাবা বলেছিলেন, 'পৃথিবীশুদ্ধ লোক কি এমন আহম্মক হয়ে গেছে ? তোব সামান্য ওই শ্বেতিটুকুর জন্যে আমার এই গুণবতী মেয়েকে লোকে ঘৃণা করবে ?'
শিপ্রা জানে বাবা তাকে খুব ভালবাসেন। তাই বার বাব তার গুণের কথা অমন করে বলেন। শুধু নিজেদের বাড়িতে না আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছেও সেকথা বলেন। এমন করে বলেন যে শিপ্রার লজ্জা করে। সে তো জানে তার এমন কিছু অসাধারণ গুণপনা নেই। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যা জানে, মোটামুটি ধরণের রান্নাবান্না, সেলাই বোনা, অল্প স্বল্প রবীন্দ্র সঙ্গীত, শিপ্রাও সেইটুকু আয়ত্ত করেছে। এছাড়া কম্পার্টমেণ্টালে বি. এ.-ও পাশে করেছে শিপ্রা। কে আর সে কথা মনে করে রাখে। যেভাবেই পাশ করুক গ্রাজুয়েট তো হয়েছে।
রূপের দিক থেকেও সাধারণ। খুব একটা সুশ্রী নয়, তবে কুরূপাও তাকে কেউ বলতে পারে না। শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী, বেশ বড একগোছ চুল আছে মাথায়, নাকচোখ হয়তো নিখুঁত নয়। কিন্তু বেশ একটু আলগা লাবণ্য মুখখানিতে মিশে আছে। দাঁতখানি সুগঠিত সুন্দর, হাসলে ভারি মিষ্টি লাগে।
বিয়ের ব্যাপারে এতে মোটামুটি ধরণের পাত্র জুটে যাবার কথা ছিল। কারণ শিপ্রার বাবা বিশ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি লাইফ ইনসিওরেন্সে কাজ করেন। মেয়েব বিযের কথা ভেবে তিনি পনের হাজার টাকার একটা বীমা করেছিলেন। ম্যাচিওর করার পর টাকাটা তিনি ব্যাঙ্কে ফিক্সড্

ডিপজিট করে রেখেছেন। তাতে তিনি আর হাত দেননি। মাঝে মাঝে বাড়ি করার কথা, অন্তত দু'তিন কাঠা জমি কিনে রাখার কথাও উঠেছে। কিন্তু অমিয়বাবু বলেছেন, 'শিপ্রার বিয়ে না দিয়ে আমি কিছু করব না।'

একটি মাত্র মেয়ে। আর কোন সন্তান নেই। স্থাবর অস্থাবর মেয়েই তো পাবে। তবু ওর বিয়েটা আগে হোক।

কিন্তু সেই বিয়েতেই বাধা ঘটেছে। শিপ্রার দু'খানি হাত শ্বেতিতে ভরে গেছে। প্রথমে হয়েছিল ডান হাতের আঙ্গুলের ডগায়। তারপরে সেই শুভ্রতা ক্রমেই ছড়াতে শুরু করল। শুধু মুখ-খানিকেই ছোঁয়নি। কিন্তু অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। সে সব জায়গা কাপড়ের নিচে ঢাকা থাকে। কিন্তু হাত দু'-খানিকে তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না। এই গরমের দেশে সারাক্ষণ দস্তানা পরে থাকারও রেওয়াজ নেই। যে পানিগ্রহণ করবে সে শিপ্রার পানি দু-খানি নিশ্চয়ই দেখে নেবে। তাই শ্বেতিভরা হাত দু'খানা তার চোখ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। আর শিপ্রা তা লুকোতে যাবেই বা কেন?

এই পাঁচবছর ধরে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক হাইড্রোপ্যাথিক কবচ মাদুলী ধারণ, কত রকম চিকিৎসাই তো করা হয়েছে। বাবা তার জন্যে যথেষ্ট টাকা খরচ করেছেন, মা দেবস্থানে বহু মানত করে রেখেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

হল না যখন বিয়ের চেষ্টা না করাই উচিত ছিল। কিন্তু বাবা নাছোড়বান্দা। তাঁর ধারণা বিবাহিত জীবনই মেয়েদের একমাত্র জীবন। তার বাইরে যেন তাদের কোন শান্তি থাকতে পারে না। শিপ্রা এই নিয়ে বাবার সঙ্গে অনেক তর্কও করেছে।

'কেন বিয়ের কথা অত ভাবছ বাবা? লেখাপড়া যাইহোক কিছু যখন শিখেছি কিছু না কিছু করে খেতেই পারব।'

অমিয়বাবু বলেন, 'শুধু করে খাওয়াটাই কি সব? তোর বিয়ে থা হবে, তুই আলাদা ঘর সংসার পাতবি, তোর ছেলেমেয়ে হবে; বুড়ো বয়সে আমরা নাতি নাতনীদের সঙ্গে আনন্দ-আমোদ করব।

আমি সেই সুখের স্বপ্ন দেখি। একা একা থাকাটা কি আর সাজে ?
ঘর সংসারের সুখের স্বপ্ন গোপনে গোপনে শিপ্রাও তো আশা করে।
কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে কই !
শিপ্রা নিজের মনকে প্রবোধ দেয়, এই বেশ আছি।
সহরতলীর উমাকান্ত সেন লেনের দোতলার একটি ফ্ল্যাটের একখানি পুরো ঘর শিপ্রার দখলে। জানলায় দাঁড়ালে একটি সরু রাস্তা চোখে পড়ে। সেই রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল দেখা যায়। পাড়ার ছেলেরাই যাতায়াত করে বেশি। আগে যারা শিপ্রার দিকে তাকাত এখন আর তারা তাকিয়ে দেখে না। তার রোগের কথাটা সবাই এতদিনে জেনে গেছে।
ওই সরু রাস্তা দিয়ে রিক্সা চলে ট্যাক্সিও চলে। দু'একখানা ট্যাক্সি মাঝে মাঝে শিপ্রাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়ও। দুজন একজন অতিথি চলে আসেন। বাবাই নিয়ে আসেন ওঁদের। শিপ্রাকে যথারীতি তাঁদের সামনে আসতে হয়। তাঁরা যেসব কথা জিজ্ঞাসা করেন সেগুলির জবাবও শিপ্রা ভদ্রভাবেই দেয়। তারপর তাঁরা জলখাবার টাবার খেয়ে বিদায় নেন। আর কোন খোঁজ খবর আসে না। কদাচিৎ কেউ হয়তো পোষ্টকার্ড লিখে দুঃখ প্রকাশ করেন।
শিপ্রা একদিন বিরক্ত হয়ে বাবাকে ধমক দিল, 'আর কখনো তুমি ওসব দেখাদেখির মধ্যে যাবে না। আমি আর কারো সামনে বেরেবো না। আজকাল কত মেয়ে ইচ্ছা করে আনম্যারেড থাকে তাতে জাতও যায় না নিন্দাও হয় না।'
কিছুদিন অমিয়বাবু চুপচাপ রইলেন। তারপর আবার একদিন স্ত্রী আর মেয়ের সামনে অন্য একটি সম্বন্ধের কথা পাড়লেন।
'আমার কলীগ বিনয় সমাদ্দার খোঁজ এনেছে ছেলেটির। একটি প্রেসের ম্যানেজার। বয়স একটু হয়েছে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। অবস্থা মোটামুটি ভাল। বেলেঘাটায় নিজেদের বাড়ি আছে। সংসারে ঝামেলা নেই। একটি বোন ছিল বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আর আছে মা।'
সর্বাণী বললেন, 'বেশ তো।'
অমিয়বাবু বললেন, 'শুধু একটা বিষয় নিয়ে আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ

করছে।'
সর্বাণী বললেন, 'বিষয়টা কী?'
অমিয়বাবু বললেন, 'ছেলেটিরও শ্বেতি আছে।'
শিপ্রা কৃত্রিম আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'বাবা, এতদিনে একটি সম্বন্ধের মত সম্বন্ধ এনেছ। আর দেখাদেখির দরকার নেই, এইটিই করে ফেল।'
অমিয়বাবু বললেন, 'তুই কি ঠাট্টা করছিস।'
'বাঃ ঠাট্টা কেন করব। তুমি তো আর কানা খোঁড়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আননি। আমারও যে খুঁৎ তাঁরও সেই খুঁৎ। কেউ কাউকে খোঁটা দিতে পারব না, ভাল হল।'
অমিয়বাবু বললেন, 'বিনয় বলছিল ছেলেটিও নাকি শ্বেতি আছে এমন একটা মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ওর অন্য অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। কিন্তু ছেলেটি রাজি হয়নি।'
সর্বাণী অবাক হয়ে বললেন, 'কেন?'
অমিয়বাবু বললেন, 'ওই একই কারণে! হয়তো ভেবেছে বউ এসে পরে ঘেন্না করবে। যদিও ঘেন্নার কিছু নেই। এ রোগ সংক্রামক নয়, জ্বালা যন্ত্রণাও কিছু নেই, শুধু দেখতেই যা একটু খারাপ লাগে। কিন্তু চোখে একবার সয়ে গেলে—'
সর্বাণীও অমত করলেন না। তিনিও বললেন, 'হ্যাঁ, এক ধরণের খুঁৎ থাকাই ভাল।'

ছেলে নিজেই এল কনে দেখতে। না আর কাউকে সঙ্গে করে আসেনি। শিপ্রা দেখলে বেশ শান্তশিষ্ট বিবেচক ভদ্রলোক। কিন্তু তাই বলে গুরুগম্ভীর নীরস ধরণের নয়। কথাবার্তায় কৌতুকের আবেশ আছে।
ছেলে মেয়েকে আলাপ করতে দিয়ে শিপ্রার মা বাবা আড়ালে চলে গেলেন।
'আমার নাম শুনেছেন বোধ হয়, প্রণব কুমার চন্দ।' আত্মপরিচয় দিয়ে পাত্র কথা আরম্ভ করল।
শিপ্রা উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিল। স্মিতমুখে ঘাড় কাত করল।

প্রণব বলল, 'আপনি অমন আড়ষ্ট হবেন না। ভাববেন না রান্নাবান্না সম্বন্ধে কি ঘর সংসারের কাজকর্ম কি গানবাজনা সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাব। আমি সেজন্যে আসিনি।'
শিপ্রা এবার মুখ তুলল, জিজ্ঞাসা করল, 'তবে?'
প্রণব বলল, 'আমি শুধু দেখা সাক্ষাতের জন্যে এসেছি। আপনি কাকে বিয়ে করছেন একবার দেখে নেওয়া ভাল। দেখেছেন তো রোগটা আপনার শুধু হাতখানিতে ধরেছে, আমার গালে ঠোঁটে ও হাতগুলোতে বাকি রাখেনি।'
শিপ্রা বলল, 'দেখেছি।'
'আপনার আপত্তি নেই তো।'
শিপ্রা বলল, 'আপত্তি করে আর কী করব বলুন। আমার মুখেও তো একদিন হতে পারে।'
প্রণব বলল, 'আমি অবশ্য তা চাইনে। আপনার মুখখানি চিরদিন অম্লান সুন্দর থাকুক, তাই আমাদের কাম্য।'
মতামত জানাতে দুদিন সময় নিয়েছিল শিপ্রা। তারপর ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত সম্মতিই জানিয়েছিল। বাবার যখন এত আগ্রহ, মারও যখন আপত্তি নেই শিপ্রাই বা অমত করে কী করবে? তাছাড়া একটা অবলম্বনও তো হবে। এত খোঁজাখুঁজি, একটা চাকরি-বাকরিওতো জুটল না শিপ্রার। শুধু বই পড়ে আর সিনেমা দেখে কাহাতক সময় কাটানো যায়?
শিপ্রার সম্মতি পাওয়ার পর প্রণব অন্যান্য কথাবার্তায় অগ্রসর হল। শিপ্রা লক্ষ্য করল এ ব্যাপারেও সে আর কাউকে আনেনি। না কোন আত্মীয়স্বজন, না কোন বন্ধু।
বিয়ের ব্যাপারে প্রণবের কয়েকটি শর্ত আছে। মেয়ের বাবার কাছ থেকে সে কোন পণ যৌতুক নেবে না। সোনার বোতাম সে ব্যবহার করে না সুতরাং ওটা নিষ্প্রয়োজন। ঘড়ি পেন তার আছে, সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি। খাট মশারিতো বাবাই রেখে গেছেন। আরো একখানা নিয়ে কী করবে। মিছিমিছি আর একখানা ঘর তাতে জুড়ে থাকবে। তারচেয়ে ফাঁকা খোলামেলা বাড়িঘরই প্রণবের পছন্দ। আর ভারি ভারি গয়না টয়নাও যেন শিপ্রাকে তার বাবা

না দেয়। অলঙ্কারের বাহুল্য প্রণবের পক্ষে অরুচিকর। তার চোখে ওগুলি বড় বিসদৃশ লাগে।

এসব কথা অবশ্য হাসতে হাসতে সরস ভাবেই বলেছিল প্রণব। কিন্তু তার মতামত যে অটল সে কথা জানিয়ে দিতে সে ভোলেনি।

অমিয়বাবু অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'বল কি প্রণব, শিপ্রা আমার একমাত্র মেয়ে। তাকে শুধু শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বিদায় দেব ?'

প্রণব বলেছিল, 'আমিওতো আমার বাবা-মার একমাত্র ছেলে। আমি যা চাইনা তা যদি আপনারা আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চান তাওতো খুব সুখের হয় না।'

শিপ্রার বাবা-মা আবার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন।

সর্বাণী বললেন, 'ছেলেটিতো ভারি একরোখা, কী করবে ভেবে দেখ।'

অমিয়বাবু বললেন, 'অনেক দূর এগিয়েছি। আর কি পিছোন ভাল! শুনেছি আজকালকার ছেলেরা কেউ কেউ এমন করে। মেয়ের বাপের কাছ থেকে কিছু নেয়না। দিতে গেলে অপমান করে ফিরিয়ে দেয়। এও আর এক ধরণের গোঁড়ামি। কারো কারো থাকে নেওয়ার লোভ, কারো কারো থাকে না। তুমি ভেব না, সময়ে সব সেরে নেবো। শিপ্রাকে যা আমরা দেব তা ধীরে ধীরে পেঁাছে দিলেই হবে। আমরা তো আর লোককে দেখিয়ে বাহাদুরী নিতে চাই না।'

প্রণবের ইচ্ছামত বিয়ের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর ভাবেই হল। নিজের বাড়িতে একেবারেই কোন আড়ম্বর করল না প্রণব। বউভাত-টউভাত কিছু নয়। শুধু বিশ-পঁচিশ জন আত্মীয় বন্ধুকে চা খাওয়ার জন্যে ডাকল। অবশ্য শুধু চা কি আর দেওয়া যায়? প্রণবের ছোট বোন রীণা আর ভগ্নীপতি সুদেব এসে পেট ভরতি খাবারের ব্যবস্থাও করল। ফুলশয্যার রাত। প্রণবের ফুল আনবার গরজ নেই। কিন্তু ফুল ছাড়া কি চলে? রাণী প্রচুর গোলাপ আর রজনীগন্ধা নিয়ে এল। ঘর ঝারল, বিছানা পাতল, শিপ্রাকেও

সুন্দর করে পুষ্পমালায় সজ্জিত করল। আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'দাদার রকম সকম দেখে ভয় পেয়োনা বউদি। ওপরটা রুঠো হলে কি হবে, ভিতরে ভাবি নরম।

শিপ্রা চুপ কবে রইল।

শাশুড়ী রোগা। বয়সও হযেছে। ছেলেমেয়ে দুটি বোধ হয় বেশী বয়সের সন্তান।

তিনি বললেন, 'আমাব ছেলের একটু একটু পাগলামী আছে। তোমাকে সহ্য করে নিতে হবে বউমা। দেখে শুনে মনে হচ্ছে তুমি পারবে।'

এসব কিসের ভূমিকা বুঝতে না পেবে শিপ্রা চুপ করে রইল। একটু একটু অস্বস্তি লাগছে বইকি। কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ কি।

অমিয়বাবু বিদায় নেওয়ার আগে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হেসে বললেন, 'কীরে সব পছন্দ হয়েছে তো ?'

শিপ্রা হাসি মুখে বলল, 'হ্যাঁ বাবা।'

তারপর তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে হঠাৎ তাঁকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল।

অমিয়বাবু সস্নেহে মেয়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলালেন। খোঁপাটা যুঁইয়ের মালায় ঢেকে গেছে। ঘর ভরতি ফুলের মিষ্টি গন্ধ। শুতে আসবার আগে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রণব একটি সিগারেট শেষ করল।

তারপর শিপ্রার কাছে সরে এসে বলল, 'তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি !'

শিপ্রা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।'

তারপর একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি ? সত্যি জবাব দেবে ?' প্রণব বলল, 'কেন দেব না ?'

শিপ্রা বলল, 'তোমার কি এ বিয়েতে ইচ্ছে ছিল না ? তুমি কি শুধু তোমার মায়ের পীড়াপীড়িতেই বিয়ে করেছ ?'

প্রণব বলল, 'কে বলেছে এ কথা ?'

শিপ্রা বলল, 'কে আবার বলবে ? আমিই বলছি।'

প্রণব একটু চুপ করে থেকে শিপ্রাকে হাত ধরে এনে খাটের ওপর বসাল। নিজেও বসল তার পাশে। তাবপর আস্তে আস্তে বলল,

'তোমাকে আজ কেউ কিছু না বললেও হয়তো দুদিন বাদে বলবে। নানা রকম ভাবে বিকৃত হয়ে ঘটনাটা তোমার কাছে যাবে। তার চেয়ে আমার মুখ থেকেই তুমি প্রথম শোন সেই ভাল।'
শিপ্রা কিছু একটা আন্দাজ করে বলল, 'আজ না বললেই নয়?'
প্রণব একটু হাসল, কেন! শুভরাত্রি বলে? রাত্রির তো অনেকখানি বাকি। অশুভ অংশটুকু গোড়াতেই কেটে যাক। আমি কালহরণ করতে চাইনে।—একটি মেয়েকে আমি ভালবাসতাম। গরীবের মেয়ে। কিন্তু পরমা সুন্দরী। আমাদের পাড়াতেই তারা থাকত। বাপ ছিলেন প্যারালিসিসের রোগী। মা সামান্য কাজকর্ম করতেন। তাঁদের আরও দুটি ছেলেমেয়ে ছিল। আমি সাধ্যমত ওদের সাহায্য করতাম, মেয়েটি পড়াশোনায় যা এগিয়েছিল তা আমার জন্যেই। সবাই জানত আমাদের বিয়ে হবে। কিন্তু আমার শরীরে রোগ দেখা দিল। সব চেয়ে আগে ধরল আমার ঠোঁট। আমার রোগ যত বাড়ে মেয়েটির মুখ তত কালো হয়। আমার মনে হল সে আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। কিন্তু আমি আমার অধিকার ছাড়ব কেন। একদিন আমাদের বাড়িতে সে বেড়াতে এল সন্ধ্যাবেলা। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি তাকে নিরিবিলিতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে গেলাম। সে ছিটকে আমার হাত থেকে সরে গিয়ে বলল, দোহাই আমায় তুমি চুমু খেয়ো না। আর সব করো। ওই টুকুই যথেষ্ট। আমি ওর বাবা মাকে জানিয়ে দিলাম তারা মেয়ের অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে পারেন। বললাম, ওকে আমার বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে তাঁরা দুজনেই মেয়েকে খুব বকলেন। দিন দুই পরে আমাদের পাশের পুকুরটায় ওর মৃতদেহ ভেসে উঠল। তখন এ অঞ্চলে খুব পুকুর টুকুর ছিল। এখন সেগুলি ভরাট হয়ে গেছে। তার ওপর বড় বড় বাড়ি উঠেছে।'
শিপ্রা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর। এর পরেও তুমি বিয়ে করতে পারলে?'
প্রণব আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ পারলাম। অনেকদিন তো হয়ে গেল। আমি আবার একটা দীঘি ভরাট করতে চাই।'

ব্যাপারটা আজকাল বিজনের প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজ একবার করে জুয়েলার বন্ধু সাধন সরকারের দোকানে এসে বসে। সাধনের যেদিন মেজাজ ভাল থাকে সে বন্ধুকে এক কাপ চা খাওয়ায়। বিনিময়ে বিজন কেস খুলে তাকে একটা সিগারেট দেয়। লাইটার জেবলে সিগারেটটা ধরিয়েও দেয়, নিজেও একটা ধরায়। সাধনকে ব্যস্ত দেখলে ও আর নিজে থেকে কোন কথা বলে না। সাধন হুকুমের ভঙ্গিতে কারিগর কর্মচারীদের উপদেশ নির্দেশ দেয়। আবার গলার স্বর বদলে হাসিমুখে আপ্যায়ন অভ্যর্থনা করে। দোকানে যারা আসে তারা বেশির ভাগই মেয়ে। তরুণী, প্রৌঢ়া, কুমারী, সধবা সাধনের এই রত্নভাণ্ডারে পায়ের ধুলো দেন। বিজন সকালের বাসি খবরের কাগজখানার চোখ বুলায়। তারপর সিগারেটটা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। সাধন যদি ব্যস্ত না থাকে একটু হেসে তাকিয়ে বলে, 'কী রে চললি ?'

বিজন জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, টিউশনি আছে।'

আজও টিউশনির কথা বলে উঠে চলে যাচ্ছিল বিজন, সাধন ওকে হাত ধরে টেনে পাশের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল, 'আরে বোস বোস। আর একটা সিগারেট দে তো। এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে যাবি কোথায়।'

ক'দিন ধরে আবহাওয়াটা ভাল যাচ্ছে না। থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। এবার বর্ষাটা এল বড় দেরিতে। কাল পেরিয়ে। ভাদ্র-আশ্বিনে এমন বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায় না। আবহাওয়ার জন্যেই হোক, কি অন্য কোন কারণেই হোক সাধনের দোকানে খদ্দের-লক্ষ্মীদের আনাগোনা ক'দিন ধরে বড় কমে গেছে। পঞ্জিকায় দু-তিন মাসের মধ্যে আর বিয়ের তারিখ নেই। সাধনের মনমেজাজ বড় খারাপ। প্রায়ই কথাটথা বলে না। কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। বর্ষাবৃষ্টিতে কি ওর মন রসসিক্ত হয়ে

উঠেছে, না কি মোটা কোন অর্ডারটর্ডার পেয়েছে কে জানে?
বিজন বলল, 'ছাতা আছে। বৃষ্টিতে কোন অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া কয়েক পা হেঁটে গেলেই তো ট্রাম বাস পাব।'
সাধন বলল, 'তুই পারিসও এত ছুটো ছুটি করতে। এত বড় কলকাতা শহরটাকে তুই একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ছাড়লি।'
বিজন বন্ধুর মুখের সিগারেট ধরিয়ে দিল। নিজেও ধরাল। তারপর একটু হেসে বলল, 'না পেরে উপায় কি। আমি তো আর তোর মত এক জায়গায় দোকান পেতে বসি নি, আমাকে হাটে হাটে গাওনা করেই বেড়াতে হবে।'
সাধন হেসে বলল, 'তা ঠিক, আচ্ছা এ পর্যন্ত কত মেয়েকে তুই গান শেখালি বিজু?'
বিজন বলল, 'গান শুধু মেয়েদের কেন ছেলেদেরও শিখিয়েছি। কিন্তু কতজনকে শিখিয়েছি তার কি ঠিক আছে? তুই এ পর্যন্ত কত খদ্দেরের কাছে গয়না বিক্রি করেছিস তার হিসেব রেখেছিস?'
সাধন বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। তবে দু'একজন খদ্দেরের মুখ কিন্তু মনে থাকে। তুইও তো কোন কোন ছাত্রীর মুখ ভুলতে পারিসনি। আচ্ছা বিজু তোর সেই আংটির কিনারা হল?'
নিজের অনামিকার দিকে বিজন একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'না, কোথায় আর হল? যা গেছে গেছে। ও আর ফিরবে না।'
সাধন বলল, 'তা হলে বল, তোকে আর একটা সেটিংয়ের আংটি করে দিই। আমিই তো করে দিয়েছিলাম সেই আংটি। তার চেয়েও ভাল করে তৈরি করে দেব। সেই রকম চুনি আর পান্না দিয়ে। শো-কেসটা খুলব? দেখবি দু'একটা ডিজাইন?'
সামনেই বড় একটা কাঁচের শো-কেস। তাতে নানা রকমের গয়নার নমুনা রয়েছে। সবই মেয়েদের গয়না। বালা, ব্রেসলেট, দুল, হারের কয়েক রকম ভ্যারাইটি। সেই সঙ্গে আংটির ভ্যারাইটিও আছে। সাধারণ আংটি, দামী পাথর বসানো আংটি।
সেদিকে তাকিয়ে সাধন বলল, 'একটা আংটি তোকে দিয়ে দিই কী বলিস? তোর এত আংটির শখ। টাকা তুই যখন পারিস দিস।'

বিজন বলল, 'টাকার কথা ভাবছি না সাধন। আংটি পরার শখ আমার চলে গেছে। এক শখ কি আর মানুষের চিরকাল থাকে।'
সাধন বলল, 'কী জানি থাকে কিনা। আমার তো মনে হয় কোন কোন শখ মানুষের চিরজীবন থাকে। কোন কোন নেশা মানুষ জীবনেও ছাড়তে পারে না।'
বিজন কোন কথা বলল না।
সাধন বলল, 'আমার খারাপ লাগে তোর সব ক্ষতির জন্যে নিমিত্তের ভাগী হয়ে রইলাম। শ্যামলীদের সঙ্গে এই দোকানে আমিই তো তোর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তবে আমি মাঝে মাঝে তোকে সাবধানও করে দিয়েছি। বিজু, একটু সমঝে চলিস, সমঝে চলিস। তখন যদি আমার কথা তুই শুনতিস—'
বিজন ছাতাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'ছেড়ে দে ও সব পুরোন কথা। তোর কোন দোষ নেই। আমি কি কোনদিন তোকে দোষারোপ করেছি ?'
মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আর মোটাসোটা একজন ভদ্রমহিলা দোকানে এসে ঢুকলেন। সাধন এখন খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। বিজন এই সুযোগে—প্রায় বন্ধুর অলক্ষ্যে দোকান থেকে বেরিয়ে এল।
বাইরে এসে ছাতাটা খুলে ফেলল। খুব জোরে না হলেও বৃষ্টি পড়ছে। আজ আর চায়ের কথা বলেনি সাধন। কোন কোন দিন সে নিজেই ওর কাছ থেকে এক কাপ চা চেয়ে খায়, সাধন যেমন সিগারেট নেয় চেয়ে। কিন্তু আজ কথায় কথায় চায়ের কথাটা চাপা পড়ে গেছে। এখন বিজনের মনে হচ্ছে এক কাপ চা পেলে হত। এই বৃষ্টির দিনে শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করে। সময়মত এক কাপ চা না পেলে মাথা ধরে, মেজাজ বিগড়ে যায়। বিজন যে চা-খোর তা নয়। তিন-চার কাপ সারা দিনে সে খায়। কিন্তু সেই কয়েক কাপ সময়মত না হলে তার চলে না।
রাস্তার মোড়ে সুরুচি রেস্টুরেণ্ট। বিজন মাঝে মাঝে এখানে আসে। চা-টা এরা ভালোই করে। চপ কাটলেটও মন্দ করে না। কিন্তু পেটের গোলমাল আছে বলে ও সব খাবারও নিতান্ত দায়ে

না পড়লে বাইরে এসে খায় না।
হলঘরে ভিড় রয়েছে বলে বিজন বাঁ দিকের একটা কেবিনে ঢুকে পড়ল। সারি সারি গুটি চারেক কেবিন। তার একটি এখনো খালি আছে।
বয় এসে সামনে দাঁড়ায়, 'বাবু, আপনার সঙ্গে কি অন্য লোক আছে?'
বিজন ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কেন?'
ছেলেটি বলল, 'বাইরেও জায়গা ছিল। যাঁরা মেয়েদের নিয়ে আসেন কেবিন তাঁদের দিতে হয়।'
বিজন গম্ভীরভাবে বলল, 'আরো একজনের আসবার কথা আছে। চট করে এক কাপ চা দাও তো।'
'শুধু চা?'
বিজন বলল, 'হ্যাঁ, এখন এক কাপ চা-ই দাও।'
বয় চলে গেলে বিজন নিজেই পর্দাটা ফেলে দিল কেবিনের। পাশের কেবিনটি থেকে একটি মেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে। একটু বাদে খিলখিল হাসির শব্দ। ভারি মিষ্টি গলা। হয়তো গানটানও জানে।
তারপর নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল বিজন। রেস্টুরেণ্টের ছেলেটাকে হঠাৎ অমন একটা মিথ্যা কথা কেন বলতে গেল বিজন? সে তো সত্যিই আর কারো জন্যে অপেক্ষা করছে না। আজ কারোরই আসার কথা নেই। কোনদিনই কেউ আর আসবে না তার। নিরিবিলি এই কেবিনটুকুতে খানিকক্ষণ বসবার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই কি বিজন ওই হাফপ্যাণ্ট-পরা ময়লা গেঞ্জি গায়ে ছেলেটাকে ভাঁওতা দিল? নাকি এর মূলে আরো কিছু আছে? হাতে সময় থাকলে নিজের একেকটা আচরণের উৎসমূল সন্ধান শুরু করে বিজন। বেশ লাগে। সময়টা বেশ কাটে। এ যেন নিজের হাতে নিজের শবব্যবচ্ছেদ।
আসবার কথা নেই সত্যি। কিন্তু বিজন চাটুয্যের মত একজন ব্রাহ্মণের মুখের বাক্যকে বেদবাক্য করে তোলবার জন্যে কোন অঘটন কি ঘটতে পারে না? জীবনে নাটকীয় ঘটনা কি একেবারেই সংঘটিত হয়নি?

ছেলেটা এক কাপ চা এনে রেখে গেল। বিজন আস্তে আস্তে চায়ের কাপটিতে ঠোঁট ছোঁয়াল। যেন কোন মেয়ের অধর-স্পর্শ করছে।

ভালো হোক মন্দ হোক জীবনের আকস্মিকতার অস্তিত্ব অস্বীকার কবা যায় না।

সাধনের দোকানে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা সেও তো হঠাৎ দেখাই। সে দিনের সন্ধ্যাটা এমন বৃষ্টিভেজা প্যাচপ্যাচে ছিল না। বৈশাখ মাসের চনচনে রোদের পর বিকালের দিকে গরমটা পড়ে গিয়েছিল। হাওয়া দিচ্ছিল মৃদু মৃদু। আবহাওয়াটা ভারি ভাল লাগছিল। সাধনের মেজাজটা সেদিন ভাল ছিল। সিগারেট টানতে টানতে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল বিজন। সেদিন টিউশনির কোন তাড়া ছিল না।

একটু বাদেই সাধনেব খদ্দেরলক্ষ্মীরা ঘরে ঢুকলেন। দুটি যুবতী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একটি প্রৌঢ়া মহিলা এসে দাঁড়াতেই সাধন উল্লসিত হয়ে উঠল, 'আসুন মিসেস রায়, আসুন। অনেক দিন আপনাদের পায়ের ধুলো পড়েনি।'

মহিলাটি মৃদু হাসলেন। সঙ্গের মেয়ে দুটির মত সাজসজ্জাতেও চটক আছে। ঠোঁটে লিপস্টিকের প্রলেপ একটু পাতলা এই যা।

তিনি হেসে বললেন, 'সময় ছিল না সাধনবাবু। বড্ড ব্যস্ত ছিলাম।'

গদিআঁটা চেয়ারগুলি দেখিয়ে দিয়ে সাধন বলল, 'বসুন বসুন। আপনারা কত কাজের লোক। আমাদেরই বসে বসে দিন কাটে।'

দুটি মেয়েব মধ্যে যেটি ছোট সে বলল, 'আপনি কি নবদ্বীপ ঘুরে এসেছেন নাকি সাধনবাবু?'

সাধন বলল, 'কেন বলতো?'

মেয়েটি বলল, 'বৈষ্ণবের মত বিনয় শুরু করেছেন তাই বলছি।'

সাধন এবার বিজনের দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মহিলাটিকে বলল, 'আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই মিসেস রায়, বিজন চ্যাটার্জি। গান-বাজনা নিয়ে আছে। সব রকমের গানই জানে। শেখায় আরো ভাল। সবাই তা পারে না মিসেস রায়। নিজের বিদ্যা পেটের মধ্যে ভরে রাখে। দিতে জানে না।'

মিসেস রায় বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। সব আর্টিস্ট শেখাতে পারে না।'

সাধন বলল, 'মেয়েদের জন্যে আপনি যে একজন গানের শিক্ষকের কথা বলেছিলেন, এখনো কি তার দরকার আছে?'

মিসেস রায় মৃদু হেসে বললেন, 'আছে বইকি। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। একদিন দয়া করে আপনার বন্ধুকে নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়িতে। একটু গান-বাজনা শুনি।'

সাধন বলল, 'বেশ তো তা যাওয়া যায় একদিন। আমার এই বন্ধুটি সেদিক থেকে খুব ভাল ছেলে। কোন গুমোর নেই। যাঁরা গান-বাজনা ভালবাসেন তাঁদের বাড়িতে যেতে ও ওজর-আপত্তি করে না। কী বলো বিজন, যাবে তো একদিন?'

বিজন সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দেয়নি। শুধু হেসে বন্ধুকে বলেছে, 'তোমার সময় হওয়াই তো শক্ত।'

তারপর ভদ্রমহিলা কি একটা জরুরী কথা বলবার জন্যে সাধনকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মেয়ে দুটি শো-কেসের গয়নাগুলি দেখতে লাগল।

সেদিন শ্যামলীর সঙ্গে বিজনের প্রায় কোন কথাই হয়নি। সাধন শুধু ওদের নাম বলে দিয়েছিল। বড়টি শ্যামলী, ছোটটি সুস্মিতা। দুজনেই বি. এ. পড়ে। শ্যামলীর বয়স অন্তত তেইশ চব্বিশের কম হবে না। ছোটটির উনিশ কুড়ি। এই বয়সে আজকালকার ছেলেমেয়েরা কলেজের গণ্ডীতে আটকে থাকে না। হয়তো ওদের পড়াশোনা আরম্ভ করতে দেরি হয়েছে। কিংবা মাঝখানে কোন বাধা পড়েছে। লোকসান হয়েছে দু'এক বছর। বিজন লক্ষ্য করল সহোদরা দুই বোন ঠিক এক বৃন্তে দুটি ফুল নয়। ছোটটি দৈর্ঘ্যে একটু খাটো। কিন্তু রঙ বেশ ফর্সা। চোখ দেখলেই বোঝা যায় যেমন চঞ্চল তেমনি চতুর। বড়টি অন্য রকমের। দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা। শান্ত গম্ভীর। একটু যেন বিষণ্ণ। চোখ মুখের গড়ন ওরই সুন্দর। আশ্চর্য, ওই মুখ অনেকদিন আগে দেখা আর একটি চেনা মুখকে কেন মনে করিয়ে দিয়েছিল বিজনকে? সেই মুখের সঙ্গে এই মুখের খুব কি একটা

মিল আছে? হয়তো পাতলা ঠোঁট দুটির গড়নের সঙ্গে একটু মিল আছে, বড় বড় দুটি চোখের ঘন কালো তারার সঙ্গে, তাকাবার ভঙ্গির সঙ্গে একটু মিল আছে। কিন্তু সেই তিলপ্রমাণ মিলটুকুই সেদিন বড় হয়ে উঠেছিল বিজনের কাছে। এও কম আকস্মিকতা নয়।

মিসেস রায় একটু বাদেই বেরিয়ে এলেন। সাধনের সঙ্গে আরো দু'একটি কথাটথা বলে বিজনকে একবার যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

অনেকদিন পরে বিজন জানতে পেরেছিল মহিলাটি সাধনের দোকানে নতুন গয়না কিনতে আসেন নি, পুরোন গয়না বন্ধক রাখতে এসেছিলেন। যদিও যাওয়ার সময় একটি জড়োয়া হার নেড়েচেড়ে পছন্দ করে রেখে গিয়েছিলেন। কে জানে হয়তো বিজনকে দেখাবার জন্যই।

ওরা চলে যাওয়ার পর সাধন হেসে বলেছিল, 'কেমন লাগল আমার কাস্টমারদের?'

বিজন জবাব দিয়েছিল, 'ভাল।'

সাধন বলেছিল, ভাল বলে ভাল। অমন করে কাউকে দেখে? যতক্ষণ শ্যামলী এখানে ছিল তোর চোখের পাতা বলতে কিছু ছিল না। বিজু আর দেরি করিস নে। এবার বিয়ে-থা একটা কিছু করে ফেল।'

বিজন বলল, 'বাঃ! তুইও তো তিনটি ছেলেমেয়ের বাবা হয়েছিস। তাই বলে সুন্দরী মেয়ে দেখলে তুইই কি আর অন্ধমুনি হয়ে বসে থাকিস? সব আমার দেখা আছে।'

সাধন বলেছিল, 'তবু তোর দেখা আর আমার দেখা আলাদা। আমি খদ্দেরদের দেখি। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি কে কিনতে এসেছে আর কে আসেনি। তোর শুধু দেখেই সুখ। এখনো বলছি আমার কথা শোন। এবার বিয়ে কর।'

বিজন বলেছিল, 'দূর! বিয়ের বয়স কি আর আছে!'

সাধন জবাব দিয়েছিল, 'কে বললে নেই? সেজেগুজে যখন বেরোস মনে হয় ঠিক একটি নবকার্তিক। কে বলবে তোর বয়স তিরিশের

চেয়ে একটি সেকেণ্ডও বেশি বেড়েছে। নিজের বয়স থেকে তুই বেমালুম বছর দশেক কেটে বাদ দিতে পারিস। কারো সাধ্য নেই তোর চুরি ধরে।'

সেদিন আরো ঠাট্টা করেছিল সাধন। 'দেখেছিস বেশ করেছিস। দেখার সময়টুকুও বেশ ভালো বেছে নিয়েছিস বিজু। একেবারে কনে দেখা আলোয় দেখা।'

বিজন লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'যাঃ!'

সাধন তবু ছাড়েনি। হেসে বলেছিল, 'বলিস তো ঘটকালি করি। তোদের পালটি ঘর। সেবারের মত ভিন্ন জাতটাত নয়। ওরাও বামুন। ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে পাত্রের সন্ধানও করেন।'

বিজন হেসে বলেছিল, 'তোর এই গয়নার দোকানখানি কি মালটি-পারপাস স্টোর? এখানে বুঝি গরু হারালে গরু পাওয়া যায়?'

সাধন স্বীকার করে নিয়ে বলেছিল, 'যা বলেছিস। এখানে গানের টিচারও মেলে, মনের মত বন্ধুও মেলে আবার আইবুড়ো ছেলেও পাওয়া যায়। যে যা চায় সে তা পায়। আমার এই দোকান এক সর্বার্থসাধক রত্নভাণ্ডার।'

তারপর ঘটনাস্রোত খুব দ্রুত বেগে এগিয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন কোন ঘটনাই ঘটে না। মনে হয়, একটি দিন যেন আর একটি দিনেরই পুনরাবৃত্তি। আবার কোন কোন সময় তার উল্টোটি ঘটে। অপ্রত্যাশিত ঘটনাপুঞ্জ দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে।

মিসেস রায়ের বাড়িতে সাধন বিজনকে নিয়ে যায়নি। মিসেস রায় নিজেই এসেছিলেন তাকে নিমন্ত্রণ জানাতে। সঙ্গে ছিল ছোট মেয়ে স্মিতা। সুস্মিতার 'সু'-টুকু ও নিজেই কেটে বাদ দিয়েছে।

হরিশ মুখার্জি রোডের একটি ভাড়াটে বাড়ির একতলার দুখানি ঘর নিয়ে বিজনের সংসার। আপনজন যাঁরা আছেন তাঁরা দূরে দূরে থাকেন। এখানে সম্বল শুধু একটি ভৃত্য। সে-ই সব দেখা-শোনা করে।

তানপুরা নিয়ে রেয়াজে বসেছিল বিজন। নিকুঞ্জ অতিথিদের

একেবারে ঘরের সামনে নিয়ে এসেছে। ব্যস্ত হয়ে বিজন উঠে দাঁড়াল। সম্ভ্রান্ত অতিথিদের কীভাবে যে অভ্যর্থনা করবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি দুখানি বেতের চেয়ার নিয়ে এল পাশের ঘর থেকে। বলল, 'বসুন বসুন।'
মিসেস রায় বললেন, 'সে কি হয়। আপনি আর্টিস্ট, আপনি বসবেন নিচে, আর আমরা নিগুর্ণ হয়ে চেয়ার জুড়ে বসে থাকব ? অসময়ে এসে আপনার সাধনার ব্যাঘাত ঘটালাম। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। ভাবলুম আপনার বাড়িটা দেখে যাই। দোকানের নিমন্ত্রণ তো আপনি গ্রহণ করেননি। সেই ত্রুটির জন্যে মার্জনা চাইতে এসেছি।'
বিজন বলল, 'কী যে বলেন, ত্রুটি আবার কিসেব ?'
মিসেস রায় বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় আসুন আমাদের বাড়িতে।'
বিজন বলল, 'কেন, কাল কি কোন অনুষ্ঠান আছে ?'
স্মিতা বলল, 'বিনা অনুষ্ঠানে আপনি বুঝি কোথাও যান না ?'
মিসেস রায় বললেন, 'আপনার যাওয়াটাই তো একটা অনুষ্ঠান।'
তবু বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'আর কাউকে কি বলেছেন ?'
স্মিতা বলল, 'আপনি কি দলবল ছাড়া একা কোথাও যান না ?'
মেয়েটি একটু বেশি প্রগলভা। কিন্তু তেমন খারাপ লাগল না বিজনের। যে ভাল কথা বলতে পারে তার অনেক ত্রুটি ক্ষমা করা যায়।
মিসেস রায় বললেন, 'না, আর কাউকে বলিনি। বলবও না। কালকে আপনিই আমাদের প্রধান অতিথি। আর একমাত্র অতিথি।'
গান বাজনা উপলক্ষে নানা বয়সী নানা ধরনের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গেই তো মিশতে হয়েছে বিজনকে। কিন্তু মিসেস রায়ের মত এমন বাকপটুতা সে খুব কমই দেখেছে। দেখতে তিনিও সুশ্রী। ছোট মেয়ে স্মিতা অনেকটা ওঁরই গড়ন, ধরনধারণ পেয়েছে।
নিকুঞ্জকে চা করতে বলল বিজন। দোকান থেকে সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করল।
স্মিতা বলল, 'সকাল বেলায় এত মিষ্টি কে খাবে বলুন তো।'
বিজন বলল, 'খাও খাও! ছেলে মানুষ, তোমাদের আবার সকাল

বিকাল কি।'

যাওয়ার সময় স্মিতা একান্তে চুপি চুপি বিজনকে বলেছিল, 'জানেন, দিদির কাল জন্মদিন। আগে অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান হত। এখন আর কিচ্ছু হয় না। দিদিই সব বাদ দিয়েছে। আপনি যেন বলবেন না দিদিকে।'

বিজন বলল, 'তা না হয় না বললাম। তোমার জন্মদিন কবে?'

স্মিতা হেসে বলেছিল, 'তার অনেক দেরি আছে। যেদিন আসবে সেদিন আপনাকে বলব।'

'তোমার জন্মদিনে বুঝি খুব ঘটপেটা হবে?'

'মোটেই না। ছেলেবেলায় স্কুলের বন্ধুদের ডাকাতাম। এখন আর কাউকে ডাকা হয় না। আমার জন্মদিনও নিঃশব্দে আসে. নিঃশব্দে চলে যায়। এবার যদি অন্য রকম হয়।'

'কেন?'

স্মিতা হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে। অন্তত গান বাজনাটাতো হবে।'

একা থাকার ব্যবস্থাটা নিজেই কবে নিয়েছে বিজন। কিন্তু একক আতিথ্যের আমন্ত্রণ তো জীবনে বেশি জোটেনি। মিসেস রায়ের নিমন্ত্রণ তাই সে প্রত্যাখান করতে পারল না। খানিকটা কৌতূহলও ছিল। নতুন আলাপ পরিচয় সম্বন্ধে তাব এখনো ঔৎসুক্য রয়েছে। গানের টিউশনিতে না গিয়ে তাই সে নিমন্ত্রণ রাখতেই গিয়েছিল। শ্যামলীর জন্মদিনের কথা ভেবে নিয়ে গিয়েছিল একখণ্ড গীত-বিতান আর এক ডজন রজনীগন্ধা। স্টিকগুলি বেশ সতেজ সবুজ আর পুষ্ট ছিল।

ল্যানসডাউন রোডের তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে শ্যামলীদের ফ্ল্যাটটি খুঁজে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। সোফাসেটে সাজানো ড্রয়িং রুম। জানালায় দরজায় সবুজ রঙের পর্দা। রেডিওসেট, কাঁচের আলমারিতে নানা জায়গায় ছোট ছোট শিল্পকর্মের নমুনা। মাটির ঘোড়া, শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি। নৃত্যরত নটরাজ।

বসবার ঘরখানি বেশ সুন্দর আর শোভন লেগেছিল বিজনের। এ ধরনের গৃহসজ্জা শহরের আরো অনেক মধ্যবিত্ত বাড়িতে অনেক

দেখেছে বিজন। নতুনত্ব কিছু নেই। তবু একটু অভিনবত্বের স্বাদ বিজনের মনে কেন যেন লেগে রয়েছিল।

দুটি মেয়েকে নিয়ে মিসেস রায় তাকে স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

শ্যামলী সামনে আসতেই বিজন তাকে গানের বই আর ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছিল।

শ্যামলী একটু যেন অবাক হয়ে বলেছিল, 'এসব কেন ?'

বিজন বলেছিল, 'অমনিই।'

স্মিতা বলেছিল, 'বারে আমি বুঝি কিছু পাব না ? ভারি তো পক্ষপাত আপনার।'

ওর নিষেধ ভুলে গিয়ে বিজন বলে ফেলেছিল, 'তোমার জন্মদিনে তুমিও পাবে।'

'আপনি বুঝি ভেবেছেন—' বোনের দিকে তাকিয়ে শ্যামলী আর কথাটা শেষ করেনি।

একটু খটকা লেগেছিল বিজনের। তবে কি সত্যিই আজ শ্যামলীর জন্মদিন নয় ? স্মিতা তার সঙ্গে কৌতুক করেছে ?

বেরোবার মুখে গৃহকর্তা ব্রজেন রায় বিজনের সঙ্গে অল্প একটু আলাপ করেছিলেন, 'আপনি এসেছেন, আপনার মত গুণী ব্যক্তির পায়ের ধুলো পড়েছে এখানে, খুব খুশি হলাম। সেই সঙ্গে দুঃখও হচ্ছে থাকতে পারব না বলে। জরুরী কাজের জন্যে বেরোতে হচ্ছে।'

বিজন বলেছিল, 'রাত্রেও আপনার কাজ ?'

মিস্টার রায় বলেছিলেন, 'কাজের কি আর দিন রাত আছে বিজন-বাবু ? এক সময় সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতে আমারও আকর্ষণ ছিল। এখন সব গেছে।'

মিস্টার রায়ের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি নেই, ছাই রঙের ট্রাউজারস আর সাদা সার্ট। বেশ মোটাসোটা বড় চেহারা। চুলে পাক ধরেছে। বয়সের অনুপাতে বেশ খানিকটা অস্থির আর চঞ্চল বলে তাঁকে মনে হল বিজনের। কিন্তু মৃদু হেসে সে-ই আগে গৃহকর্তাকে বিদায় জানাল, 'তাতে কি হয়েছে, আপনি আগে কাজ সেরে আসুন। পরে

আর একদিন আলাপ পরিচয় হবে।'
তিনি বললেন, 'এইতো গুণীজনের মত কথা।' পিছনের দিকে তিনি একটু তাকিয়ে হেসে চলে গেলেন। তাঁর গলার স্বরে তাঁর হাসির ভঙ্গিতে কি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল? সেদিন অন্তত তা ধরতে পারেনি বিজন।
জলযোগের পর গান বাজনার আয়োজনও সেদিন একটু হয়েছিল। বিজন শ্যামলীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী গান তোমার শেখার ইচ্ছা বল। তুমি এতদিন কী শিখেছ।'
শ্যামলী বলেছিল, 'শেখার ইচ্ছা তো ছিল অনেক। শুনেছি ক্লাসিক্যালের ভিত্তি না থাকলে কিছুই শেখা যায় না। তাও শুরু করেছিলাম।'
'তারপর?'
'তারপর খানিক দূর এগোতে না এগোতে তাও ছেড়ে দিলাম।'
বিজন বলেছিল, 'বেশতো, বাংলা গান শেখ। বাংলা রাগ সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুলপ্রসাদের গান কীর্তন ভজন যা তোমার ভাল লাগে—। সব গানই গান। কিন্তু লেগে থাকতে হবে।'
শ্যামলী বলেছিল, 'তা কী করে লেগে থাকতে হয় আগে সেটা আমাকে শিখিয়ে দিন।'
মিসেস রায়ের অনুরোধে সেদিন হারমনিয়ামটা টেনে নিয়ে পর পর কয়েকখানা গান বিজন ওদের শুনিয়েছিল।
তিনজনেই খুব সুখ্যাতি করেছিল। তার মধ্যে শ্যামলীর মুগ্ধতার যেন অন্ত ছিল না। বলেছিল, 'কী চমৎকার গলা আপনার। এর সামান্য একটুও যদি পেতাম।' প্রশংসা আরো অনেক শুনেছে বিজন। কিন্তু শ্যামলীর মুখের ওই সুখ্যাতিটুকু, চোখের ওই মুগ্ধতাটুকু মনে হয়েছিল অভূতপূর্ব। এই প্রাপ্তি যেন জীবনের শুষ্ক মূলকে নতুন রসে সঞ্জীবিত করে। শিল্প সাধনার পথে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আসে।
দক্ষিণার কথাটা জানতে চেয়েছিলেন মিসেস রায়। কিন্তু বিজন সঠিক কিছুই বলেনি। বরং একটু হেসে বলেছিল, 'ও নিয়ে ভাববেন না। ওতে কিছু আটকাবে না।'

স্মিতা অবশ্য তার কাছে শিষ্যত্ব নেয়নি। বিজন বলেছিল, 'তুমি শিখবে না গান ?'
স্মিতা জবাব দিয়েছিল, 'ওরে বাবা, আমার দ্বারা গান হবে না। গলাই নেই। মা বলেন তোর শুধু ঝগড়ার গলা আছে।'
শ্যামলী বলেছিল, 'ও গীটার শেখে।'
তারপর মাস খানেক যেতে না যেতে ওরা আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। দুজনেই বিজনকে বিজনদা বলে ডাকে। মিসেস রায়ও তুমি বলতে শুরু করলেন। বলবার আগে একটু অনুমতি চেয়ে নিলেন। হেসে বললেন, 'মেয়েরা তোমাকে বিজনদা বলে, আমি আপনি আপনি করলে নিজের কানেই যেন কেমন লাগে।'
বিজন বলল, 'কী দরকার, আপনি তুমিই বলবেন।'
শুধু সম্বোধনে নয়, আদরে আপ্যায়নে ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়িয়ে দিলেন মিসেস রায়। বাড়িতে এলেই চা করা, জলখাবার তৈরি করতে বলা। মুখ ধুতে না ধুতেই তোয়ালে নিয়ে শ্যামলী এসে কাছে দাঁড়ায়। পান সেজে দেয়। বিজনের মনে হয় এমন সেবা যত্ন সে যেন অনেকদিন পায়নি।
বিজন বলে, 'আপনারা এত করেন, আমার খুব সঙ্কোচ লাগে।'
মিসেস রায় বলেন, 'সঙ্কোচ কিসের। তোমাকে তো আমরা পর বলে ভাবিনে। যারা আমাদের সঙ্গে মেশে তারা আমাদের আত্মীয় হয়ে যায়। তুমিও তাই হয়েছ।'
এ বাড়িতে আরো কিছু কিছু যুবকের আনাগোনা অবশ্য লক্ষ্য করে বিজন। তাদের কেউ বা স্পোর্টসম্যান, কেউ বা বিজনেস করে. কেউ বা মোটা মাইনের চাকুরে। তবে তারা বেশির ভাগই স্মিতার বন্ধু। শ্যামলীর সঙ্গে তাদের মেলামেশা কম।
সাধনের কাছে মাঝে মাঝে গল্প করতে যায় বিজন। একদিন সাধন তাকে হেসে বলল, 'তোর সম্বন্ধে মিসেস রায় যে খুব ইনটারেস্ট নিচ্ছেন। ব্যাপারটা কি রে।'
বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'কিরকম ?'
সাধন বলল, 'জিজ্ঞেস করছিলেন তোর কে আছে না আছে, কী আছে না আছে। আমি বলে দিয়েছি বিজনকে শুধু একজন গানের

মাস্টার বলে ভাববেন না। ওর ব্যাঙ্ক ব্যালানস আছে। নর্থ ক্যালকাটায় বাড়ি আছে খান দুই। তার ভাড়া পায়। সব টাকা ব্যাঙ্কে জমায়।'

'যাঃ, ওসব কথা কেন বলতে গেলি। সত্যিই তো আমার তেমন কিছু নেই।'

কে জানে সত্যিই সাধন ওইরকম বাড়িয়ে বলেছিল কিনা, নাকি ঠাট্টা তামাশাই করেছিল, মিসেস রায় বিজনের কাছে ধার চাইতে শুরু করলেন।

প্রথম দিন ভিতরের ঘরে ডেকে নিয়ে গোপনে ফিসফিস করে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না বিজন, হঠাৎ বড় ঠেকে পড়েছি। তোমার কাছে শ' খানেক টাকা হবে?'

বিজন সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'এর জন্যে বরং—'

মিসেস রায় বললেন, 'বেশ কাল শ্যামলী যাবে তোমার কাছে। ওর হাতেই দিয়ে দিয়ো টাকাটা।'

বিজন সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'এর জন্যে আবার শ্যামলীকে পাঠাবেন কেন।'

মিসেস রায় বললেন, 'গেলই বা। তোমার বাড়ি তো আর আমি অন্যের বাড়ি বলে মনে করিনে বিজন। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। শ্যামলীও তোমাকে ভালবাসে, ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ওর যদি ভাগ্যে থাকে তোমার বাড়ি একদিন ওর বাড়িও তো হতে পারে। তোমাকে আমি পর বলে মনে করিনে বিজন।'

পরদিন শ্যামলীই এসে টাকাটা নিয়ে গিয়েছিল। এর আগেও ওরা দু বোন মাঝে মাঝে এসেছে। এটা ওটা আবদার করেছে। খেতে চেয়েছে, বইটই নিয়েছে। কিন্তু টাকা নেওয়া এই প্রথম।

একশ' টাকার নোটখানা শ্যামলীর হাতে তুলে দিয়ে বিজন বলেছিল 'কিসের জন্যে টাকার এত দরকার হল বলতে পার?'

শ্যামলী মিষ্টি করেই বলেছিল, 'দরকার আছে। আপনি ভাববেন না, টাকাটা আমরা শোধ দিয়ে দেব।'

টাকাটা যে আর ফেরৎ পাবে না সে সম্বন্ধে বিজন প্রায় নিঃসন্দেহ ছিল। মিসেস রায় প্রথম মাসেই তাকে শুধু পঁচিশ টাকা মাইনে

দিয়েছিলেন, তারপরে আর দেননি। বিজনও আর চাইতে পারেনি। ইতিমধ্যে বিজন ওদের সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। গান শেখার শ্যামলীর খুব যে আগ্রহ আছে, কি অধিকার আছে তা নয়। গান একটা উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য অন্য কিছু। কে জানে কী সেই লক্ষ্য।

বিজন অনুমান করেছে মিস্টার রায়ের কনট্রাকটরির বিজনেসটা ভুয়ো। তিনি এখন আর কিছুই করেন না। কিছু না করেও কিসে মোটামুটি সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা যায় সেই চেষ্টা করেন। ওঁদের একটি ছেলেও আছে। সে বিয়ে থা করে আলাদাভাবে থাকে। এই পরিবারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

সেই একশ দিয়ে শুরু। তারপর দুশো চারশ, পাঁচশ। মিসেস রায়ের দরকারের আর শেষ নেই। কখনো শ্যামলী আসে, কখনো স্মিতা আসে।

যখন নগদ টাকা দিতে পারে না বিজন, দিতে দ্বিধান্বিত হয়, শ্যামলী স্মিতারা তাকে কাপড়ের দোকানে নিয়ে যায়। তিনজনের জন্যেই পছন্দমত শাড়ি কেনে।

স্মিতা বলে, 'বিজনদা টাকাটা আমাদের সঙ্গে নেই, দিয়ে দিন না। আহা, দু'দিন পরে প্রেজেন্ট করলেও তো করবেন। না হয় দুদিন আগেই করলেন।'

বিজন প্রতিবার প্রতিজ্ঞা করে ওদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না, আর একটি পয়সাও ওদের দেবে না। কিন্তু ওরা বিশেষ করে শ্যামলী সামনে এসে দাঁড়ালে বিজন যেন অন্যরকম হয়ে যায়। শ্যামলীর মুখ দেখে মনে হয় ওর কোন দোষ নেই। অমন সুন্দর কমনীয় মুখখানি যার সে কোন অন্যায় করতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয় শ্যামলী ওর মায়ের হাতের একটি অসহায় যন্ত্রমাত্র।

শ্যামলী মাঝে মাঝে বলে, 'তুমি আমাদের কী ভাবছ তা জানি, তোমার কাছ থেকে আমরা অনেক নিয়েছি। কিন্তু সব শোধ করে দেব। শোধ কি শুধু টাকায় হয়? আর কিছুতে হয় না?'

এমনি করে তার হাতের আংটিটাও শ্যামলী একদিন চেয়ে

নিয়েছিল। তার আগে ভূমিকা হিসাবে মিসেস রায় বলেছেন, 'তোমার ওই আংটিটা শ্যামলীর খুব পছন্দ।'
বিজন বলেছিল, 'বেশ তো এইরকম একটা আংটি ওকে গড়িয়ে দিলেই হবে।'
কিন্তু দেব দেব করেও বিজন দেয়নি। এখন সে একটু হিসাব করেও চলতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সে একটু দেখে নিতে চায়।
কিন্তু সেই সুযোগ শ্যামলী তাকে দিল না। বন্ধুর বিয়েতে যাওয়ার জন্যে সেজে গুজে তৈরি হয়ে এসে বলল, 'আমার হাতে আংটি নেই। দেবে তোমার ওই আংটিটা? একটু পরে বেরোব?'
বিজন আর কোন কথা না বলে আংটিটা নিজের আঙুল থেকে খুলে নিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়েছিল। ভালবেসে দেয়নি। ঘৃণা বিদ্বেষ, বঞ্চিত হবার জ্বালা সব কিছু সেই দানের মূলে ছিল. শুধু প্রেম ছিল না।
এই আংটির বদলে শ্যামলীর কাছ থেকে আর একটি আংটি পাবে এমন কথা প্রথম প্রথম ভেবেছে বিজন। তারপর বুঝতে পেরেছে সে কল্পনা অসার, অমূলক। তার সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছাই মিসেস রায়ের নেই। শুধু ছলছুতোয় টাকা আদায় করার অভিসন্ধিটুকু আছে।
যে আংটি সে পরম অনুরাগে দয়িতার হাতে পরিয়ে দিতে পারত, সেই আংটি শ্যামলী কেড়ে নিল। কে জানে নিজে পরবে না টাকার জন্যে একদিন বিক্রি করে দেবে।
তারপর থেকে হাত টান দিল বিজন। মিসেস রায় টাকা চাইলেই বলতে লাগল, 'এখন তো আমার কাছে টাকা নেই।'
গান শেখাতে যাওয়া বিজন বন্ধ করে দিল। সঙ্গীত তো তার কাছে ছলনার বস্তু নয়, সাধনার ধন।
স্মিতা একদিন বলল, 'তুমি কৃপণ হয়ে গেছ বিজনদা।'
বিজন বলল, 'স্থান বিশেষে হতে হয়।'
শ্যামলীও সেখানে ছিল। শুধু চোখ তুলে বিজনের দিকে একবার তাকাল। কোন জবাব দিল না।

তারপর মিসেস রায়েরা না বলে কয়ে পাড়া ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। শোনা যায় বাড়ি ভাড়া, মুদি দোকানের মাসকাবারির টাকা সব শোধ করে যাননি। তার অনেক আগে থেকেই স্মিতার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
সাধন মিথ্যা বলে না, বছর দুই হয়ে গেল, আংটিটার কথা বিজন আজও ভুলতে পারেনি। শূন্য আঙুলটার দিকে তাকালে কিসের একটা যন্ত্রণা যেন খচ করে বুকের মধ্যে বিঁধে যায় বিজনের। জিনিসটা ভারি শখের ছিল তার।
হারমোনিয়ম বাজাতে বাজাতে, কি তানপুরা ছাড়তে ছাড়তে শূন্য আঙুলটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় বিজন। ওস্তাদ বুড়ো সীতাপতিজী তাকে ধমক দেন, 'গানে তোর মন নেই বেটা, তুই ছেড়ে দে।'
কিন্তু ছাড়ি ছাড়ি করেও গান বিজন ছাড়তে পারে কই। গানের বিকল্প কি তার কাছে কিছু আছে?
বিজন মাঝে মাঝে ভাবে সে হয়তো ভুল করেছে। যথেষ্ট সাহস আর পৌরুষের পরিচয় দিতে পারেনি। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। বিজন কি জোর করে ওই পরিবেশ থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনতে পারত না? নিজের মনের মত করে গড়ে নিতে পারত না?
সাধন যাই বলুক শ্যামলী খাঁটি সোনা না হলেও একেবারে গিল্টি নয়। ওর মধ্যে দামী বস্তুও কিছু কিছু ছিল। মাঝে মাঝে তার স্ফুরণ দেখেছে বিজন।

রেস্টুরেন্টের সেই হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলেটা এর মধ্যে কয়েকবার এসে উঁকি দিয়ে গেছে। এক কাপ চা নিয়ে এতক্ষণ একটা কেবিন আটকে রাখা যায় না।
ছেলেটি এবার সামনে এসে দাঁড়াল, 'বাবু, আপনাকে আর কী দেব বলুন। আপনার বন্ধু কি আর আসবেন?'
বিজন বলল, 'আসবে বই কি। তুই দুটো প্লেট সাজা।'
'কী কী নেবেন বাবু?'

'একটা করে অমলেট একটা করে ফাউল কাটলেট—'
ছেলেটি অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছিল, বিজন তাকে ফের কাছে ডাকল,
'থাক কিচ্ছু আনতে হবে না।'
তারপর ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের করে তুলে দিল ওর হাতে।
ছেলেটি বলল, 'বাবু চেঞ্জটা নিয়ে আসি।'
বিজন বলল, 'চেঞ্জ আনতে হবে না।'
বয়ের মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল।

নদীর ধারে এই ছোট শহরটি এমন কিছু ভাল নয়। আসলে পাড়া-গাঁ। নামে মাত্র শহর। তবু এখানে এসে মালবিকার ভালই লাগল। অজ্ঞাতবাসের পক্ষে বেশ প্রশস্ত জায়গা। স্কুলের কয়েকজন কলীগ ছাড়া এখানে আর কেউ তাকে চেনে না। সেও কারো সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে কোনরকম উৎসাহবোধ করে না। স্বজনবন্ধুহীন এই নিঃসঙ্গ জীবনই ইদানীং তার কাম্য হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তাই সে পেয়েছে। আগে আগে কোন মফস্বল শহরে গিয়ে দু-চারদিনের বেশি সে কাটাতে পারত না। ছোট শহরের একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবন তাকে পীড়িত করে তুলত। কিন্তু এখন মালবিকার স্বভাব বদলে গেছে। এখন আর তার কলকাতার ভিড় ভাল লাগে না। শুধু অপরিচিতদের ভিড়ই নয় পরিচিত আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য আরো দুঃসহ লাগে। কলকাতার স্কুলেও একটা মাস্টারি জুটেছিল। কিন্তু সেই চাকরি না নিয়ে এই পঞ্চাশ মাইল দূরে মফস্বল শহরে কাজ নেওয়ায় মালবিকার বাবা বেশ একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কেন অতদূরে যাবি। শ্যাম-বাজারের স্কুলে কাজটা নিলে বাড়ির ভাত খেয়ে চাকরি করতে পারতিস। যাতায়াতের ট্রাম-বাস ভাড়া বাদ দিলে প্রায় পুরো টাকাটাই তোর বেঁচে যেত। কিন্তু ওখানে গিয়ে কটা টাকাই বা রাখতে পারবি। হস্টেল খরচাতেই তো তোর মাইনের বারো আনি বেরিয়ে যাবে। আমি তোর সাহায্য চাই নে। কিন্তু নিজের জন্যেও তো তুই কিছু রাখতে পারবি নে।'

মালবিকা বলেছিল, 'আমি তো রাখতে চাই নে বাবা।'

ভবেশবাবু বলেছিলেন, 'তবে চাকরি নিয়েছিস কেন। যাচ্ছিস কী জন্যে।'

মালবিকা রূঢ়ভাবে জবাব দিয়েছে, 'যাচ্ছি কলকাতা আর ভাল

লাগছে না বলে। কটাদিন বাইরে নিরিবিলিতে কাটাব বলে।'

ভবেশবাবু একটুকাল চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'নিরিবিলি জায়গা বাইরে আর কোথায় খুঁজে পাবি মালু? আচ্ছা যেতে চাইছিস যা। ছুটি-ছাটায় আসিস, চিঠিপত্র লিখিস।'

মা-ও আসতে রাজী হন নি। ছোট ভাইবোনেরাও আপত্তি করেছিল দিদিকে কাছছাড়া করতে।

মালবিকা হেসে বলেছে, 'আমি তো আব সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারে কোথাও যাচ্ছি নে। অবশ্য যেতে পারলে বাঁচতাম। মাত্র মাইল পঞ্চাশেক দূরে। বাসে তিন-চার ঘণ্টার জার্নি। তোরা অত ভাবছিস কেন।'

মালবিকা সবাইয়ের চোখের আড়ালে চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পাঁচ মাইলই হোক আর পঞ্চাশ মাইলই হোক একটু দূরে গিয়ে থাকতে পারলে সে বেঁচে যায়। বাপ-মা আত্মীয়স্বজনের সহানুভূতি আর অনুকম্পা তার দুঃসহ। অবশ্য সবাই যে মুখে সহানুভূতি জানান তা নয়, কিন্তু তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে তা মিশে থাকে।

এই নতুন শহরে এসে মালবিকা স্বস্তি পেল। এখানে একজনও তার পূর্বপরিচিত নয়। এখানে কেউ জানে না তার লাঞ্ছনার কাহিনী। এখানে কারো কাছে তার কোন প্রত্যাশা নেই, শুধু স্কুলের কর্তব্য-টুকু ছাড়া তার কাছে কেউ কিছু আশা করে না।

নারী হোক পুরুষ হোক মালবিকা কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায় না। কেউ একটু ঘনিষ্ঠতা করতে এলে সে তার আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয় বন্ধুত্বে সে পছন্দ করে না। সে একা থাকতে চায়। নিরিবিলি থাকতে চায়। মানুষের সান্নিধ্য তাকে অস্বস্তি ছাড়া আর কিছু দেয় না।

বাংলা নিয়ে এম. এ. পাশ করেছে মালবিকা। উঁচু ক্লাসগুলিতে সে ভাষা আর সাহিত্য পড়ায়। নিচের ক্লাসগুলিতে ইতিহাস ভূগোল কখনো বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

ভাল পড়ায় বলে মোটামুটি সুনাম হয়েছে মালবিকাব। সেক্রেটারী কি হেডমিস্ট্রেসের তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ক্লাসের

মেয়েদের সে টাস্ক দেয় এবং খাতাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাদের হাতে ফেরৎ দেয়। টার্মিনাল আর অ্যানুয়াল পরীক্ষার খাতাগুলিও সে যেন জেদ করেই সবাইয়ের আগে সাবমিট করে। মালবিকা স্কুল কামাই করে না, এক মিনিটও দেরি করে আসে না। কর্তব্যে তার কোন খুঁৎ নেই।

তবু আড়ালে-আবডালে তার সমালোচনা চলে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস ইন্দুনিভা বলেন, 'মেয়েটি বড় দাম্ভিক। না হয় একটু ভাল পড়ায়। কিন্তু ভাল টিচার কি বাংলা দেশে ও একাই না কি?'

অঙ্কের টিচার মনোরমা দত্ত জবাব দেয়, 'ভাব-ভঙ্গি দেখে তাই মনে হয় ইন্দুদি। বড় অসামাজিক তোমাদের ওই মালবিকা গুপ্ত।'

ইংরেজীর টিচার কেতকী সান্যাল বলে, 'কে জানে হয়তো কোন হৃদয় ঘটিত ব্যাপার-ট্যাপার আছে।'

মনোরমা বলে, 'ওসব ব্যাপার কার নেই কেতকী। তাই বলে—'

কেতকী সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে, 'তাই না কি? ও বস্তু তোমারও আছে না কি মনোরমাদি?'

কালো রঙের মোটাসোটা গড়নের মনোরমা এখন মধ্যতিরিশ। ব্যস্তবাগীশ কাঠখোট্টা ধরণের মেয়ে। তারও হৃদয়পীড়া থাকতে পারে এ যেন এক অসম্ভব ব্যাপার। মনোরমা একটু লজ্জিত হয়। তারপর শান্তভাবে বলে, 'আমি ফ্রাস্ট্রেশনের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু ফ্রাস্ট্রেশন আজকালকার দিনে কমবেশি কার না আছে বল তো কেতকী? তাই বলে লোকজনের সঙ্গে অমন ব্যবহার করতে হবে না কি? তা হলে বনে গিয়ে থাকলেই হয়।'

মালবিকা জানে তার সম্বন্ধে কার কি মনোভাব, তার বিরুদ্ধে কে কি বলে। ওই কেতকী মনোরমারাই তার কাছে এসে লাগায়। কিন্তু মালবিকা কোন উত্তেজনা বোধ করে না। কোনরকম বিক্ষোভ দেখা যায় না তার কথাবর্তায়। যে পরনিন্দায় যোগ দেয় না, নিজের নিন্দা শুনে নিরুত্তেজ থাকে তার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন। সহকর্মিণীরা আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়। একাই যখন থাকতে চায় মালবিকা একাই থাকুক।

হস্টেলেও সে নিঃসঙ্গতার মধ্যে বাস করে। প্রথম এসে সিঙ্গেল সিটেড রুম পায় নি বলে আরো একটি টিচারকে ঘরের ভাগ দিতে হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সামান্য সুখ-দুঃখের ভাগও সে অণিমাকে দেয় নি। তার সম্বন্ধে কোন কৌতূহল দেখায় নি। অণিমার কৌতূহলে সে ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। অণিমা কর যেন ঘরের তক্তপোষ টেবিলের মতই অপর একটি নিষ্প্রাণ বস্তু।

মাস তিনেক বাদে অণিমা ঘর বদলে নিয়েছে। তারপর কেউ আর মালবিকার রুম-মেট হবার গরজ দেখায় নি। সে যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে। পুরো একখানা ঘরের নির্জনতা।

ঔদাসীন্য আর অসহযোগের বেড়া দিয়ে মালবিকা নিজেকে ঘিরে রেখেছে। যা চেষ্টা করে করতে হত আস্তে আস্তে তা অভ্যস্ততায় দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে মনে হয় নিঃসঙ্গতা মালবিকা যেন সঙ্গে নিয়ে জন্মেছে। স্কুলে কাজ করে মালবিকা। নিতান্ত দরকার হলে পোস্ট অফিসে যায়, ব্যাঙ্কে যায়। আর যায় নদীর ধারে। ইছামতীর ওপারে পাকিস্তান, আর এপারে এই শহর। নদী একটু একটু করে এই শহরকে ভেঙে নিচ্ছে। বেশ লাগে এই ভাঙনের লীলা দেখতে। মাঝে মাঝে খুবই ধারে এসে দাঁড়ায় মালবিকা, যেন আশা করে এক চাপ মাটিসুদ্ধ নদীর খরস্রোত তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে কারো সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হয়। ব্যাঙ্ক কি পোস্ট অফিসের কেরানি, এখানকার সরকারী কলেজের দু-একজন প্রফেসর, বয়েজ হাই স্কুলের টিচার। কিন্তু নমস্কার পর্যন্তই। কি বড়জোর একটি-দুটি কুশল প্রশ্ন। তার বেশি কিছু নয়। স্কুলের ফাউন্ডেশন ডে-তে এঁদের কারো কারো সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কারো কারো সঙ্গে বা ওঁদের কর্মস্থলে। কিন্তু ওই মুখ চেনা পর্যন্তই। তার বেশি চেনাজানার দিকে মোটেই আগ্রহ দেখায় নি মালবিকা। যদিও অন্যপক্ষের ঔৎসুক্য মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে।

অবসর সময়টা বইপত্র নিয়ে কাটে। বাংলা গল্প উপন্যাস পড়তে যে তার আজকাল তেমন ভাল লাগে—তা নয়। তবু পড়ে। ভাল না লাগলে সবটা পুরোপুরি পড়ে না, বাদ দিয়ে পড়ে। বেশি

খারাপ লাগলে বই শেষ না করেই ফেরৎ দেয়। তবু বইয়ের সঙ্গেই যা কিছু যোগাযোগ রাখে মালবিকা। যার সঙ্গী সাথী নেই, অন্য কোনরকম ক্রীড়া কৌতুকে যে অনভ্যস্ত তার বই ছাড়া আর গতি কি। এখানকার পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই আনা-নেওয়া করে মালবিকা। বেশির ভাগই হস্টেলের ঝিকে পাঠায়। ক্বচিৎ কখনো নিজেও যায়। এ ছাড়া আছে দু-তিনখানা সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্র। সেগুলি মালবিকা নিজের খরচেই রাখে।

এইরকম একইভাবে তিনটি বছর মালবিকা কাটিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে তার আচার-আচরণে কোন পরিবর্তন হয় নি। কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনও বোধ করে নি মালবিকা, যদিও তাদের গোয়াবাগানের বাড়িতে এর মধ্যে অনেক পরিবর্তনই হয়েছে। মেজো আর ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। একটি ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি পেয়েছে।

কিন্তু এসব পরিবর্তন নিতান্তই বাইরের পরিবর্তন। এতে মালবিকার কিছু এসে যায় না। বাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগই এখন কতটুকুই বা। বাবার অনুরোধ সে রাখে নি। গ্রীষ্মের আর পুজোর লম্বা ছুটি সে বাইরে বাইরে কাটায়। চিঠিপত্র কদাচিৎ লেখে। বাবা-মা'র কোন দোষ নেই—মালবিকার নিজেরই বা কী দোষ। তবু তো তাকে দুঃখ পেতে হল। তবু তো সে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পেল না।

এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে আরও কতদিন মালবিকার কেটে যেত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ একটি কাণ্ড ঘটল। তাদের স্কুলে আর একটি মেয়ে এল চাকরি নিয়ে। কত মেয়ে আসে কত মেয়ে যায়। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে বাসন্তী সোম সবাইয়ের চোখে পড়ে গেল। চোখে পড়বার মতই মেয়ে। দেখতে সুশ্রী। গায়ের রঙ ফর্সা। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। বি. এ. বি. টি। বাসন্তীও ইংরাজী বাংলা আর ইতিহাস পড়ায়।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রীমহলে সেও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। পড়ায় ভালো। তার চেয়েও বড় কথা সে খুব সামাজিক। যেমন ছাত্রীদের সঙ্গে মেশে তেমনি টিচারদের সঙ্গে।

বাসন্তী মালবিকার সঙ্গেও আলাপ করতে এল। ও যেন পণ করেছে এই শহরে কাউকে সে অপরিচিত অবন্ধু থাকতে দেবে না।

মালবিকা অন্য সবাইকে যেমন তার দুর্ভেদ্য একাকিত্বের বাইরে রেখেছে বাসন্তীকেও তেমনি সহজে তার ভিতরে ঢুকতে দিল না। প্রথম প্রথম বরং বাধাই দিয়েছে মালবিকা। বাসন্তীকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে মেলামেশা চায় না, বন্ধুত্ব তার অনভিপ্রেত।

কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটির অধ্যবসায়। সে যেন পণ করেছে মালবিকার নিভৃত দুর্গের একটি কি দুটি দোর অন্তত না খুলে ছাড়বে না।

সেদিন মালবিকা টিচার্স রুমে একাই বসেছিল। বাসন্তী ক্লাস সেরে তার কাছে এসে বসল।

মালবিকা সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলল না। যদিও তার হাতে কোন কাজ এমন কি একখানা বই পর্যন্তও ছিল না, তবু সে চুপ করে রইল।

বাসন্তী বলল, 'মালবিকাদি, আপনার বুঝি এই পিরিয়ড অফ ছিল?'

একেই বলে গায়ে পড়া আলাপ। দেখতেই পাচ্ছে ক্লাস নেই। নইলে এঘরে এমন চুপচাপ বসে থাকবে কেন।

মালবিকা সংক্ষেপে বলল, 'হ্যাঁ।'

বাসন্তী বলল, 'মালবিকাদি, আপনাকে আমি মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত করি, তাই না।'

ভদ্রতা দেখিয়ে মালবিকাকে বলতেই হয়, 'না না বিরক্ত কেন করবেন?'

বাসন্তী মৃদুস্বরে বলল, 'আমি জানি আপনি একা থাকতে চান। আমিও একাই থাকি।'

এবার মালবিকা একটু অবাক হয়ে বাসন্তীর দিকে তাকাল, 'একাই থাকেন। আপনি তো ভিড়ের মধ্যে থাকতেই ভালবাসেন দেখি। সব সময় লোকজন আপনাকে ঘিরে থাকে।'

বাসন্তী বলল, 'তা থাকে। তবু আমি আপনার মতই একা।'

সেদিন আর কোন কথা হল না। কেতকী মনোরমার দল এসে পড়ল। বাসন্তী তাদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল। কিন্তু সেদিনের সেই

সামান্য কটি কথার পর মালবিকার মনটা হঠাৎ যেন ঘুরে গেল। এর আগে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসন্তীকে সে ঈর্ষা করতে শুরু করেছিল। মেয়েটা যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। জনপ্রিয়তা মালবিকা চায় নি। কিন্তু কেউ চোখের সামনে হঠাৎ এসে বিশ্বভুবন জয় করে নিলে কেমন যেন দুঃসহ লাগে। ছাত্রী টিচার দারোয়ান বেয়ারা সবাইয়ের মুখে বাসন্তীর সুখ্যাতি শুনে শুনে কান ঝালা-পালা হবার জো হয়েছিল মালবিকার। কিন্তু সেই ভুবনবিজয়িনী বাসন্তীও যখন পরম বিনীত ভাবে তার সৌহৃদ্য কামনা করল, তার নিঃসঙ্গতার কথা জানাল তখন মালবিকার মনে অসূয়ার ভাব আর রইল না, রূঢ়তা কোমলতায় পরিণত হল। মালবিকা লক্ষ্য করল মেয়েটি সত্যিই ভাল। লোকদেখানো ভালমানুষিতা ওর মধ্যে নেই। দেখতে অত সুশ্রী কিন্তু তার সাজ-সজ্জা নেই। বরং বেশ-বাস সম্বন্ধে একটু যেন উদাসীন। সাদা সিঁথি দেখে বোঝা যায় বিয়ে হয় নি। হাতে দুগাছি চুড়ি কখনো পরে কখনো পরে না। গলায় সরু একছড়া হার থাকে। আর হাতে অল্প দামের একটি ঘড়ি। এ ছাড়া আর কোন আভরণ নেই। মালবিকা লক্ষ্য করল মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়স। তবু বাসন্তী বয়স হওয়া মালবিকার মত প্রায়ই সাদাখোলের শাড়ি পরে। ক্বচিৎ কখনো রঙিন শাড়ি পরে বেরোয়। সে রঙ গাঢ় নয়, হাল্কা। তবে দেখতে সুশ্রী বলে ও যাই পরুক যেমন করেই পরুক ওকে ভারি মানায়। আর স্বভাব সরল আর সুন্দর বলে ও যাই বলুক ন্যাকামি বলে মনে হয় না। ও যাই করুক তার মধ্যে আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। মালবিকা লক্ষ্য করল বাসন্তীর সঙ্গে তার অমিল আছে বটে কিন্তু মিলও বড় কম নেই। বাসন্তীকে সত্যিই মাঝে মাঝে টিচার্সরুমের জানালার ধারে দিগন্তজোড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। কখনো কখনো মনে হয় ও ভারি আত্মমগ্ন। কখনো বা মনে হয় এমন সুন্দর একটি দেহাধার পেয়েও ওর প্রাণ মন ভরে নি। এমন রমণীয় তনু ত্যাগ করে সে অন্য কোথাও চলে গেছে। বাসন্তীর দেহ নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ, যেন কোন ধাতুমূর্তি মাত্র।
মালবিকা লক্ষ্য করে বাসন্তীও তার মতই পুরুষের সঙ্গ বর্জন করে

চলে। ওর আচরণের মধ্যে কোন রূঢ়তা থাকে না। ও অপূর্ব বিনয়ে মধুর হাসিতে উৎসুক পুরুষকে বুঝিয়ে দিতে পারে সঙ্গলাভের কোন আকাঙ্ক্ষা বাসন্তীর নেই। ওর যা রূপ, ওর যা গুণ তাতে ইচ্ছা করলেই ও স্বয়ম্বর সভা ডাকতে পারে। তবু কেন ও সভ্যদের সান্নিধ্য থেকে দূরে আছে কে জানে? মালবিকা ভাবে তার মত বাসন্তীও কি কোন পুরুষের হাত থেকে আঘাত পেয়েছে? সেই নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারে মালবিকার মতই বাসন্তীর জীবনেরও সাধ আহ্লাদ কামনা বাসনা সব চূর্ণ হয়ে গেছে? তারা দুজনে কি একই কারণে এই সংসারে থেকেও যোগিনী, মানে অসহযোগিনী?

কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য বাসন্তীর মত রূপবতী গুণবতী মেয়ের পক্ষে কি সম্ভব? কিছুই বলা যায় না কে কেমন কপাল নিয়ে আসে। নইলে মালবিকাও তো কুরূপা নয়, নির্গুণ নয়। সেও তো সমস্ত অন্তর দিয়েই দয়িতকে ভালবেসেছিল। কিন্তু সেই ভালবাসার কী মূল্য রইল, দু'দিন বাদে সবই যদি শূন্য আর রিক্ত হয়ে যায় তাহলে একদিনের পাওয়ার কথা ক'দিন আর মনে থাকে। বাসন্তীর মনে হয় জীবন বড় নিষ্ঠুর। তার খামখেয়াল আর অসঙ্গতির অন্ত নেই।

সে হৃদয়ের অর্ঘ্য দু'পায়ে দলে চলে যায়। পূজারিণীর দিকে ফিরেও তাকায় না।

দিনকয়েকের মধ্যে শুধু কৌতূহল ঔৎসুক্য নয়, তার চেয়েও গভীর এক আকর্ষণ বাসন্তীর প্রতি অনুভব করল মালবিকা। তার মনে হল বহুদিনের মধ্যে কেউ এমন করে তাকে কাছে ডাকে নি, এমন মমতা সহৃদয়তা নিয়ে কথা বলে নি। মালবিকার মনে হল দূরে যাওয়ার চেয়ে কারো কাছে আসতে পারা ভারি মধুর। ঘৃণা বিদ্বেষ বিতৃষ্ণার চেয়ে সৌহৃদ্যে ভারি শান্তি, ভারি পরিতৃপ্তি পরকেও আপন হতে দেখলে।

তাই বাসন্তী যখন তাকে বেড়াতে যাবার জন্যে সঙ্গে ডাকল মালবিকা তাতে সাড়া দিল। যখন একসঙ্গে চা খাবার জন্যে সাধাসাধি করতে লাগল, মালবিকা প্রত্যাখ্যান করতে পারল

না। হস্টেলে এসে তার ঘরে ঢুকে তার বইপত্র টানাহেঁচড়া করে, বিছানা বালিস উল্টে-পাল্টে দিয়ে স্নেহের উপদ্রব শুরু করল বাসন্তী। মালবিকা তাকে বাধা দিল না। বরং মালবিকার মনে হল সে যেন তার কৈশোরে কি প্রথম তারুণ্যে ফিরে গেছে। বাসন্তী যেন মালবিকার সেই ফেলে আসা প্রথম বসন্তের হারিয়ে যাওয়া এক অভিন্নহৃদয়া সখী।

মালবিকা স্টোভ জেবলে ওকে নিজের হাতে ডিমের হালুয়া আর চা করে খাওয়ালো। রান্না-বান্না বাসন্তীও কম জানে না। সেও একদিন ক্যারিয়ারে করে বয়ে নিয়ে এল মাংসের স্টু। আর একদিন ফ্রায়েড রাইস।

বাসন্তী থাকে তার পিসতুতো ভাইয়ের বাসায়। দাদা সম্প্রতি বিয়ে করেছে। বাসন্তীকে খুবই ভালবাসে। বউদিও খুব যত্নটত্ন করে। তবু বাসন্তীর ইচ্ছা নয় সেখানে বেশিদিন থাকা। বলা যায় না মানুষের মনের গতি কখন কোনদিকে যায়। বলা যায় না সুতোয় সুতোয় কখন কোন জটিল গিঁট পড়ে। খুলতে চাইলেও খোলা যায় না। শেষ পর্যন্ত টেনে ছিঁড়তে হয়। তাতেও কি কম কষ্ট।

মালবিকা বলে, 'চলে আয় না আমাদের হস্টেলে। আমার রুমে একটা সীট খালি আছে। সেখানে থাকতে পারবি।'

অন্তরঙ্গতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে মালবিকা। তুমি থেকে তুইতে।

বাসন্তী বলে, 'তা হলে তো ভালই হয়। কিন্তু রাঙাদা ছাড়তে চাইছে না। বউদির বাচ্চা হবে কিনা। আমি কাছে থাকলে ওদের একটু সুবিধা হয়। এই অবস্থায় আমিই বা কী করে ফেলে আসি। যাক কটা মাস।'

মালবিকা চুপ করে থাকে। ও-সব সুখ-সৌভাগ্যের কথা সে ভাবতেই পারে না। স্বামী-সংসার-সন্তান তার স্বপ্নের বাইরে, কল্পনার বাইরে। যদিও ছোট দুই বোনের বিয়ে দেওয়ার আগে বাবা প্রতিবার তার বিয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু মালবিকা কিছুতেই রাজী হয় নি। পুরুষের প্রসঙ্গ উঠলেই তার মনে শুধু ঘৃণা আর

বিদ্বেষ আসে। এত বিতৃষ্ণা নিয়ে কি বিয়ে করা যায়?
মালবিকা বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোর ওসব কবে হবে ?'
'কী সব ?'
মালবিকা বলে, 'ঘর সংসার কাচ্চা বাচ্চা ?'
বাসন্তী বলে, 'কোনদিনই হবে না মালুদি।'
মালবিকা সস্নেহে বাসন্তীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।
'কেন ? কী ব্যাপার বল তো ? কী এমন হয়েছে ? কেন সব সুখ-সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবি ?'
বাসন্তী বলল, 'বলব মালুদি। আর একদিন বলব। তুমিও তো তোমার সব কথা আমাকে বল নি।'
মালবিকাও বলে নি, বাসন্তীও বলে নি। কেউ স্পষ্ট করে নিজের অতীতকে অন্যের কাছে উদ্ঘাটন করে নি। কিন্তু দুজনের জীবনেই যে একটি করে প্রণয়বৃত্তান্ত আছে তাও এখন আর কারো কাছে গোপন নেই।

তবু বলতে বলতে আরো কিছুদিন গেল। এর মধ্যে তারা একসঙ্গে সিনেমা দেখল, সাইকেল রিক্সায় করে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়াল। ছুটির দিনে বাসে করে একদিন কলকাতা থেকে বেড়িয়ে এল।
তারপর একদিন বিকাল বেলায় বেড়াতে বেড়াতে ইছামতীর ধারে এসে বসল। প্রায়ই রোজই তারা বিকাল এদিকে বেড়াতে আসে। সন্ধ্যার আগে আগে ফিরে যায়। কিন্তু আজ সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেল। তবু তারা উঠল না। আঁধার ঘন হয়ে আসতে লাগল। তারা মেয়ে, অন্ধকারে কত রকমের কত বিপদ-আপদ হতে পারে তাদের সে খেয়াল রইল না। নদীর স্রোতের শব্দ শোনা ছাড়া যেন তাদের আর কোন কাজ নেই। ইছামতীর জলে জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা-অভীপ্সাকে ভাসিয়ে দিয়ে দুই সখী পরস্পরকে অবলম্বন করে বসে রইল।
কিন্তু একটু বাদে আর-একটি বাসনার কথা ব্যক্ত করল বাসন্তী।

এ বাসনা নতুন নয়। পরস্পরকে আরো বেশি করে জানার বাসনা।
'মালুদি, আজ বলো।'
'আগে তুই বল।'
অনেকদিন এসব কথা কাউকে বলে নি মালবিকা। কেউ এমন আগ্রহ নিয়ে শুনতে চায় নি। আজ বহুদিন বাদে মালবিকার হৃদয় কিছু বলবার জন্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এমন শ্রোতা সে আর কোথায় পাবে? দুঃখের ভার এমন আর কার 'হৃদয়ের কাছে নামিয়ে রেখে সে নিজের বোঝা হালকা করবে?
মালবিকা বলল, 'বলবার মত তেমন কিছু নেই বাসন্তী। এসব বলতে আর ইচ্ছাও করে না। আমি একজনকে ভালবেসেছিলাম।'
বাসন্তী বলল, 'তাতো বুঝতেই পারছি। তাঁর ভালবাসা কি পাও নি?'
'পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ সেই পাওয়ার কোন মানে নেই। পেয়ে হারাবার মত দুর্ভাগ্য আর নেই বাসন্তী। এখন মাঝে মাঝে ভাবি সেই পাওয়াটা সত্যিই পাওয়া না পাওয়ার ছলনা?'
বাসন্তী বলল, 'আর একটু খুলে বল, মালুদি। তোমরা কতখানি কাছাকাছি এসেছিলে। কেনই-বা ছাড়াছাড়ি হল, সব বলো।'
'বলতে ইচ্ছা করে না বাসন্তী। আমি সে সব ভুলে যেতে চাই। মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চাই।'
'তা কি পারবে মালুদি? মুছে ফেলা বড় শক্ত। গোড়া থেকে বল। কী করে তোমাদের আলাপ হল?'
'বাবার বন্ধুর ছেলে। যখন কলেজে পড়ত তখন থেকেই আমাদের বাড়িতে যাতায়াত। তারপর কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে ভাল চাকরিও পেল। বাবা বললেন, এবার বিয়ের কথা পাড়তে হয়। মা বললেন, তোমার বন্ধুকে বল। বাবা বললেন, আমার বন্ধুকে বলবার আর কী আছে? ওরা নিজেরাই তো সব। ওরা নিজেরা মুখ ফুটে বললেই আমরা পাঁজি দেখব, পুরুত ডাকব।'
'তারপর মালুদি? ডাকা হয়েছিল পুরুত?'
'তাহলে কি এখানে তোর সঙ্গে দেখা হত? পুরুত ডাকবার আগে

বাবার সেই বন্ধুপুত্র দশ হাজার টাকা চেয়ে বসল।'
'দশ হাজার!'
'হ্যাঁ। ওদের নাকি কী সব ধার-টার আছে তা শোধ করতে হবে। তা ছাড়া ছেলের বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা। সেই প্যাসেজ মানিটাও আমার বাবা দিতে বাধ্য। বাবা বললেন, পণ আমি কিছুতেই দেব না। আমিও বললাম, এত আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পরেও যে ছেলে অমন করে টাকা চাইতে পারে, তার ঘরে আমি কিছুতেই যাব না। ওপক্ষের যুক্তি, বাবা তো মেয়ের বিয়েতে গয়না-গাঁটি যৌতুক-পত্র দেবেনই, লোকজনও কিছু খাওয়াতে হবে। সেই খরচ থেকে না হয় ছাঁটকাট করুন। কিন্তু আমি বাবাকে বললাম, কক্ষণো তা হবে না। একটি পয়সাও নগদ দিতে পারবে না। এই নিয়ে দুই পক্ষে মনোমালিন্য কথা-কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি।'
'তারপর?'
'তারপর আর কি? বিয়ে ভেঙে গেল।'
'সে কি মালুদি। এই সামান্য কারণে অতদিনের সম্পর্ক—'
'যখন যাবার হয়, ওই ভাবেই যায় বাসন্তী। ছাড়াছাড়ি হবার আগে অবশ্য আমি তাকে কিছু কড়া কথা শুনিয়েছিলাম। সে-ও কড়া কড়া কথা বলতে ছাড়ে নি। তবু ভাবি নি ওই শেষ। ভেবেছিলাম সে তার ভুল বুঝতে পারবে। সে ফিরে আসবে। নিজেও ক্ষমা চাইবে। আমাকেও ক্ষমা চাওয়াব সুযোগ দেবে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। সে দূরে সরে রইল তো রইলই। পবে আমার মনে হতে লাগল টাকাটাই আসল ব্যাপার নয়। ওটা একটা ছল। জানে যে, আমরা পণের বিরুদ্ধে। তাছাড়া বাবাব অত টাকা দেবার শক্তিও নেই। তাই ওই কৌশল খাটিয়েছিল। নইলে কি আর একবারও আসতে পারত না? একটু খোঁজ খববও কি দিতে পাবত না? নিতে পারত না? এখন ভাবি, এসব বিবাদ-বিসংবাদের আগেই তার ভালবাসা মরে গিয়েছিল।'
বাসন্তী বলল, ছিঃ। এ তুমি কী বলছ, মালুদি? ভালবাসা কি অত সহজে মরে? তাবপর কী হল?'
'তারপর তার বাবা মারা গেলেন। মা অল্পবয়সেই চলে গিয়ে-

ছিলেন। কলকাতায় যে ছোট একটি বাড়ি ছিল তা আগে থেকেই মর্টগেজে পড়েছিল। বোধ হয় দেনার দায়েই তা বিক্রি হয়ে গেল।'
'তারপর ?'
মালবিকা বলল, 'তারপর কোথায় যে সে চলে গেল জানি নে। জানতেও চেষ্টাও করি নি।'
এরপর তারা ফের কিছুক্ষণ জলস্রোতের শব্দ শুনতে লাগল।
একটু বাদে মালবিকা বলল, 'আমার কথা তো খুঁটে খুঁটে শুনে নিলি। এবার তোর কথা বল বাসন্তী। তোর কি ওইরকম—'
বাসন্তী বলল, 'না মালুদি। ঠিক ওইরকম নয়। আমরা থাকি সাঁওতাল পরগনার এক গ্রামে। বাবা ওখানকার কোয়ারীতে কাজ করেন। অল্প বয়সে ঢুকেছিলেন, এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। আমি পড়াশুনো করেছি দুমকায়, পিসীমার বাসায় থেকে। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে এসে দেখি, বাবার অফিসে নতুন এক ভদ্রলোক ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। প্রথম প্রথম আমাদের ভারি রাগ হল, এই পোস্টটা তো কোম্পানী বাবাকে দিলেও পারত। বাবা তো সব কাজই জানেন। চল্লিশ বছর ধরে আছেন এক জায়গায়। কিন্তু ম্যানেজারের আচার-ব্যবহারে সবাই খুব সন্তুষ্ট হলেন। বাবার সঙ্গে তিনি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন। অন্য কর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার খুব ভাল। শুনলাম ভদ্রলোক তাঁর কোয়ার্টারে একাই থাকেন। সংসারে কেউ নেই। বিয়ে-থা করেন নি। দেখতে সুপুরুষ। আমি এতদিন তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। এবার একদিন কাছে থেকেও দেখলাম। বাবা তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমিই তাঁকে চা দিলাম। তোমাকে গোপন করব না মালুদি, সেই সঙ্গে সঙ্গে সব দিলাম। তিনি কিন্তু পাল্টা নিমন্ত্রণ করলেন না। তবু আমি তাঁকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। বিকালে ছোট ভাই কি বোনকে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরোতাম। দেখতাম তিনিও সাইকেলে করে কোথায় যাচ্ছেন। কোন কোন দিন পাহাড়ী নদীটার ধারে গিয়ে তিনি থামতেন। কোন কোন দিন ছোট্ট পাহাড়টার ওপর গিয়ে বসে থাকতেন। আমি অতদূর পর্যন্ত যেতাম না। কিন্তু আমার মন

চলে যেত। মাঝে মাঝে আমার ভাই-বোনদের হাতে তিনি বুনো গোলাপের গুচ্ছ তুলে দিতেন। বা রঙীন পাথরের টুকরো। আমার ছোট বোন বলত, দিদি আসলে এগুলি তোর জন্যে। আমি বলতাম, যাঃ।'

বাসন্তী থামল। হয়ত পিছু ফিরে সেই রঙীন পাথরের নুড়ি কুড়োচ্ছে।

মালবিকা বলল, 'তারপর ?'

বাসন্তী বলল, 'তারপর আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বাবা ওঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। প্রথমদিকে মা একটু অমত করে-ছিলেন, বয়স আমার তুলনায় বেশি। জাতে ওঁরা বৈদ্য, আমরা কায়েত, তাছাড়া বিশেষ কেউ নেই সংসারে। কিন্তু বাবা বললেন, তাতে কি এসে যায়, ছেলেটি ভাল। আর তোমার মেয়ের খুব পছন্দ। শুনেছি তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু বাবাই অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে কন্যাদায়ের কথা তুলে ওঁকে শেষ পর্যন্ত রাজী করালেন। তিনি বললেন যৌতুক-টৌতুক কিছু দিতে হবে না। কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের দরকার নেই। বিনা আড়ম্বরে বিয়ে হবে। কিন্তু তাই কি হয় ? বাবা যথাসাধ্য উদ্যোগ-আয়োজন করলেন। মা পিঁড়িতে, কুলোয় আর মাটির কলসীতে আলপনা দিলেন। ভারি সুন্দর আলপনা দিতে জানেন মা। বিয়ের কাপড়-চোপড় কেনা হল। অল্প-স্বল্প কিছু গয়নাও গড়ালেন বাবা। পাখা-মেলা প্রজাপতির ব্লক-দেওয়া হলদে নিমন্ত্রণ-পত্র ছেপে এল। পাকা দেখার কথা উঠল। পাত্র বললেন, বিয়ের দিনই সব হবে। দেখব তো আমি একাই।'

বাসন্তী থামল।

মালবিকা রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'তারপর ?'

বাসন্তী বলল, 'তারপর বিয়ের দিনে আর এলো না মালুদি। অধিবাসের দিনই সব শেষ হয়ে গেল। সেদিনও সন্ধ্যায় তিনি সাইকেলে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পাথরের কুঁচি-বোঝাই একখানা লরী তাঁকে চাপা দিল। নিজেদের কোম্পানীর লরী। ড্রাইভার বুক চাপড়াতে লাগল। সবই কপালের দোষ। তার

নিজের কোন দোষ নেই। ম্যানেজারবাবুর অসতর্কতার জন্যেই নাকি এই দুর্ঘটনা।'

কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল।

একটু বাদে হঠাৎ মালবিকা বলল, 'তার নাম কি ছিল রে?'

বাসন্তী বলল, 'নাম শুনে কি করবে মালুদি?'

'তবু শুনিই না।'

'তাঁর নাম প্রদোষ সেন।'

মালবিকা আর্তনাদ করে উঠল, 'রাক্ষুসী! তুই! তুই-ই তাহলে তাকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছিলি?'

অপ্রত্যাশিতভাবে কমপ্লিমেণ্টারি কার্ডখানা পেয়ে প্রথমে খুব খুশিই হয়েছিলেন সত্যগোপাল। পাড়ারই একটি যুবক তাঁকে উপহার দিয়ে গেল। একার নয়, দুজনের। আরো একজনকে সঙ্গে নিতে পারবেন সত্যগোপাল। ভাই বন্ধু স্ত্রী বান্ধবী যে কেউ। ছেলেটি রসিক আছে। তাঁকে নিঃসঙ্গভাবে ফরাসী চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী দেখতে আমন্ত্রণ করেনি। বই মানুষ একা বসে পড়ে, কিন্তু ছবি দেখতে হলে আরো একজনকে সঙ্গে নিতে হয়।

ছেলেটির মুখ চেনেন। কিন্তু নামটি মনে করতে পারছিলেন না সত্যগোপাল। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, 'ইয়ে তোমার নামটি যেন কী, কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে।'

প্রসন্নমুখ যুবক প্রৌঢ়ের এই স্মৃতিদৌর্বল্যে ক্ষুণ্ণ হল না। হেসে বলল, 'স্যার আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কলেজে পড়াতেন আমাদের। আমার নাম শিবেশ সেনগুপ্ত।'

সত্যগোপাল বললেন, 'বেশ-বেশ।'

প্রথম যৌবনে কয়েক বছর কলেজে পড়িয়েছিলেন সত্যগোপাল। পড়িয়ে দেখলেন আর যাই হোক বিদ্যাদানের দক্ষতা তাঁর নেই। তিনি দিতে চাইলে কী হবে ছেলেরা নিতে উৎসুক নয়। তাঁর ক্লাসে গোলমাল হয় বেশি, পড়াশোনা হয় কম, এই অখ্যাতি ঘাড়ে নিয়ে তিনি কলেজ ছেড়েছিলেন। বিস্মৃতি সেই অপ্রীতিকর দুঃখের দিনগুলিকে অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। তারপর সত্যগোপাল এক বেসরকারী অফিসে কাজ নিয়েছেন। চুপচাপ বসে কলম চালান। সহকর্মীদের সঙ্গে মোটামুটি সহযোগিতা রক্ষা করে চলেন। তেমন কোন শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তাঁর নামে ওঠেনি। বড় রকমের কোন সাফল্যও আসেনি অবার নিদারুণ বিফলতার মনস্তাপেও কষ্ট পেতে হয়নি।

সেই অখ্যাতি আর অপচয়ের দিনগুলিতে জনকয়েক অনুরাগী

ছেলে তাঁর কাছে আসত। বাসায় যেত। সহানুভূতি নিয়ে কথাবার্তা বলত। সত্যগোপালের মনে হয় তারা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করতেও পারত। এই শিবেশ কি তাদেরই একজন? না যারা পিছনের বেঞ্চে বসে বিড়াল ডাকত, কবিতা পড়াবার সময় কখনো হাতে কখনো জুতোর শব্দে তাল দিত তাদের দলের, সত্যগোপাল তা মনে করতে পারলেন না। সে কথা জিজ্ঞাসা করেও এখন লাভ নেই। বরং যুবকটির গুরুদক্ষিণা তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন।

শিবেশ বলল, 'যাবেন কিন্তু স্যার।'

সত্যগোপাল বললেন, 'আচ্ছা যাব।'

শিবেশ বলল, 'অ্যাডমিট টু বলে লিখে দিলাম। আপনি সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেতে পারেন।'

সত্যগোপাল বললেন, 'আচ্ছা।'

কাউকে। ইচ্ছা করেই বোধ হয় শিবেশ মাসীমা কথাটা ব্যবহার করল না। আজকাল তরুণ-তরুণীরা তাঁর স্ত্রীকে বেশির ভাগ মাসীমা বলেই ডাকে। শ্রুতিসুখকর মনে হয় না সত্যগোপালের। তবে শুনতে শুনতে অনেকটা কান-সওয়া হয়ে গেছে।

নিজের এই মনোভাবে সত্যগোপাল নিজেই মাঝে মাঝে হাসেন। এও এক ধরনের ইডিয়োসিনক্রেসী। শুধু সম্বোধনের হেরফেরে কি আর জরাকে ঠেকানো যায়? ঠেকাবার দরকারই বা কি। যৌবনের মত বার্ধক্যও জীবনের আর একটি পর্যায়। বার্ধক্যে জীবনকে আর এক ভাবে ভোগ করতে হয়। যৌবনে সৃষ্টি আর সম্ভোগ, বার্ধক্য জীবনকে নিরাসক্ত দৃষ্টি উপহার দেয়। অপরাহ্নের সেই আলো অধ্যয়ন আর মননের পক্ষে খুবই উপযোগী।

একথা সত্যগোপাল রায় যে জানেন না তা নয়। কিন্তু সব সময় মানতে পারেন না। প্রবীণ হয়েও শিক্ষা নিতে হয়। সে শিক্ষা বড় কঠিন শিক্ষা।

কার্ডখানা পেয়ে সত্যগোপাল খুশি হলেন। আজকাল প্রাপ্তির সীমা স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বন্ধুরা বই বগলে নিয়ে আর উপহার দিতে আসে না। থিয়েটার সিনেমার টিকেট

কেটে এনে কেউ বলে না, 'চল দেখে আসি।' আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের পালা অতি সীমিত।
বন্ধুরা নিজেদের কাজকর্ম আর পারিবারিক গন্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কর্মের সেই আবরণ থেকে তাদের বের করে আনা কঠিন। সত্যগোপাল নিজেও কি সেই কর্মবৃত্তি নেননি! তিনিই বা কজনকে নিজের বাড়িতে ডাকেন? অনাহূত কেউ এসে পড়লে কতক্ষণ প্রসন্ন মনে তাঁকে সঙ্গ দেন?
কার্ডখানা টেবিলে রেখে দিলেন সত্যগোপাল। কিন্তু ওই রাখাই সার। সিনেমা দেখা আর হয় না। অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে রোজ দেরি হয়ে যায়। কাজকর্মের চাপ বেশি। ফিরে এসে বড় ক্লান্তি লাগে। কোথাও নড়তে চড়তে মন যদি বা চায়, শরীর সায় দেয় না। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন।
কার্ড তাঁর নামের। কিন্তু একদিন ছেলে দেখে এল। আর একদিন গেল মেয়ে। দুজনে আলাদা আলাদা গেছে। নিশ্চয়ই একা যায় নি। ওই বয়সে কেউ কি আর একা একা সিনেমা দেখে? স্ত্রীকে বললেন, 'বেশ তো মজা। আমার কার্ড, আর তুমি পাঁচজনকে বিলিয়ে বিলিয়ে দিচ্ছ!'
সুনন্দা বললেন, 'তুমি এত হিংসুটে কেন বলতো? ও কার্ড দিয়ে তুমি কী করবে? যারা দেখে আনন্দ পাবে তারা দেখুক।'
সত্যগোপাল বললেন, 'দেখে আনন্দ তো আমিও পেতে পারি!'
সুনন্দা বললেন, 'রাম বলো। এই বুড়ো বয়সে তোমার আর ও-সব দেখে দরকার নেই। অমনিতেই ভীমরতি যায় না।'
সত্যগোপাল মনে মনে ভাবলেন, 'তা ঠিক। এখন রতি মানেই ভীমরতি।'

তিনদিনের তিনটি শো হয়ে গেল। চতুর্থ এবং শেষ দিনে অফিস যাওয়ার সময় নিজের নামের কার্ডখানা নিজেই পকেটস্থ করলেন সত্যগোপাল। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আজ আর এই কার্ড কাউকে দিতে পারবে না। আজ আমি নিজেই যাব।'
সুনন্দা বললেন, 'বেশ তো যাওনা। এই বেলা দশটার সময়ই যাবে

নাকি ?'

সত্যগোপাল বললেন, 'দশটার সময় কেন, সময়মতই যাব। তুমি চলো, যাবে আমার সঙ্গে।'

'ওরে বাবা ! সূর্য আজ কোন্‌দিকে উঠেছে ? দরকার নেই তোমার অত দয়াদাক্ষিণ্যে। মুখে বলেছ এই আমার পরম ভাগ্য।'

কিন্তু সুনন্দার এই মান-অভিমানের খোঁচা এও যেন নিতান্তই মৌখিক। সত্যগোপাল জানেন সুনন্দা বহুদিন তাঁর সঙ্গে বেড়িয়ে আনন্দ পান না। জীবনসঙ্গিনী ভ্রমণসঙ্গিনী হতে বড় কুণ্ঠিত। তাঁর সিনেমা দেখা, সমাজ সামাজিকতা রক্ষা করার জন্যে অন্য সঙ্গিনী আছে। নিতান্তই যেখানে একসঙ্গে না গেলে নয়, সেখানেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে যান। সত্যগোপাল তবু একটু সাধাসাধি করলেন স্ত্রীকে, 'চল যাই। একটা কার্ড যখন পাওয়া গেছে—'

সুনন্দা কাতর অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'আজ থাক, আর একদিন যাব লক্ষ্মীটি। সিনেমা দেখতে গেলে অমনিতেই আমার মাথা ধরে। তারপর আবার ওই ফরাসী ছবি। কিছু বুঝতে পারব না, মিছামিছি—'

সত্যগোলাপ বললেন, 'ছবি দেখাটা একটা উপলক্ষ। দুজনে মিলে একটু ঘুরব, বেড়াব, সেইটাই আসল।'

সুনন্দা হেসে বললেন, 'থাক আর কাব্যে দরকার নেই। কলকাতা শহর দেখে দেখে আমার চোখ পচে গেল। এখানে আমার একটুও বেরোতে ইচ্ছা করে না। যখন বাইরে কোথাও নিয়ে যাবে তখন বেশ মনের আনন্দে বেড়াব। যা বলবে তাই করব।'

সত্যগোপাল আর পীড়াপীড়ি করলেন না। বললেন, 'আচ্ছা।' তারপর কী কথা মনে পড়ে গেল, হেসে বললেন, 'আজ তোমাদের শনিবার তাই না ?'

সুনন্দা বললেন, 'আমাদের শনিবার আর তোমার বুঝি শনিবার না ?'

সত্যগোপাল বললেন, 'মানে আজ তোমাদের সেই তাসের আসর আছে না ? সেই কথা বলছি। আজ তোমার সেই রেখা আর সুশোভনের দল আসবে।'

সুনন্দা রাগ করে বললেন, 'আসবেই তো। সপ্তাহে একদিন একটু বন্ধুবান্ধব মিলে বসি। তাস খেলি, হাসি গল্প করি, তাতেও তোমার হিংসে ?'
সত্যগোপাল রণে ভঙ্গ দিয়ে বললেন, 'আহা, হিংসের কথা নয়। এমনিই বলছিলাম।'
সত্যগোপাল জানেন শুধু একদিনই নয়, সপ্তাহে দু-তিন দিন তাসের আসর বসে সুনন্দার ঘরে। সেই আসরে অসমবয়সীদেরই ভিড় বেশি। আশেপাশের ফ্লাটগুলি থেকে তরুণ-তরুণীরা আসে। সুনন্দা তাদের সান্নিধ্যে আনন্দ পান, যেন নতুন তারুণ্য লাভ করেন। বাইরের কোন ক্লাবের দরকার হয় না সুনন্দার। ঘরেই তিনি ক্লাব বসাতে পারেন।
স্ত্রীর এই আনন্দে বাধা দেবার কোন অধিকার নেই সত্যগোপালের। কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া চলে। পারিবারিক, সামাজিক, নানারকম বিধিনিষেধ অনুশাসন দিয়ে মানুষের কাজকে বাঁধা যায়। কিন্তু অবসর যাপনে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। যে যার নিজের রুচি অনুযায়ী এই পৃথিবী থেকে আনন্দ আহরণ করুক। 'সংসার আনন্দময় যার চিত্তে যা লয়।'
সত্যগোপাল জানেন সংসার অবিমিশ্র আনন্দময় নয়। আনন্দ আর বিষাদের মিশ্রিত রসায়ন। সেই রসায়নে কারো কারো প্রকৃতি আর প্রবণতায় বিষাদের ভাগই বেশি। হয়তো তাতেই তারা জীবনের স্বাদ পায়। কেউ কেউ যেমন শুকতো আর তেতো খেতে বেশি ভালবাসে।

অফিসে এসে কাজের চেয়ে অবসর যাপনের কথাটাই বেশি মনে পড়ল সত্যগোপালের। বিষাদের রাজ্য থেকে প্রসন্নতার সাম্রাজ্যে প্রবেশের আজ তিনি একটি ছাড়পত্র পেয়েছেন। কিন্তু সেখানে নিঃসঙ্গ যেতে মন সরে না। একজন সঙ্গী কি সঙ্গিনী চাই।
অফিসে কয়েকটি তরুণী মেয়ে আছে। সঙ্গসুখ লাভের জন্যে প্রথমে অবশ্য তাদের দিকেই চোখ পড়ল সত্যগোপালের। দুজন টাইপিস্ট, একজন টেলিফোন অপারেটর, আর গুটি পাঁচ ছয় কেরাণী। সবাই

যে সুশ্রী তা নয়, কিন্তু যৌবন-মহিমায় রানী হয়ে বসে আছে। ওদের সঙ্গে অল্প-স্বল্প আলাপ আছে সত্যগোপালের। কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠতা নেই যে সিনেমা দেখার সঙ্গিনী হতে ওদের ডাকতে পারেন। ওরা সিনেমা যে দেখে না তা নয়। যুবক সহকর্মীদের সঙ্গে দেখে। আর দেখে প্রৌঢ় ক্ষমতাবান বিত্তবান অফিসারদের সঙ্গে। দৈহিক সামর্থ্যের মত সেও আর এক ধরনের যৌবন, বিত্ত আর প্রতিপত্তির মধ্যে উদ্ভাসিত। সত্যগোপালের দৈহিক রূপ লাবণ্য নেই, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি নেই। শুধু মিষ্টভাষী, সদালাপী, সদাচারী বলে খ্যাতিটুকু আছে। তার জন্য কেউ কেউ হয়তো তাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেশে না। সত্য-গোপাল জানেন তাঁর স্বভাবের মধ্যে মেরু অঞ্চলের শীতলতা আছে। সেই শৈত্য সবাইকে দূরে সরিয়ে রাখে। না, ওই তরুণী সহকর্মীদের কারো কাছে গিয়ে হঠাৎ সঙ্গভিক্ষা করতে পারেন না সত্যগোপাল। ওদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হলে মান থাকবে না, বরং অফিস ভরে অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। ওই যুবভোগ্যারা সত্যগোপালের শুধু দৃষ্টিভোগ্য হয়েই থাকুক, তার বেশি চাইতে গেলে দুর্ভোগ বাড়বে। যুবতীদের বাদ দিয়ে যুবক সহকর্মীদের দ্বারস্থ হওয়াই নিরাপদ। সব সহকর্মীই তো আর সহকর্মী নয়, সব যুবকই বয়স্কদের সান্নিধ্য পছন্দ করে না। বিশেষ করে সত্যগোপালের মত প্রবীণ ব্যক্তি, যিনি তরুণদের সান্নিধ্যে এসেও বয়সের ভার নামিয়ে রাখতে পারেন না, কাউকে কাছে পেলেই সাহিত্য দর্শনের আলোচনায় আবহাওয়াকে ভারী করে তোলেন। তবু ওদের ভিতর থেকেই একজনকে বেছে নিলেন। ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেণ্টের প্রশান্ত সমাদ্দারের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি হবে না। সুদর্শন এই ছেলেটি সত্যগোপালের অনুরাগী। এক সঙ্গে চা-টা খান, মাঝে মাঝে গল্পটল্পও হয়।

ওকে বেছে নিলেন সত্যগোপাল।

'ওহে প্রশান্ত, সিনেমা দেখবে নাকি?'

প্রশান্ত বলল, 'সেকি সত্যদা! ভূতের মুখে রাম নাম! আপনার মুখে সিনেমার কথা!'

বৃত্তান্তটা সত্যগোপাল বললেন প্রশান্তকে।

তারপর সস্নেহে বললেন, 'চল যাই। ঘণ্টাদেড়েক একটু বিদেশ ঘুরে আসি।'
প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে গেল। সবিনয়ে হেসে বলল, 'যেতে পারলে খুবই ভাল হত, ভাল মানুষের সঙ্গে ভাল ছবি দেখা যেত। কিন্তু আমার যে আর একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে, বিকালে একজনকে কথা দিয়েছি।'
সত্যগোপাল বললেন, 'কথা দিয়েছ? তা হলে আর কথা কী।'
কে জানে সত্যি সত্যি কথা দিয়েছে কি দেয় নি। তা মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কী। সত্যগোপাল যে ওর কাছ থেকে আজ কিছু পেলেন না, ও যে দেড়ঘণ্টা দু'ঘণ্টার সান্নিধ্য তাঁকে দিতে চাইল না। এইটাই আজ নির্মম সত্য।
আরো দু'তিনজন কমবয়সী সহকর্মীর দিকে আড়চোখে তাকালেন সত্যগোপাল। কিন্তু কাউকে কাছে ডাকতে ভরসা পেলেন না। ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আরো কম। ওরা কেউ তাঁর সঙ্গে যাবে না। বলে লাভ নেই।
বরং তার চেয়ে প্রবীণ সমবয়সীদের সঙ্গই নিরাপদ। কিন্তু সমবয়সী হলেই তো আর হল না, যাঁদের সঙ্গে বয়সের সমতা আছে তাঁদের সঙ্গে রুচির অসাম্য যেন আরো বেশি। কারো সঙ্গে অবশ্য তেমন অসদ্ভাব নেই সত্যগোপালের। কিন্তু অসদ্ভাব না থাকা আর সদ্ভাব থাকা এক কথা নয়। ঘণ্টা দুই সত্যগোপালের সঙ্গে একসঙ্গে কাটাতে ওঁরাও কেউ স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, সত্যগোপাল নিজেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।
তবু বেছে বেছে একজন বয়স্ক সহকর্মীর কাছে প্রস্তাবটা নিয়ে গেলেন সত্যগোপাল। অবনীবাবু সত্যগোপালের চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়। তিনিও চিন্তাভারাতুর। অসুখ বিসুখ, আর্থিক অনটন, কন্যাদায় নানারকম দুশ্চিন্তাই তাঁর আছে। তবু মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সত্যগোপালের কিছু সুখ-দুঃখের কথা হয়। অফিস আর ঘর-সংসারের বাইরের প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁর বেশির ভাগ আলোচনা করেন।
একগাল হেসে সত্যগোপাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাবেন নাকি

অবনীবাবু ?'

অবনীবাবু সব শুনে বললেন, 'আপনি বড়লোকের বস্তু সামনে নিয়ে এসেছেন মশাই। কিন্তু খেয়ে যে হজম করব তার সাধ্য নেই। আজ পাঁচ বছর কোন সিনেমা দেখিনে। দেশী বিদেশী কোন ছবিই না। সবাইকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেই পারছিনে আর, তো নিজের সাধ আহ্লাদ !'

সত্যগোপাল বললেন, 'কমপ্লিমেণ্টারী কার্ড, কারো কোন খরচ নেই।'

অবনীবাবু বললেন, 'তা জানি, আমার খরচ নেই কিন্তু আপনার আছে। আপনি ট্যাকসি করে নিয়ে যাবেন, ট্যাকসি করে নিয়ে আসবেন। চা-টা না খাইয়েও পারবেন না। বিনা পুণ্যে এমন স্বর্গসুখও ভোগ হয় না মশাই।'

'কেন বলুন তো ?'

অবনীবাবু বললেন, 'রোগ এই দেহটার কিছু আর রাখেনি। দেখতেই মোটাসোটা, ভিতরে কিছু আর নেই মশাই। বিকাল হলেই প্রেসারটা বাড়ে। ভারি কষ্ট দেয়। চুপচাপ ঘরে বসেই কাটাই। ডাক্তারও তাই বলেছেন। নড়াচড়া বারণ। সেদিন মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, তাঁর শাসন মানতেই হয়।'

সহানুভূতি জানালেন সত্যগোপাল, 'তাহলে থাক। আর গিয়ে কাজ নেই আপনার।'

অবনীবাবু বললেন, 'আপনার মত তো আর নয়। আপনি স্বাস্থ্যটি বেশ অটুট রেখেছেন। যার স্বাস্থ্য আছে তার সব আছে।'

সত্যগোপাল প্রতিবাদ করলেন না। তিনি মনে মনে জানেন স্বাস্থ্যই সব সুখের আকর নয়, স্বাস্থ্য থাকলেও মানুষের অনেক দুঃখ থাকে। স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে না পারার দুঃখ। সামর্থ্যকে অপচিত হতে দেখার দুঃখ।

টেবিলে ফিরে গিয়ে মনে মনে অনেকের কাছেই যাতায়াত করলেন সত্যগোপাল। বিভিন্ন বয়সের বন্ধু, বিভিন্ন স্তরের বন্ধু। কিন্তু কাউকেই মুখ ফুটে বলা যায় না, 'সঙ্গে চল'। বন্ধুরা প্রায় সবাই

বেঁচে আছে। কিন্তু বন্ধুত্ব বেঁচে নেই। উচ্ছলতা, উদ্বেলতা, প্রাণসত্তা আজ নিঃশেষিত।

টেলিফোনটা হাতের কাছে আছে। অনেকের ফোন নাম্বারও আছে পকেট ডায়েরিটিতে। মুখস্থও আছে কারো কারো নম্বর। তবু মন মানে না কাউকে ডাকতে। কী হবে ডেকে? সাড়া যে পাবেন না তা অবধারিত।

তবু খুঁজে পেতে একজনকে ডাকলেন। বহুকালের পুরোন বান্ধবী। হারিয়ে গিয়েছিল। বিশ বছর পরে ফের দেখা হয়েছিল। একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছেন। বান্ধবীর মেয়েটি তরুণী। লাবণ্যবতী। সত্যগোপাল তাঁর ওখানে যেতেন মাঝে মাঝে। মা মেয়ে দুজনের সঙ্গেই গল্প করতেন। বন্ধুবৎ ব্যবহার করতেন।

তারপর বান্ধবী একদিন মুখ ফুটে বললেন, 'তুমি আর এসোনা। এলে বড় কষ্ট পাই। বড্ড যন্ত্রণা হয়।'

'কেন?'

'তুমিতো আর আমার জন্যে আসো না। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

তবু সত্যগোপাল সবই বুঝেছিলেন। মেয়েটির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আর যাননি।

তারপর আবার যোগাযোগ রেখেছেন। তবু সেই ভাঙা সম্পর্ক পুরোপুরি যেন জোড়া লাগেনি।

তবু কিছু ইতস্তত করে সেই বান্ধবীকেই ফোন করলেন, 'যাবে না কি সিনেমায়?'

তিনি বললেন, 'অশেষ তোমার উদারতা। কিন্তু কী করে যাই বলো—জামাই মেয়ে এসেছে যে।'

তিনি বললেন, 'তাতে কী। দেড়ঘণ্টা কি দুঘণ্টার তো ব্যাপার।'

তিনি বললেন, 'তাই কি আর হয়। ওরা কী ভাববে বলতো। হুট বললেই বেরোতে পারি সেইদিন কি আর আছে। আগে থেকে জানিয়ে রেখো। আর একদিন যাব। সেদিন নিশ্চয়ই বেরোব তোমার সঙ্গে।'

সত্যগোপাল মনে মনে ভাবলেন, 'সেদিন কি আর আসবে?'

শেষ পর্যন্ত একাই গেলেন সত্যগোপাল। ফুলে পল্লবে সজ্জিত চারুকলা একাডেমির পরিবেশটি ভারি মনোরম। অনেক যুগলমূর্তি দেখতে পেলেন সত্যগোলাপ।

অডিটোরিয়ামের সামনে শিবেশ তাঁকে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন স্যার আসুন। ভাবলাম আজও বুঝি এলেন না। আজকের ছবিটি সবচেয়ে ভাল। আর কেউ আসেনি আপনার সঙ্গে ?'

সত্যগোপাল বললেন, 'না। আমি একাই এসেছি।'

শিবেশ বলল, 'এ ছবি স্যার একা বসেই দেখবার মত। ডিরেকটরও সেই কথা বলেছেন।'

একখানি হ্যাণ্ডআউট শিবেশ তাঁর হাতে দিল। সীটে গিয়ে বসে তাতে কেবল একটু চোখ বোলাচ্ছেন অমনি অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

সত্যগোপাল গভীর মনোযোগে ছবি দেখতে লাগলেন। পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমার ধ্বংসস্তূপের পর নতুন শহর গড়ে উঠেছে। তারই পটভূমিকায় তরুণ-তরুণীর প্রণয় চিত্র। মেয়েটি ফরাসী অভিনেত্রী, ছেলেটি জাপানী স্থপতি।

খানিক বাদে ইণ্টারভ্যালের আলোক জ্বলে উঠল। সত্যগোপাল অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর পাশে কখন এক অপরিচিতা তরুণী এসে বসেছে। তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, চম্পকবর্ণা। আড়চোখে তাকে একটু দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলেন সত্যগোপাল। অবাক কাণ্ড। এই দেবকন্যা কেন এল, কোত্থেকে এল ?

ঘর ফের অন্ধকার হল। অর্ধমনস্কভাবে ছবি দেখতে লাগলেন সত্যগোপাল। আধখানা মন ছবির দিকে। বাকি আধখানা অপরিচিতা পার্শ্ববর্তিনীর চিন্তায় মগ্ন। অমন মুখের ডৌল আরো দেখেছেন, তবু মনে হয় এ যেন অদৃষ্টপূর্বা। নারীকে পাশে নিয়ে ছবি আরো দেখেছেন, তবু মনে হয় এমন দেখা এই প্রথম। অননুভূত অনাস্বাদিত এই যৌথ অস্তিত্বের রস।

ছবিতে দুই বিদেশীর প্রণয়সম্পর্ক অচিরস্থায়ী, বিয়োগান্তক।

সত্যগোপাল ভাবলেন, 'তা হোক। জীবনের সঙ্গে মিল আছে।'

'সঞ্জীব ?'
'হ্যাঁ আমি সঞ্জীব বলছি। কে ?'
'গলা শুনে চিনতে পারছ না ? অধমের নাম নির্মলচন্দ্র।'
হেসে বললাম, 'ও নির্মলদা। টেলিফোনে তোমার গলা অন্যরকম শোনায়। তাছাড়া তুমিতো বেশি ফোনটোন করোও না।'
'ফোন করা আমার আসে না। কেউ কেউ পারে মেয়েদের মত টেলিফোন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে, থুড়ি, এখানে আবার মেয়েদের একটি প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে আছে। নিজের জাতের নিন্দা শুনলে সে কষ্ট পাবে। ফোনটা তাকে দিচ্ছি। তার সঙ্গে কথা বল। বুঝতে পারছ কে ?'
বললাম, 'পারছি।'
নির্মলদা সকৌতুকে বললেন, 'কে বল তো ?'
আমি বললাম, 'অর্চনা—মানে বউদি।'
নির্মলদা তেমনি কৌতুকের সুরে বললেন, 'ঠিকই ধরেছ। আমি শুধু সংযোজক অব্যয়। আর কিছু না। না-ও কথা বলো।'
'হ্যালো।'
এবার অচর্নার গলা শুনতে পেলাম। ওর গলা মিষ্টি। ও চিরকালই অনুচ্চভাষিনী। বললাম, 'কি ব্যাপার ? সকালেই যে খুব খোঁজ-খবর নিচ্ছ।'
অর্চনা একটু অভিমানের সুরে বলল, 'আমরা খোঁজ-খবর না নিলে তুমি তো আর নিজে থেকে খোঁজ নাও না।'
বললাম, 'কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি।'
'আহা! কাজ যেন আর কেউ করে না। এখন কী করছিলে এই সকালবেলায় ?'
একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমার এক প্রবীণ বন্ধুর একটি বই বেরোবে আমাদের পাবলিশিং ফার্ম থেকে। সেইটাই একটু গুছিয়ে-

টুছিয়ে দেখে-শুনে নিচ্ছিলাম।'
'মানে বাড়িতেও অফিসের কাজ বয়ে নিয়ে এসেছো। কী যে তুমি।'
'ঠিক অফিসের কাজ নয়। এটা বন্ধুকৃত্য। যাকগে। তোমার খবর বলো।'
অর্চনা বলল, 'খবর আর কি। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। অফিসের পরে চলে এসো না আমাদের এখানে। রাত্রে সবাই মিলে একসঙ্গে খাব।'
'আবার খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলার কি দরকার। আজকে কোন উপলক্ষ আছে নাকি? বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী?'
অর্চনা বলল, 'না-না ওসব কিছু না। বিনা উপলক্ষে আসতে নেই বুঝি?'
বললাম, 'আর একদিন গেলে হয় না? আজ একটু জরুরী কাজ আছে।'
'যেদিন বলব সেদিনই তুমি কাজর দোহাই দেবে। আজই চলে এসো। দেরি হলে কোন অসুবিধা হবে না। এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া তো দেরিতেই হয়।'
বললাম, 'আচ্ছা।'
অর্চনা কেন ডাকল? কেন খেতে বলল? উপলক্ষটা খুঁজে পেলাম না। বিবাহ-বার্ষিকী যে নয় তা আমি জানি। ওদের বিয়ে হয়েছিল ফাল্গুন মাসে। আর এটা শ্রাবণ মাস। এক হিসাবে এই বিয়ের ঘটক আমিই। অন্তত বরপক্ষ আর কনেপক্ষ দুই পক্ষকেই আমি যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলাম। রাজঘোটক হয়েছে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলবে।
উপলক্ষ জানা না থাকলে উপহার নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে না। ওরা বড়লোক মানুষ। আমাদের ছোট-খাট উপহারে কি ওদের মন উঠবে? নির্মলদারা আমার আপন মাসতুতো ভাই। কিন্তু বড়লোক হওয়ার পর কতখানি আপন আছে তাতে আমাদের মনে গভীর সন্দেহ রয়েছে। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন এইসব উপলক্ষ ছাড়া ওঁরাও আমাদের বাড়িতে আসেন না, আমরাও ওঁদের বাড়িতে যাই না। বরং অনেক সময় ওঁরা নিমন্ত্রিত হয়েও সেই

নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না। ওঁরা যে সমাজের কয়েক ধাপ ওপরে উঠেছেন ওঁদের চালচলনে কথাবার্তায় তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি অন্তত এই নিয়ে-আমার মনে কোন অভিযোগ নেই। বরং এইটাই ওঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। ওঁরা যে ইচ্ছা করে ওদের জাঁকজমক দেখান তা নয়, আমরাই সাধারণ গৃহস্থ বলে ওঁদের আড়ম্বর অনুষ্ঠান বাড়ি-গাড়ি আসবাবপত্র মেয়েদের গাভরা অলঙ্কার আর মনভরা অহঙ্কারের ওপর আমাদের চোখ বেশি গিয়ে পড়ে।

কিন্তু বছরে কদিনই বা আমরা মুখোমুখি হই। আমার মা আর মাসি দুই বোন শহরের দুই প্রান্তে থাকেন। আমরা উত্তরে ওঁরা দক্ষিণে। যাওয়া-আসা নেই, দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তাই ওঁদের ঐশ্বর্যের উচ্ছ্বলতায় আমাদের চোখ ঝলসাবার ফুরসৎ বড় কমই ঘটে। আমাদের শ্যামপুকুর স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ির দারিদ্র্যও ওঁরা দেখতে পান না।

শুধু মা-ই মাঝে মাঝে আমাদের কাছে অনুযোগ করেন, 'দিদি একবার একটা খোঁজও নেয় না। শত হলেও মায়ের পেটের বোন তো। জামাইবাবু না হয় বুড়ো হয়েছেন। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মত্ত। কিন্তু ছেলেমেয়েরা? ওরা তো একটু খোঁজ-খবর করতে পারে। এখন তো আমাদের বাড়িতে ফোনও হয়েছে। মাঝে মাঝে একটা ফোন করলেই বা দোষ কিসের?'

দাদা বলে, 'জানো না মা ওরা খুব হিসেবী। বড়লোক হলে কি হবে একটি ফোন ওরা বিনা হিসাবে খরচা করে না। আমাদের ফোনের বিল যত ওঠে তুলনায় ওদের বিল তত হয় না।'

একই কটাক্ষে দাদা আমাকে আর বউদিকে বিদ্ধ করে।

অনুযোগ অভিযোগ আমরা নিজেরাই মনে মনে পোষণ করতাম। মুখ ফুটে বলতাম না। মাসি-বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন হবার জো হয়েছিল। কিন্তু নির্মলদা আর অর্চনার বিয়ের পরে অবস্থাটা একটু পালটে গেছে। খুব ঘন ঘন না হলেও দু একটা ফোন ওদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে আসে। আমিও বিনা নিমন্ত্রণে বিনা উপলক্ষে ওদের বাড়িত বার

দুই গিয়েছি।
আমার এই বউদি ঠাট্টা করতে ছাড়ে না, 'খুব যে টান দেখছি, হবেই তো, একে বান্ধবী তারপর বউদি।'

আজও যখন অফিসে বেরোবার আগে বলে গেলাম, 'মা, আমি রাত্রে বোধহয় আজ আর বাড়িতে খাব না, মা বললেন, 'বোধ হয় টোধ হয় বুঝিনে বাপু। না খেলে পরিষ্কার করে বলে যাও। কেন, আজ আবার কোথায় নেমতন্ন ?'
বউদি হেসে বলল, 'জানো না মা, অর্চনা ওকে আজকাল খুব নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। পুরোনো মাসি বাড়িতে নতুন বউদি এসেছে। আমরা আর পাত্তা পাইনে।'
মাও হাসলেন, 'তুমি বড়ই হিংসুটে হয়েছ মাধুরী।'
বউদি জবাব দিল, 'কেবল আমার দোষই দেখছ মা। কিন্তু তোমার ছোটছেলে যে ক্রমেই বড়লোক ঘেঁষা হয়ে উঠছে তা দেখতে পাচ্ছ না।'
মা বললেন, 'সত্যি, নির্মলদের এত পক্ষপাতই বা কিসের। তোর দাদা বউদিকে বলে না, কেবল তোকেই যেতে বলে, খেতে বলে।'
হেসে বললাম, 'ওরা জানে দাদার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। আমি নিরাশ্রয় নির্বান্ধব। তাই কিঞ্চিৎ সহানুভূতি সমবেদনা—'
আমি বউদির দিকে হেসে তাকালাম।
বউদিও হেসেই জবাব দিল, 'একটু সাবধানে থেকো। বেশি সমবেদনা কিন্তু ভালো নয় ভাই। শেষে বিষম কিছু ঘটে যেতে পারে।'
মনে মনে হাসলাম। বিষম কিছু ঘটতে পারে! না কোন মেয়েকে নিয়ে তেমন কোন আশঙ্কা আমার নেই। আমার এই ছাব্বিশ বছর বয়সে মেয়েদের সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা নিশ্চয়ই আমি পোষণ করিনে; আবার অতিরিক্ত ঔৎসুক্য কৌতূহল কি তৃষ্ণাও আমার নেই। সেই স্তরও আমি অনেকদিন পার হয়ে এসেছি। আমার সমবয়সী বন্ধুরা বলে বেশি বয়সীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলেই আমি অকালে প্রবীণতা লাভ করেছি। তার মানে ইচ্ছা

করেই আমি নাকি একপুরুষ পিছিয়ে গিয়েছি। ওরা বলে আমার মধ্যে কালধর্ম নেই। আমার দেহটা একালের মনটা সেকালের। কী জানি, আমি তো তেমন করে কিছু বুঝতে পারিনে, কোথায় এই দুই কালের সীমারেখা।

তবে বয়স্কদের কাছে আমি অপ্রিয়ভাজন নই। আমি সবিনয়ে তাঁদের বক্তব্য শুনি। যেটুকু গ্রহণ করবার আমি সেটুকু গ্রহণ করি, যা গ্রহণ করতে পারিনে তা নিঃশব্দে বর্জন করি। নিষ্ফল বাদ প্রতিবাদের মধ্যে যাইনে। আমি জানি ওদের কাউকে বদলাবার পক্ষে ওরা যথেষ্ট প্রবীণ। আমি নিজেকেই কি ইচ্ছামত বদলাতে পারি ?

হয়তো আমার এই ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার জন্যেই আমি মেসো-মশাইর কিছু স্নেহভাজন হয়েছি। বিশ্বাসভাজনও। তিনি তাঁর জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কথা আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, 'সঞ্জীব তোমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ হয়। তোমার সঙ্গে আমার যতটা মেলে আমার ছেলেদের সঙ্গে তেমন মেলে না।'

এই নিয়ে আমার তিন মাসতুতো ভাই—অমলদা, শ্যামলদা, নির্মলদা —সবাই আমাকে ঠাট্টা করেন, 'সঞ্জীব হল বাবার মানসপুত্র।'

কেউ কি আর কারো মানসপুত্র হতে পারে ? তবে মেসোমশাইর সঙ্গে আমি উদ্ধত ব্যবহার করিনে আর তাঁর বহু দোষ থাকলেও কিছু কিছু গুণের আমি প্রশংসা করি এই জন্যেই তিনি হয়তো আমাকে পছন্দ করেন।

ধর্মতলা স্ট্রীটে আমাদের অফিস। প্রেস আছে, পাবলিকেশন আছে। বৃহৎ আকারের কিছু নয়। আমার চাকরী পাবলিকেশন ডিপার্টমেণ্টে। আমি সহকারী মাত্র। আমার মাথার ওপরে আছেন সজল মৈত্র। তাঁর ওপরে মালিকেরা। ক্বচিৎ কখনো তাঁদের ঘরে আমার ডাক পড়ে। আমি সজলবাবুর আড়ালে বাস করি। প্রেসে যাই, দরকার হলে ফাইনাল প্রুফ দেখে দিই। লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। কোন নবীন লেখকের ম্যানাসক্রিপট পড়তে দিলে পড়ি। বই বেরোলে তার বিজ্ঞাপন লিখতে বসি। নানারকমের

কাজকর্মই আমাকে করতে হয়। সজলবাবু আমাকে একটু বেশি খাটিয়ে নেন সে কথা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু শরীর অসুস্থ না থাকলে, কি মনমেজাজ নিতান্ত খারাপ না থাকলে আমি খাটতে আপত্তি করিনে।

সজলবাবু তাতে খুশি হন। তিনি বলেন, 'খেটে যাও সঞ্জীব খেটে যা, এই তো পরিশ্রম করবার বয়স। তুমি আমার কাজ করছ বলে মনে কোরো না। কোম্পানীর কাজও নয়। কাজ যখন করবে নিজের কাজ বলে ভাববে। তাহলেই কাজটা ভূতের মত তোমার ঘাড়ে চাপবে না। তুমি তোমার কাজের ওপর প্রভুত্ব করতে পারবে।'

সজলবাবুর কথাগুলি নতুন নয়। কিন্তু ওঁর বলবার ভঙ্গীটি বড় মিষ্টি। গলার স্বরটি ভারী কোমল। সজলবাবু দেখতেও সুপুরুষ। বেশ লম্বা চেহারা, ছ' ফিটের কাছাকাছি। গৌরবর্ণ, বাহান্ন-তেপ্পান্ন হবে বয়স। কি তার কিছু বেশিও হতে পারে। সাধারণত মিহি ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে ঝোঁক আছে। একটু বা সাজ-সজ্জার দিকেও। আমার ভালই লাগে।

সজলবাবু বলেন, 'ভোজনরসিক কাকে বলে জানো? যিনি পোলাও মাংসও খেতে পারেন, আবার ডাল ভাত ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়েও বেশ পরিতোষের সঙ্গে খেয়ে উঠতে পারেন। কাজের বেলাতেও তাই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যে কাজ যখন তোমার হাতে আসবে তুমি যদি হাসিমুখে করে যেতে পার তাহলেই বুঝব তুমি কর্মযোগী।'

সজলবাবুর কর্মযোগের এই তত্ত্ব আমি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করি তা নয়। কিন্তু তা নিয়ে বড় একটা তর্ক করিনে। সমাজে সব কাজ কি সমান? সব কাজের মর্যাদা আর অর্থমূল্য কি এক-রকম? যে কাজে মর্যাদা কম অর্থ কম, আনন্দও কম মানুষ সে কাজকে কী করে নিজের কাজ বলে ভাববে? এই যে আমাদের অফিসে দারোয়ান-বেয়ারা সাধারণ কম্পোজিটাররা যা মাইনে পায় তাতে কি ওদের কাজের সঙ্গে সবসময় একাত্ম হতে পারে?

আমি সজলবাবুর সঙ্গে তর্ক করিনে।। কিন্তু আমার মুখের ভাব দেখে ঠোঁটের হাসি দেখে তিনি বুঝতে পারেন তাঁর কর্মতত্ত্ব আমি সেণ্ট পারসেণ্ট গ্রহণ করিনি। কিন্তু তাই বলে আমি নিজের কাজে ফাঁকি দিইনে।

সজলবাবু সদালাপী। মোটামুটি প্রসন্ন মুখে, ঠাণ্ডা মেজাজে কাজকর্ম করেন। করিয়েও নেন। কিন্তু আজ এসে দেখলাম ওঁর মুখটা কেমন ভার ভার। সিগারেটটা বেশি খাচ্ছেন। মন খারাপ থাকলে ওঁর ধূমপানের মাত্রা বেড়ে যায়।

আমি বললাম, 'আজ আপনার শরীর খারাপ নাকি সজলবাবু ?'

সজলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, প্রেসারটা বড় বেড়েছে।'

বললাম, 'আপনি না এলেই পারতেন। শরীর যখন এত খারাপ।'

তিনি বললেন, 'না এলে চলে কী করে।'

'বেশ আজ আর বেশিক্ষণ থাকবেন না। কী করতে হবে আমাকে বলুন। তারপর কাজকর্ম সেরে বাড়ি চলে যান।'

সজলবাবু একটু হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। অফিসের মালিক যদি তুমি হতে তাহলে মন্দ হত না সঞ্জীব।'

আমি একটু লজ্জিত হলাম। আমাদের অফিস সরকারী অফিসের মত নয়। যিনি বয়সে বড় পদমর্যাদায় বড় তাঁর কাছেও আমরা সহজে যেতে পারি, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি। আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতনদের স্যর বলে ডাকিনে। নামের পরে একটা বাবু বসিয়ে দিই। আর যাঁরা দু-চার পাঁচ বছর এমন কি দশ বছরেরও বড় আমরা তাঁদের নামের সঙ্গে দাদা জুড়ে রাখি। ছোট বলেই অফিসের পরিবেশটা মোটামুটি ঘরোয়া।

কিন্তু ইদানীং কেন যেন আমার মনে হচ্ছে সজলবাবু এত ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করছেন না। তাঁর মেজাজ ভাল নেই। কেন নেই সে কথাও আমার একেবারে অজানা নয়। আমি অবশ্য অফিসের ব্যাপারে মাথা গলাই না। কানও পাতিনে। তবু কোন কোন কথা কানে আপনা থেকেই আসে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সজলবাবুর তেমন পড়ন হচ্ছে না। ওঁর কাজকর্মে তাঁরা খুশি নন। তাছাড়া হিসাবপত্রেও কিছু গোলমাল ধরা পড়েছে। শুনে আমি দুঃখ

পেয়েছি। তাই যদি হয় তাহলে পরিণামটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। আহা, সজলবাবু অত ভাল লোক, কিন্তু অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে পুরোপুরি ভাল লোক তাঁকে বলি কী করে? বেশির ভাগ মানুষই কি অংশত ভাল অংশত খারাপ? কোন কোন ব্যাপারে ভাল আবার কোন কোন বিষয়ে খারাপ?

একটু বাদে বেয়ারা কার্তিক এসে সেলাম জানাল, 'বড়বাবু ডাকছেন আপনাকে।'

বড়বাবু মানে বড় তরফের মালিক মিঃ দত্ত। তিনি আলাদা চেম্বারে বসেন।

সজলবাবু উঠে গেলেন। একটু বাদে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট পরিমলবাবুও উঠে গেলেন ওঁর ঘরে। মোটাসোটা গুরুগম্ভীর মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

খানিক বাদে সজলবাবু ফিরে এলেন। মুখ গম্ভীর থমথমে।

আমি আর ভরসা করে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। মাথা নিচু করে নিজের টেবিলে বসে কাজ করে যেতে লাগলাম। দরকার মত দু'-একবার প্রেসে গেলাম। ফোন ধরলাম।

সজলবাবুও নিজের কাজ নিয়ে রইলেন। পাঁচটা পর্যন্তই অফিসে কাজ করলেন।

বরং আমাকে বললেন, 'তোমার নাকি একটু আগে যাওয়া দরকার সঞ্জীব। তুমি যেতে পার।'

বললাম, 'না না, আমার খুব আগে যাওয়া দরকার নেই। চলুন না হয়, একসঙ্গেই বেরোব।'

কিন্তু আমার মনে হল সজলবাবু যেন আমাকে আজ একটু এড়িয়ে যেতে চান। আমরা আমাদের একান্ত প্রিয়পাত্রকেও সবসময় সহ্য করতে পারিনে। তাই আমরা আলাদা ভাবেই বেরোলাম।

গরচা রোডে মেসোমশাইর বাড়ি। বিরাট তিনতলা বাড়ি। বাড়ির লাগায়ো কারখানা। সাইনবোর্ড টাঙানো আদিত্য দত্ত এণ্ড সন্স। তিনতলা বাড়ির একতলার ঘরগুলি স্টোর রুম। কৌটো ভরতি সব পুষ্টিকর খাদ্য। শিশুদের একরকম বয়স্কদের আর একরকম।

জাতিকে এই খাদ্য জুগিয়েই মেসোমশাই বড়লোক হয়েছেন। শুনেছি খাদ্যের পর প্রসাদন দ্রব্যের দিকে মন দিয়েছেন মেসোমশাই। ব্যবসায় এখন সেদিকে সম্প্রসারিত।

বাড়ির সামনে যে লনটুকু আছে সেখানে পায়চারি করছিলেন মেসোমশাই। দীর্ঘ চেহারা, কিন্তু পরণে খাটো ধুতি, গায়ে সাদা ফতুয়া। হাতাটা কনুই পর্যন্ত এসেছে। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। বেশির ভাগই পাকা। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মনে হল সন্ধ্যার আগেও তিনি একবার কামিয়েছেন। নইলে গাল এত পরিচ্ছন্ন থাকবার কথা নয়। আশ্চর্য এই বয়সেও শরীরের কোথাও মেদবাহুল্য নেই। বেশ সোজা হয়ে হাঁটেন। মেসোমশাই সুপুরুষ নন। তবে দেখলেই বোঝা যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ।

আমি সামনে গিয়ে প্রণাম করলাম, 'এই যে মেসোমশাই, কেমন আছেন?'

'কে?'

তিনি ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। ওঁর চোখে চশমা। কালো মোটা ফ্রেম। সাধারণ শেলের তৈরি।

'আমি সঞ্জীব।'

তিনি হেসে বললেন, 'ও সঞ্জীবন। এসো এসো।' সস্নেহে আমার পিঠে হাত রাখলেন মেসোমশাই। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে আদর করে সঞ্জীবন বলে ডাকেন। আমি ভাবি, আমার মধ্যে সত্যিই কি তেমন জীবনীশক্তি আছে?

গুদামের পাশে ছোটমত একখানা বসবার ঘর আছে। মেসোমশাই আমাকে নিয়ে প্রথমে সেই ঘরে ঢুকলেন। চাকর এসে আলো জেবলে দিয়ে গেল। এই ঘরখানিও সোফা-সেটিতে সাজানো। শুনেছি মেসোমশাইর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ নেই। দু' একজন যাঁরা আছেন তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে এ ঘরে এসে বসেন। আর আসেন কারো সঙ্গে গোপন কোন পরামর্শ থাকলে।

মেসোমশাই বললেন, 'এসো সঞ্জীব।' তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'তুমি তো ছোট বউমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ।'

আমি ওঁর সামনের সোফাটায় বসে বললাম, 'আমি আপনার সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি মেসোমশাই। আগে দেখা হয়ে গেল ভালই হল। নইলে পরে দেখা করে যেতাম।'

মেসোমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তা যেতে। দেখা করেই যেতে। আজকাল অনেকেই আমাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু তুমি সে প্রকৃতির ছেলে নও।'

বললাম, 'এড়াব কেন? আপনি বোধহয় জানেন না মেসোমশাই আমার বেশির ভাগ বন্ধুই প্রৌঢ়, বৃদ্ধ।'

মেসোমশাই একটু হাসলেন, 'তাই নাকি? শুনে তো খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। আমার সমবয়সী দু-তিনজন ভদ্রলোককে দেখেছি তাঁরা বুড়োদের সঙ্গে মেশেন না। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গ খুঁজে বেড়ান। কিন্তু উল্টোটা কি হয়? উল্টোরথ কি চলে? কমবয়সী ছেলেমেয়েরা কি বুড়োদের সঙ্গ চায়?'

আমি বললাম, 'আর কারো কথা বলতে পারি নে। তবে বন্ধুত্বের বেলায় বয়স আমার কাছে একটা ফ্যাকটর নয়। যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা করতে ভাল লাগে তাঁর সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ কাটাতে পারি। আমি ভুলে যাই তিনি যুবক কি বৃদ্ধ, নারী কি পুরুষ। মেসোমশাই একটু হাসলেন, 'নারী কি পুরুষ সেকথাও ভুলে যাও?'

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিলাম না। তিনি কি ঠাট্টা করলেন? না আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করলেন না?

মেশোমশাই বললেন, 'আচ্ছা, এবার তুমি ওপরে যাও। ছোট বউমারা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে দাঁড়ালাম না। তা হলে মেসোমশাই ভাববেন, আমি যাওয়ার জন্যে একেবারে উন্মুখ হয়ে আছি।

বললাম, 'অর্চনা—অর্চনা বউদি আপনার সেবাযত্ন ঠিক মত করে তো?'

মেসোমশাই আমার দিকে তাকালেন, 'তুমি বুঝি ছোট বউমার নাম ধরে ডাকো? বউদি বলবে। বউদি বলাই ভাল। আমাদের

সময়—এ সব ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ছিল। যারা সম্পর্কে আমাদের মাসি-পিসি হত তারা সমবয়সী এমন কি দু'-এক বছরের ছোট হলেও আমাদের ডাকতে হত মাসিমা পিসিমা বলে। এখন তো সব নাম ধরে ডাকে। তুই তোকারি করে। লঘুগুরু সব সমান।'
আমি কোন তর্ক করলাম না। শুধু সম্বোধন নয়, এ কালের চাল-চলন আচার-ব্যবহার পোষাক-আসাক খুঁটি-নাটি অনেক কিছুর বিরুদ্ধেই মেসোমশাইর আপত্তি আছে। আর কোথাও না হোক নিজের বাড়িতে তিনি নিজের সেই মত, আদর্শ বলবৎ রাখতে চান। কিন্তু যৌবনে তিনি যা পেরেছিলেন এই বার্ধক্যে এসে তা পারবেন কেন। যদিও এই বাড়িঘর কারখানা বিষয়সম্পত্তি তিনিই সব করেছেন, তাঁর ছেলেরা শুধু ভোক্তা মাত্র, তবু সেই ছেলেদের প্রভাপ দিনের পর দিন বাড়ছে, তারা মেসোমশাইর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলছে এই ধারণা তাঁকে কষ্ট দেয়।
তাঁর এই দুঃখ মোচনের ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে তাঁকে সান্ত্বনা দিই।
আমি বলি, 'মেসোমশাই আপনি এসব খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে মনে অশান্তি আনবেন না। দাদারা বড় হয়েছেন, ওঁদের ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতাও হয়েছে। ওঁদের এবার স্বাধীনভাবে থাকতে দিন।'
মেসোমশাই বলেন, 'বাবা এ সব কথা বলা বড় সহজ। বিয়ে করে ছেলেমেয়ের বাপ হও তখন বুঝবে।'

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি দোতলায় উঠলাম। সিঁড়ির ডানদিকে মেসোমশাইর শোবার ঘর। এ ঘরখানা বেশ বড়। মাসিমা তাঁর ঘর-গৃহস্থালীর অনেক জিনিসপত্র এ ঘরে জড় করেছেন। ডবল বেডের খাট, গোদরেজের আলমারি, সুবৃহৎ রেডিও সেট যেমন আছে তেমনি পুরোন আমলের ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্সও এ ঘরে রেখে দিয়েছেন। বাক্সটায় সিন্দুরের পুত্তলি আঁকা।
একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মাসিমা ওগুলি কেন রেখেছ?'
তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ওগুলি তোর মেসোমশাইর কারবারের

প্রথম দিন থেকে আছে। ঘরের লক্ষ্মী।'
হেসে বলেছিলাম, 'ওতো কাঠের লক্ষ্মী। আসল লক্ষ্মী তো তুমি।'
মাসিমা হেসেছিলেন, 'লক্ষ্মী না আরো কিছু। তোর মেসোমশাই আমাকে মোটেই পছন্দ করেন না। বলেন তুমি মোটা হয়ে গেছ।'
মাসিমা মোটা হয়েছেন ঠিকই। বেঢপ ধরনেরই মোটা হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে কি মেসোমশাই তাঁকে অপছন্দ করেন? ওটা মাসিমার সোহাগের কথা।
মাসিমার ঘর পর্যন্ত যেতে হল না। তার আগেই তিনি বেরিয়ে এলেন, 'এই যে এসেছিস? আয়। এ মুখো হওয়াই তো তোরা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিস। সুহাস কেমন আছে রে?'
হেসে বললাম, 'মা? মা ভালই আছে মাসিমা।'
'আচ্ছা যা। বউমারা তোর জন্যে অপেক্ষা করছে।'
বললাম, 'তুমিও বউমা বল নাকি মাসিমা? নাম ধরে ডাকতেও তো শুনেছি।'
মাসিমা হেসে বললেন, 'নাম ধরেও ডাকি—আবার বউমাও বলি। একটা বলে ডাকলেই হল।'
তা ঠিক, ডাকা ডাকিতে কি এসে যায়।
দোতলার ঘরগুলি আমার মাসতুতো বোনদের জন্য। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো বোনটি বাদে আর দুটির ছেলেমেয়েও হয়েছে। তবু তারা বছরের বেশির ভাগ সময় বাপের বাড়িতেই থাকে। কে যে কখন এসে পড়বে তার ঠিক নেই। তাই তাদের জন্যে এক এক-খানা ঘর আলাদা করে রাখা আছে। কেউ কেউ আবার সেই ঘর তালা বন্ধ করেও যায়।
দোতলার ঘরগুলিতে না গিয়ে আমি তিনতলায় উঠলাম।
মেয়েদের জন্যে একখানা করে ঘর বরাদ্দ। কিন্তু ছেলেদের জন্য দু'খানা করে। একখানা শোবার আর একখানা বসবার। এ ছাড়া প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে, ঘরের সামনে ব্যালকনি আছে।
যার ঘর তার পছন্দমত সাজাবার স্বাধীনতা মাসিমা প্রত্যেক বউকে দিয়েছেন। কিংবা তারা আদায় করে নিয়েছে। এই অন্দরমহলে

মেসোমশাইর তেমন প্রতিপত্তি আছে বলে মনে হয় না। এখানে মাসিমার রাজত্ব। তাঁর নিয়মকানুন, শাসন-প্রশাসন এখানে চলে। অবশ্য কতটা চলে তা ঠিক জানিনে।

অমলদা শ্যামলদার ঘর ছাড়িয়ে আমি নির্মলদার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাসিমা আমার সঙ্গে এসে ছিলেন। দরজা ভেজানো। লম্বা নীল রঙের পর্দা ঝুলছে। ভিতর থেকে মেয়েদের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মাসিমা তাদের উদ্দেশ্যে ডাকলেন, 'রত্না, ভারতী, অর্চনা কই তোমরা? দেখ কে এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রত্না বউদি, ভারতী বউদি আর আমার মাসতুতো বোন মঞ্জুলা খাট থেকে নেমে এল।

মঞ্জুলাই আগে এসে আমার হাত টেনে ধরল, 'আরে সঞ্জীবদা এসো এসো। বাব্বা কী ডুমুরের ফুলই না হয়েছে।'

বিয়ের পর মঞ্জুলাকে আমি অনেকদিন বাদে দেখলাম। এরই মধ্যে একটু যেন মুটিয়ে গেছে। না কি বেঁটে বলেই এমন মনে হচ্ছে। গড়নটা মাসিমার ধাতের। তবে তার চেয়ে গায়ের রঙ অনেক ফর্সা। সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। বাড়িতে মেয়েরা যা ব্যবহার করে তার তুলনায় ওর গায়ের গয়নার পরিমাণ কিছু বেশি।

রত্না বউদিব বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। তিনিও বেশ সুন্দরী। ফর্সা লম্বা চেহারা। মেজো ভারতী বউদিও তাই। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাসিখুশি। রঙের দিক থেকে অর্চনার রঙই জায়েদের তুলনায় একটু ময়লা। শ্যামবর্ণ ঘেঁষা তবে শরীরের গড়ন আর মুখের ডৌল ওরই বেশি সুন্দর। আর কালো আয়াত দুটি চোখ। ক্লাসের সবাই ওকে ঠাট্টা করে বলত বিশালাক্ষ্মী। ওর চোখের দৃষ্টিতে কিসের যেন একটা করুণ বিষণ্ণতা মাখা। ওকে বিষাদাক্ষীও বলা যায়। সবাইর চেয়ে অর্চনা সেজেছে কম। বালা, হার আর কানের ফুল ছাড়া আর কোন গয়না পরে নি বলা চলে। শাড়িখানিও জমকালো নয়, বর্ণাঢ্য নয়। হালকা সোনালী রঙের শাড়ি পরেছে অর্চনা।

আমি বললাম, 'তোমার হয়েছে কী।'

অর্চনা বলল, 'কী আবার হবে।'
ভারতী বউদি হেসে বলল, 'যে রোগই হোক এবার আমাদের বড ডাক্তার এসে গেছে। আর ভয় নেই।'
'বড় ডাক্তার কে?'
ভারতী বউদি আবার আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, 'কেন তুমি?' তারপর রত্না বউদির দিকে চেযে বললেন, 'চল দিদি, চল মঞ্জু আমরা এবার যে যার ঘরে যাই। ডাক্তার তার পেশেণ্টকে পরীক্ষা করুক।'
অর্চনা একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'কী যে যাতা বল না মেজদি।'
ভারতী বউদি বললেন, 'আমরা সব বসবার ঘরে গিয়ে বসি। সঞ্জীব ঠাকুবপো তুমি ওই খাটের ওপর উঠে বোসো। অর্চু, কী যে তোর ভদ্রতা। বন্ধুকে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখলি। বসতে বলবি তো।'
অর্চনা একটু হাসল, 'তোমরাই তো বলবে।'
রত্না বউদি বললেন, 'আমাদের বলা আর তোর বলা কি এক কথা? চল ভারতী, আমার আবার মেয়েকে খাওয়াতে হবে।'
ভারতী বউদি বললেন, 'তাব জন্যে তো মেয়ের ঠাকুরমাই আছে। তোমার অত চিন্তা কেন দিদি। তা হলে ঠাকুরপো তুমি ভাই তোমার নতুন বউদির সঙ্গে আলাপ-টালাপ কর আমরা যাই। তোর তো ডবল দাবি অর্চি। একই সঙ্গে ক্লাসফ্রেণ্ড আর বউদি। আমরা এম. এ. পাশও করি নি। বাড়ির মধ্যে কোন ক্লাসফ্রেণ্ডকেও আনতে পারলাম না। এ-বাড়ির বউঝিদের মধ্যে তুমিই ভাই একমাত্র ছেলে বন্ধু। তুমি আমাদের কমনফ্রেণ্ড। এজমালি সম্পত্তিতে আমাদের সবারই অংশ আছে।'
ভারতী বউদি হাসতে লাগলেন। বেশ সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু বেশি প্রগলভতা আমার ভাল লাগে না। আর এই রসিকতার ধরণ। আগেও তো দেখেছি ভারতী বৌদিকে। এত চটুলতা যেন ছিল না। বয়স বাড়ছে আর প্রগলভতা বাড়ছে। অথচ স্মিতমুখী মিতভাষিণী হলে এই বউদিকে আরো বেশি সুন্দর দেখাত বলে আমার মনে হয়।

ওঁরা চলে গেলে আমি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। অর্চনা বসল ওর খাটের ওপরে। এই ঘরেই ওর ড্রেসিং টেবল, আলনা, রেডিও সেট। সব বিয়ের সময় পাওয়া। ওর বাবা নিরঞ্জনবাবু দিয়েছেন। মেসোমশাই অবশ্য বলেছিলেন, 'আপনাকে কিছু দিতে হবে না। সব আমার আছে। শুধু শাঁখা-সিঁদুর দেবেন, তাই যথেষ্ট। নিরঞ্জনবাবু, প্রথম জীবনে আমি স্কুলের মাস্টার ছিলাম। আপনি তবু কলেজের প্রফেসর। আপনি সেই স্কুল মাস্টারের সঙ্গেই কটুম্বিতা করছেন এইটা ভেবে নিন।'
কিন্তু নিরঞ্জনবাবু তা ভাবতে পারেন নি। শাঁখা-সিঁদুরে মেয়েকে সম্প্রদান করতে তাঁর মন ওঠে নি। তিনি সাধ্যমত ব্যয় করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই সাধ্য মেসোমশাইর ষ্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনায় অনেক নিচে। শুনেছি ছেলের শ্বশুরবাড়ির এইসব যৌতুকে মাসিমার মন ওঠে নি। রত্না ভারতী বউদিরাও ঠোঁট উলটেছেন। অমলদা শ্যামলদারা বলেছেন, 'আচ্ছা, ওগুলি আপাতত গুদাম ঘরে রেখে দেওয়া হোক। নির্মলের ঘর আমরা সাজিয়ে দিচ্ছি।'
কিন্তু অর্চনা তা হতে দেয় নি। সে বলেছে, 'আমার বাবা যা দিয়েছেন তাই আমি ব্যবহার করব। আর কোন জিনিস কেউ যেন আমার ঘরে না আনে।'
নির্মলদা এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় নি। সে বলেছে, 'শয্যার চেয়ে শয়ন-সঙ্গিনীটিই আসল। তা ছাড়া ঘুম আমার সাধা। আমি পাটিতেও ঘুমোতে পারি আবার মাটিতেও ঘুমোতে পারি।'
মেসোমশাই উদারভাবে বলেছেন, 'সত্যিই তো। ছোট বউমা যা বলেছে তাই ঠিক। ওর বাবার দেওয়া জিনিসই ও ইউজ করুক। তারপর যখন দরকার হবে বদলে নেবে।'
অর্চনার দিকে চেয়ে আমি ফের জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে তোমার বলতো? অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে নাকি?'
অর্চনা হাসল, 'তুমি কি সত্যিই ডাক্তারি করতে এসেছ? অসুখ-বিসুখ করবে কেন? সুখেই তো আছি।'
বললাম, 'তোমার মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।' অর্চনা এ

কথার কোন জবাব দিল না।
আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, নির্মলদা কোথায়? ওদের কাউকেই বাড়িতে দেখছিনে।'
অর্চনা একটু হাসল, 'ওঁরা কি এত সকাল সকাল বাড়ি ফেরেন যে দেখবে?'
'কখন ফেরেন?'
'তার কি কিছু ঠিক আছে? এগারটা বারটা।'
'ওরে বাবা! অত রাত অবধি ওঁরা বাইরে করেন কি?'
অর্চনা বলল, 'সবাই এক কাজ করেন নাকি? বড়দা নতুন এক কারখানা গড়ে তুলছেন সন্তোষপুরে। সে কারখানা ওঁর নিজের। তিনি তাই নিয়ে ব্যস্ত। মেজদার রাজনীতি আছে। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে থাকেন।'
'আর নির্মলদা?'
অর্চনা বলল, 'তিনি দর্শক। রাত্রির কলকাতা দেখে বেড়ান।'
হেসে বললেন, 'একাই দেখেন?'
অর্চনা বলল, 'একা কি আর দেখেন? নিশ্চয়ই সঙ্গী-টঙ্গী আছে। ক্লাব আছে।'
হেসে বললাম, 'তুমি গিয়েছ সেই ক্লাবে?'
অর্চনা বলল, 'এ বাড়ির মেয়েদের বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই। যদি থাকতও ওসব ক্লাবে আমি যেতাম না।'
হেসে বললাম, 'তোমার অত শুচিবায়ুতা কেন অর্চনা?'
অর্চনা বলল, 'শুচিবায়ুতা নয়, শুচিতা বল। তুমি দেখেছ তো আমার বাবাকে? বাবা একটা সিগারেট পর্যন্ত খান না।'
বললাম, 'সবাই তোমার বাবার মত হবে এমন আশা করতে পার না।'
অর্চনা বলল, 'সিগারেটটা না হয় তবু সহ্য করা যায়। যদিও তা আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তুমি দেখেছ ক্লাসে যেসব ছেলে সিগারেট খেত আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতাম না। শুধু ওই গন্ধের জন্যে। ওই গন্ধ আমার কাছে অসহ্য।'
হেসে বললাম, 'আবার এও জানি অনেক মেয়ে ওই সিগারেটের

গন্ধের জন্যেই হার্ডস্মোকারদের পছন্দ করত। কোন কোন মেয়ে নাকি নিজেরাও সিগারেট খেত। আমার চোখে অবশ্য পড়ে নি। কিন্তু কারো কারো ঘ্রাণে অর্ধভোজন হত এ কথা শুনেছি।'

অর্চনা বলল, 'তুমি জানো, আমি সেই অর্ধভুক্তদের দলে ছিলাম না।'

বললাম, 'যার ভরপেট খাওয়ার সাধ্য আছে সে কেন আধপেটা খেয়ে থাকবে?' অর্চনা বলল, 'ভরপেটই বটে। তোমার নির্মলদার যে এত ড্রিংক করার অভ্যাস আছে তা তো তুমি কই আমাকেও বল নি, আমার বাবা-মাকেও বল নি।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'অর্চনা, তুমি মিথ্যে আমাকে দোষারোপ করছ। তোমার মাও আমাকে একদিন এমন অনুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো শুধু তোমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা নিজেরা দেখে-শুনে যাচাই করে নেবে এ ভার তোমাদের ওপরই ছিল।'

অর্চনা আমার কথার কোন জবাব দিল না। বোধ হয় জবাব দেওয়ার কিছু ছিল না।

একটু বাদে আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন। আরো পাঁচটা অভ্যাসের মত মদ খাওয়াটাও একটা অভ্যাস, ছাড়তে কতক্ষণ। সব দেখে-শুনে মানুষ এক সময় এ অভ্যাস নিজেই ছেড়ে দেয়!'

অর্চনা বলল, 'আবার কেউ কেউ ছাড়তে পারেও না, ছাড়তে চাইলেও পারে না। মৃত্যু পর্যন্ত অনেক অনেক অভ্যাসকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বয়ে নিয়ে যায়।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'নির্মলদা নিশ্চয়ই অভ্যাসের অমন দাস হয়ে পড়বে না। তা ছাড়া এর মধ্যে নীতিগত প্রশ্ন তুমি কেন টেনে আনছ? নির্মলদা অ্যাফোর্ড করতে পারে তাই খায়। যারা স্ত্রীপুত্রকে না খেতে দিয়ে না পরতে দিয়ে বারে গিয়ে পড়ে থাকে নির্মলদা নিশ্চয়ই তাদের দলে নয়।'

অর্চনা একটু হাসল, 'খুব যে ওকালতি করছ। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।'

বললাম, 'তুমি ভাল করেই জানো আমি ও রসে রসিক নই। আমি

চুরিও করিনে, লুকোচুরিও করিনে। এর মধ্যে কতটা সামাজিক অন্যায় কতটা বা ব্যক্তিগত রুচি অরুচির ব্যাপার রয়েছে আমি তাই ভাবি।'

অর্চনা আর একটু সোজা হয়ে বসল, 'সেই রুচি অরুচি কি আমার থাকতে নেই? তোমার নির্মলদা জানে ওই গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারিনে।'

হেসে বললাম, 'তোমার শুধু গন্ধে আপত্তি? শুনেছি এলাচ টেলাচ আরো কি সব মশলাপাতিতে ও গন্ধ ঢাকা যায়। নির্মলদাকে বলতে হবে!'

অর্চনা বলল, 'তুমি হাসছ। জানো না তো সহ্য করা কী কঠিন।'

আমি চুপ করে রইলাম। নীতির প্রশ্ন বাদ দিলেও ব্যক্তিগত রুচি অরুচির প্রশ্ন কম কথা নয়। বোধহয় সবচেয়ে বড় কথা। যে বস্তুর স্বাদগন্ধ নির্মলদার কাছে পরম উপাদেয় তার অস্তিত্ব হয়তো অর্চনার পক্ষে অসহনীয়। আমাদের শরীর ধর্ম কি আমাদের মানসিক প্রবণতা হৃদয়বৃত্তির চেয়েও বড়?

অর্চনা বলল, 'কিন্তু তোমাকে আজ তোমার দাদার বিরুদ্ধে নালিশ শোনবার জন্যে ডাকিনি। অন্য একটা দরকারে ডেকেছি।'

হেসে বললাম, 'আমার মত অদরকারী লোককেও কেউ আবার দরকারী কাজে ডাকে! বল কী করতে হবে।'

অর্চনা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সারাদিন বাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে থেকে থেকে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এখানে কিছু আমার করবার নেই। আমি বাইরে বেরিয়ে কিছু করতে চাই।'

'কী করবে, চাকরি বাকরি?'

'হ্যাঁ। যদি মাষ্টারি জোটে—স্কুলে কলেজে পাঠশালায় যেখানে হোক তাই করব। যদি অফিসে কিছু পাই, টেলিফোন অপারেটার থেকে শুরু করে রিসেপসনিস্ট, অফিস অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট যে কোন পোষ্টে—'

'তোমার চাকরির জন্যে উমেদারি করতে বলছ?'

অর্চনা বলল, 'না উমেদারি করতে বলছি না, চাকরি আমি নিজেই জোগাড় করে নেব। কিন্তু তার জন্যে আমাকে বাইরে বেরোতে

হবে, ইণ্টারভিউতে ডাকলে তার জন্যে হাজির হতে হবে। চাকরি পেলে, চাকরি করতেও হবে।'

হেসে বললাম, 'তাতো হবেই।'

অর্চনা বলল, 'সেই মতটা তুমি বাবার কাছ থেকে মানে তোমার মেসোমশাইর কাছ থেকে আদায় করে দাও। শুনেছি, নিজের ছেলেদের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসেন। তুমি আজকালকার ছেলে হয়েও মদ তো দূরের কথা, পান খাও না, বিড়ি সিগারেট খাও না, কোন রাজনৈতিক হুজুগের মধ্যে যাও না, তোমার অন্য কোন বিলাসব্যসন নেই, তুমি ধুতি-পাঞ্জাবি পর, নিজের কাজ আর পড়াশোনা নিয়ে থাকো, বাবার কাছে তুমি আদর্শ ছেলে।'

অর্চনার মুখের দিকে তাকালাম। ওকি ঠাট্টা করছে? কিন্তু ঠিক ঠাট্টা বলে মনে হল না। অর্চনার বাবা নিরঞ্জন চৌধুরীও তো এই আদর্শেই বিশ্বাসী। ওর দাদা তাপস এখন আছে লণ্ডনে। রিসার্চের ছাত্র। শুনেছি তার আচার আচরণেও এই ধরনের মূল্যবোধ স্বীকৃতি পায়। ছেলের সঙ্গে নিরঞ্জনবাবুর নিয়মিত চিঠিপত্র চলে। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে আমার প্রোটোটাইপ নয়। কিন্তু আমার ছেলে আমারই ছেলে। আমারই চিত্তবৃত্তির অনুসারী উত্তরাধিকারী।'

আমি অর্চনার দিকে চেয়ে বললাম, 'তুমি যা বললে সবই আমার নেতিবাচক বিশেষণ। আমার মধ্যে সদর্থক অস্তিবাচক কিছু নেই। 'সব না না না না। এই তা-না-না-য় আমি আরো কিছু যোগ করতে পারি। আমি কোনদিন মেসোমশাইর কাছে কোন আবেদন নিয়ে আসিনি। তুমি জানো কিনা জানিনে, মেসোমশাই তাঁর এই কারবারে আমাকে আর আমার দাদাকেও টানতে চেয়েছিলেন। দাদার মন একটু টলে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসেনি। আমিও আসিনি। এলে আমার মাসতুতো ভাইদের মত, মাসতুতো ভগ্নীপতিদের মত কোন না কোন ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ হয়ে যেতে পারতাম। মোটা মাইনে পেতাম। বলা যায় না পরিণত বয়সে দু' এক পয়সার শেয়ারও হয়তো জুটে যেত।'

অর্চনা একটু হাসল, 'তবে এলে না কেন?'

আমি এ কথার কোন জবাব দিলাম না। বললাম, 'আমিও আসিনি। আমার কোন আত্মীয়-বন্ধুকেও চাকরির প্রার্থী করে পাঠাইনি।'
অর্চনা বলল, 'কিন্তু আমার কেস আলাদা। আমি তো আর আমার স্বশুরের কারখানায় কি অফিসে চাকরি চাইছিনে। আমি শুধু এই দুর্গ থেকে বেরোবার জন্যে একটি গেটপাশ চাইছি। তার জন্যে তুমি সুপারিশ করতে পার।'
হেসে বললাম, 'নির্মলদাকে বলনা।'
অর্চনা বলল, 'ওরে বাবা। এ ব্যাপারে বাবার ছেলেরা তাঁর বাবা। এ বাড়ির বউরা বাইরে বেরোবে চাকরি করতে? বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হবে না?'
হেসে বললাম, 'এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমি বললেই কি কিছু হবে। নির্মলদাকে রাজি করাতে হবে। তারপর মেসোমশাইকে ধরব।'
অর্চনা বলল, 'যেভাবেই পার এই কাজটুকু তোমাকে করে দিতেই হবে। তাহলে বুঝব তুমি আমার যথার্থ বন্ধু।'
বললাম, 'পুরস্কারটা কী পাব?'
অর্চনা বলল, 'পুরস্কার? তুমি নাকি নৈতিবাদী নিষ্কাম পুরুষ? আমার কাজ উদ্ধার হলে তোমাকে আমি একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজে দেব। যেমন তুমি আমাকে সুন্দর পাত্রের খোঁজ দিয়েছ।'
হেসে বললাম, 'পাত্রটি যে সুন্দর তাতে কোন সন্দেহ নেই অর্চনা। নির্মলদা আমাদের ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ। বীরপুরুষও। বন্দুক ছুঁড়তে পারে, শিকার করতে পারে।'
ভারতী বউদি খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, 'বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প করলেই বুঝি হবে অর্চনা? ওকে চা-টা দিতে হবে না?'
অর্চনা বলল, 'সেজন্যে তো তোমরাই আছ। সিনিয়র বউদিরা।'
ভারতী বউদি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি বসে বসে মুখামৃত পান করবে আর আমরা আছি দাসী বাঁদি চা জোগাব, পান দোক্তা জোগাব।'
ট্রেতে করে কেটলি আর তিন চারটি কাপ নিয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ে এসে ঢুকল।

ভারতী বউদি বললেন, 'পদ্মা তুই সব রেখে যা। আমি ঢেলে দেব।'
মেয়েটি চলে গেলে ভারতী বউদি বললেন, 'আমার এই নতুন ঝিটি কেমন দেখতে সঞ্জীব ?'
বললাম, 'ভালই তো।'
ভারতী বউদি বললেন, 'কালোর ওপর বেশ মিষ্টি চেহারা, তাই না ?'
বললাম, 'হুঁ।'
ভারতী বউদি বললেন, 'আমি এ বাড়ির কয়েকটি বুড়ী ঝি আর অপদার্থ চাকরকে বাদ দিয়ে নতুন লোক নিয়েছি। দুটি বুড়ির অবশ্য পেনসনের ব্যবস্থাও করেছি। সব আমার হাত খরচ থেকে।'
হেসে বললাম, 'মহারাণী করুণাময়ী। আর বুড়ো দারোয়ান ড্রাইভার রাঁধুনে বামুনদের কী অবস্থা ? তাদেরও কি চাকরি গেছে নাকি ?'
ভারতী বউদিও হাসলেন, 'ওটা আমার ডিপার্টমেণ্ট নয়। তারা প্রায় সবাই বহাল তবিয়তে আছে। ও কি তুমি মিষ্টিটিষ্টি কিছু খাচ্ছ না যে।'
বললাম, 'আমি চা বিস্কুটই খাব। মিষ্টি পছন্দ করিনে বউদি।'
'তাই কি হয় ভাই ? শুধু মিষ্টি মুখের পানে চেয়ে থাকলেই চলে ? মিষ্টি খেতেও হয়।'
হঠাৎ ভারতী বউদি একটি রসগোল্লা আমার মুখে জোর করে গুঁজে দিলেন। খানিকটা রস আমার জামায় লেগে গেল। আমার মনে হল এও ভারতী বউদির দুষ্টুমি।
আমি বললাম, 'কী করলেন দেখুন তো। দিলেন তো আমার জামাটা নষ্ট করে ?'
ভারতী বউদি বললেন, 'এই বুঝি নষ্ট করা হল ? আচ্ছা পণ্ডিত তো ? অর্চনা, দে তো এই রসটুকু ধুয়ে। এই হল রসের মাহাত্ম্য। লাগাতেও রস, ধুয়ে ফেলতেও রস। চলি ভাই রাঙা ঠাকুরপো।'
বললাম, 'আমি আবার রাঙা হলাম কখন ?'
'লজ্জায় রাঙা না কি অনুরাগে রাঙা ? কোনটা মানানসই হয় অর্চনা বলতো।'

অর্চনা বলল, 'কী জানি মেজদি। আমি তো কোথাও রং দেখছিনে।'

ভারতী বউদি বললেন, 'তুমি আবার রং দেখছ না? তোমার ছোঁয়ায় আমাদের সঞ্জীব ঠাকুরপো যে একখানা রামধনু হয়ে রয়েছে। যাই ভাই, এবার তোমরা খাওয়া দাওয়া শেষ কর। খেয়েদেয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করো। দুজনেই এসো। উনি তোমাদের খবর দিয়েছেন। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

তিনি বেরিয়ে গেলে আমি বললাম, 'ভারতী বউদি একখানা মেয়ে বটে।'

অর্চনা বলল, 'হ্যাঁ, খুব ঠাট্টা তামাসা করতে পারে। নিজেও আনন্দে থাকে বাড়ির আর পাঁচজনকেও আনন্দে রাখে। তবে মাঝে মাঝে বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এই যা দোষ।'

একটু বাদে বলল, 'কী আর করা যাবে। যার যা স্বভাব।'

'আর রত্না বউদি?'

তিনি এর বিপরীত। গম্ভীর প্রকৃতির। বাইরের লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে পারেন না। বউদি ঘরের কাজকর্ম নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন। বেশ গুছাতে টুছাতে জানেন।'

হেসে বললাম, 'আর আমার মাসীমার ছোট বউ?'

অর্চনা বলল, 'তাকে তো দেখতেই পাচ্ছ।'

মনে মনে ভাবলাম দেখতে পাচ্ছি বই কি। তবে অর্চনাকে আগে যেমন দেখেছি তার চাইতে ও যেন আরো একটু গম্ভীর হয়েছে। ওর মুখে চোখে বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

অর্চনা বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বাবা নাকি আবার অপেক্ষা করছেন।'

'হ্যাঁ মেসোমশাই দুজনকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। কী ব্যাপার বলতো?'

'কী করে বলব? বোধ হয় কাছে বসিয়ে গল্প টল্প করবেন। উনি আজকাল কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু কথা বলবার লোক পান না।'

‘তুমি একটু যত্ন টত্ন করলেই পার। বুড়ো মানুষ।’
অর্চনা হেসে বলল, ‘সে কি তুমি বলবে তবে করব? তুমি কি আমার দাদাশ্বশুর নাকি?’
‘তোমার মত একটি নাতবউ পেলে দাদাশ্বশুর হতে রাজি আছি।’
অর্চনা বলল, ‘বটে।’
প্লেটে মিষ্টিগুলি পড়েই আছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, ‘অর্চনা, মিষ্টিগুলি খেয়ে নাও। মিছামিছি নষ্ট হবে।’
‘নষ্ট হবে কেন। লোকজন আছে ওরা খাবে। কিন্তু খেলেই ভাল হত। তোমার জন্যে আনা।’
‘পাগল নাকি, অত কেউ খেতে পারে? ভাল কথা তুমি আমার জামার রসের দাগটা তুলে দিলে না?’
অর্চনা বলল, ‘আমার দায় পড়েছে। যিনি রস মাখিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁকে ডাকো।’
‘তিনি তো মাখিয়ে দিয়ে খালাস।’
‘তাহলে নিজেই তুলে নাও। তোমার কি হাত টাত কিছু নেই?’
তারপর অবশ্য অর্চনা ওর আঁচলের খুঁট জলে ভিজিয়ে আমার বুক পকেটের কাছ থেকে রসের দাগ তুলে দিল। তারপর মৃদু গঞ্জনার সুরে বলল, ‘নাও। তোমরা সবাই সমান। খাটিয়ে নিতে কেউ ছাড় না।’
এই গঞ্জনা অবশ্য গুঞ্জনের মত শোনাল। আমি ওর আদরটুকু উপভোগ করতে করতে ভাবলাম বউদি হয়ে না এলে অর্চনা কি এত ঘনিষ্ঠভাবে আমার কাছে আসত? ফিলসফি আমরা সবাই পড়তাম। কিন্তু ওকেই একমাত্র দার্শনিক মনে হত। কী গাম্ভীর্য আর একাকিত্ব নিয়েই না অর্চনা থাকত তখন। তারপর যে আলাপ হল তা নিতান্তই সাধারণ আলাপ। একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার সুযোগ হল আমাদের ফার্ম থেকে নিরঞ্জনবাবুর একখানি প্রবন্ধের বই ছাপা হওয়ার সময়। তখন আমি মাঝে মাঝে যেতাম। একবার ওর বাবার সঙ্গে ও আমাদের ফার্মে এসেছিল। দেখে গিয়েছিল আমি কত সামান্য কাজ করি। তা সত্ত্বেও আমি যখন ওদের বাড়িতে যেতাম ও আমার সঙ্গে বসে কথা বলত, চা টা দিত।

নিরঞ্জনবাবু বাড়িতে না থাকলেও এই আদর আপ্যায়নটুকু জুটত। তারপর আমি ঘটক হয়ে গেলাম। আর কিছু হবার ইচ্ছা কি আমার মনে কখনো ছিল? কক্ষনো না।

'আচ্ছা, নির্মলদা কেন আসছেন না অর্চনা?'

অর্চনা বলল, 'কী জানি, আমাকে তো কিছু বলে যায় নি।'

'আমাকে আসতে বলে নিজেই অনুপস্থিত।'

'সে হয়তো ভেবেছে সে উপস্থিত না থাকলেও তোমার আদর যত্নের কোন অভাব হবে না।'

বললাম, 'সে অভাব হচ্ছেও না। কিন্তু নির্মলদা থাকলে ভাল লাগত। সমস্ত বাড়ির মধ্যে ওঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়।'

অর্চনা মৃদুস্বরে বলল, 'শুধু কথাই বলতে পারে।'

ওপর থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি একটু কান খাড়া করে থেকে বললাম, 'ও কি।'

অর্চনা মৃদু হাসল, 'রাধা গোবিন্দের ঘরে আরতি হচ্ছে। আজ ঠাকুরমশাই একটু দেরি করে এসেছেন। নইলে এতক্ষণ আরতি শেষ হয়ে যায়।'

আমার মনে পড়ল রাধাগোবিন্দ মেসোমশাইদের গৃহবিগ্রহ। এই বিগ্রহের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

মেসোমশাই একদিন বলেছিলেন. 'আমার যা কিছু হয়েছে ওই গোবিন্দের কৃপায়।'

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু মেসোমশাই আমি আপনার ব্যবসায় বুদ্ধিকে, আপনার ক্ষমতাকে আরো বেশি বিশ্বাস করি।'

তিনি বলেছিলেন, 'ক্ষেপেছ? আমার মত বুদ্ধি আর ক্ষমতা অনেকেরই আছে। কিন্তু ভগবান মুখ তুলে না চাইলে, তিনি কৃপা না করলে এটুকু হত না তা আমি জানি।'

মেসোমশাইর এই ভগবৎ ভক্তির অংশীদার আমি হতে পারি নি। কিন্তু এই বিশ্বাস যে তাঁকে শক্তি জুগিয়েছে তা অনুভব করতে পারি। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় কখনো কখনো মেসোমশাইর মুখে যে অশান্তির ছায়া দেখতে পাই তা কি ঈশ্বরের

অনুগ্রহ না নিগ্রহ? দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে কোন চোখে দেখেন মেসোমশাই? কী ব্যাখ্যা দেন এই অশুভ শক্তির?

আমাদের বাড়িতে পূজা-আর্চা হয় না। শুধু মার একটি লক্ষ্মীর আসন আছে। পোড়ামাটির ছোট একটি লক্ষ্মীমূর্তি। মা নিত্য সেখানে ফুল জল দেন। আর রেকাবিতে করে দুখানা বাতাসা ভোগ। বিশেষ কোন উপলক্ষ থাকলে সন্দেশ। পুজোর সময় আমি থাকিনে। কিন্তু প্রসাদের সময় সকৌতুকে হাত পাতি, 'দাও মা, প্রসাদ দাও।'

মা বলেন, 'তোরা তো দেব-দেবী কিছু মানিসনে। তবে প্রসাদ কিসের?'

আমি বলি, 'আর কিছু না মানলেও, মাতৃদেবীকে তো মানি।'

মা বলেন, 'ঘোড়ার ডিম মানো। বিপদের সময় মানো, সম্পদের সময় মানো না। সব সুবিধাবাদী।'

আমাদের বাড়িতে যেটুকু অনুষ্ঠান হয় নিরঞ্জনবাবুর বাড়িতে তাও হয় না। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নন, তবে অপৌত্তলিক, আনুষ্ঠানিক কোন ধর্মাচরণে বিশ্বাস করেন না। মেয়েদের বেলায় কী হয় জানিনে, নিরঞ্জনবাবুকে অন্তত ওসব কিছু করতে দেখি নি। দেশ-বিদেশের লোকোত্তর পুরুষদের ছবি তাঁর ঘরে টাঙানো দেখেছি।

ধর্ম সম্বন্ধে মেসোমশাইর আমার আর নিরঞ্জনবাবুর মত, বিশ্বাস, আচার-আচরণ কত আলাদা। অথচ আমরা একই হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত।

অর্চনাকে বললাম, 'কোথায় আজকাল তোমাদের ঠাকুরঘর? ওপরে নাকি?' অর্চনা বলল, 'হ্যাঁ, ছাদের ওপরে একখানা নতুন ঘর করা হয়েছে। সেখানে রাধাগোবিন্দকে ওঁরা নিয়ে রেখেছেন। আগে নিচের ঘরেই ছিলেন। কিন্তু বাবা বললেন, ঠাকুরের ঘর ওপরেই থাকা উচিত।'

বললাম, 'চল তা হলে।'

অর্চনা বলল, 'ওখানে গেলে কিন্তু দেবতাকে প্রণাম করতে হবে, প্রসাদ নিতে হবে।'

হেসে বললাম, 'নেব, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। ভাল কথা, মেসোমশাইর সামনে তোমাকে কিন্তু আমি বউদি বলে ডাকাব। তুমি হেসো না কিন্তু।'

অর্চনা হাসিমুখে বলল, 'হাসব কেন। তাই বলে তোমাকে কিন্তু আমি ঠাকুরপো বলে ডাকতে পারব না।'

বললাম, 'বেশ তো সঞ্জীবদা বলবে।'

অর্চনা হেসে বলল, 'ঈস। খুব যে দাদা হবার সখ? তুমি কি আমার চেয়ে বয়সে বড?'

আমরা ওপরে উঠলাম। ঠাকুর ঘরের সমানে তখনো আরতি হচ্ছে। শ্বেত পাথরে গড়া রাধিকা মূর্তি, কালো পাথরের বংশীধারী কৃষ্ণ। রোগামত পৈতা গলায় একজন ব্রাহ্মণ পঞ্চপ্রদীপ হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করছেন।

মেসোমশাইর পরনে পট্টবস্ত্র। কোঁচার খুঁটটি গলায় তুলে দিয়েছেন। তিনি নিজের হাতে কাঁসর বাজাচ্ছেন। তার পাশে যুক্তকরে মাসিমা দাঁড়িয়েছেন। পরনে লালপেড়ে সাদা খোলের শাড়ী। একটু দূরে রত্না বউদি, ভারতী বউদি আর মঞ্জুলা দাঁড়িয়েছে।

মেসোমশাই আমাদের দেখে চোখের ইসারায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বললেন। অর্চনা সরে গিয়ে মেয়েদের পাশে দাঁড়াল। আমি আলাদা। এখানে সস্ত্রীক ধর্মাচণ করছেন শুধু মেসোমশাই।

পূজা আব আরতির পর প্রসাদ বিতরণ হল। শুধু পরিবারের লোকজনই নয়, ঝি চাকর দারোয়ান ড্রাইভাররাও প্রসাদ পেল। প্রসাদের মধ্যে কিছু শ্রেণীবিভেদ ছিল কিনা লক্ষ্য করি নি। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা আছে আমি তার সবটুকু গ্রহণ করতে পারলাম না। কিন্তু এর অংশবিশেষের মধ্যে যে দৃশ্যগত সৌন্দর্য আছে আমার রূপানুভূতিকে তা ছুঁয়ে গেল। দীপের আলোটুকু ভাল লাগল, ধূপের গন্ধটুকু ভাল লাগল, ধোঁয়াটুকুও। শ্বেত পাথরে গড়া রাধারাণীর মূর্তিটুকু বেশ সুন্দর। অমন চঞ্চলা অতি প্রগলভা ভারতী বউদি স্থির নির্বাকভাবে ওই মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখেও কি এখন একটু বিষাদের ছায়া লেগেছে না কি এ আমারই দৃষ্টিভ্রম? এই আধুনিক

শিক্ষিতা যৌবনবতী মেয়েরা কি এসব ধর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাস করেন ? না কি আমারই মত এঁরা শুধু দেখতে এসেছেন ?

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে মেসোমশাই মাসিমা নিচে দোতলার ঘরে ফিরে গেলেন। যাওয়ার সময় মেসোমশাই ডেকে গেলেন, 'সঞ্জীব, এসো। ছোট বউমা তুমিও এসো আমার ঘরে।'

ওঁরা চলে গেলে ভারতী বউদি মুখ টিপে হাসলেন, 'যাও দুই আসামী। এবার ডাক পড়েছে তোমাদের! দেখ গিয়ে কী হয়। নির্বাসন না কি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।'

বললাম, 'আমাদের উকিল হয়ে আপনিও চলুন। দেখুন যদি ছাড়িয়ে আনতে পারেন।'

ভারতী বউদি বললেন, 'উকিল হব কোন দুঃখে। আমি ব্যারিস্টার। আমার ফি বড় চড়া।'

'কত ?'

ভারতী বউদি বললেন, 'শুনে কি হবে। তুমি জুগিয়ে উঠতে পারবে না।'

বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে মঞ্জুলা চলুক আমাদের সঙ্গে। মঞ্জু, তোর কী হয়েছে বলতো। সেই থেকে মুখে ভার করেই আছিস।'

মঞ্জু বলল, 'কী আবার হবে।'

ভারতী বউদি বললেন, 'যা হয়েছে তা তুমি বুঝবে না সঞ্জীব।'

'বুঝিয়ে বললে বুঝব না কেন ?'

'তুমি একটি বোকারাম। সব কথা কি আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা যায় ? ইসারা ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। মঞ্জুর তিন বউদির স্বামীরা এগারটা হোক বারটা হোক এই রাতের মধ্যেই ফিরবে। কিন্তু মঞ্জুর আজ বিরহ-রজনী। ছোট নন্দাই দু-তিন দিনের মধ্যে ফিরছে না।'

বললাম, 'সলিল গেছে কোথায় ?'

ভারতী বউদি বললেন, 'ময়ুরভঞ্জে। সেখানে ডিলারদের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম আছে। মঞ্জু ভাবছে বাবার হৃদয় কি কঠিন। পাঠালেই যদি পূর্ণিমা রজনীর পরে জামাইকে বাইরে পাঠালেই হত।'

বললাম, 'আজ পূর্ণিমা নাকি ?'

'কেন আকাশের দিকে তাকাওনি ?'
বললাম, 'তাকাবার মত ফুরসৎ আর পেলাম কোথায় ?'
ভাবতী বউদি বললেন, 'ওরে বাবা ! খুব যে কথা ফুটছে ।'
মেসোমশাইর ঘরের দিকে যেতে যেতে অর্চনার কাছে শুনলাম ময়ূরভঞ্জে আদিত্য এণ্ড সন্সের যে ছোট একটি অফিস আছে মঞ্জুলার স্বামী সলিলকে তার ম্যানেজার করে পাঠানো হবে। মঞ্জুলাও সেখানে যাবে। কিন্তু বাবা তাকে কলকাতার বাইরে সুদূর মফঃস্বলে পাঠাচ্ছেন বলে মঞ্জু খুশি নয়। কলকাতার এত বড় কারখানায় কি ছোট জামাইয়ের একটু জায়গা হত না ? কিন্তু মেসোমশাই জামাইযের রাজনৈতিক মতামতকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেন। লেবারের সঙ্গে তার বড় বেশি মাখামাখি। মঞ্জু স্বামীকে পরামর্শ দিয়েছে অন্য কাজ খুঁজে নিতে। এই নিয়ে বাপ মেয়ের মধ্যে মন কষাকষি চলছে।

'এসো সঞ্জীব, এসো বউমা।'
সস্নেহে আমাদের দু'জনকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিলেন মেসোমশাই। এবার বড় একখানা ইজিচেয়ারে তিনি দীর্ঘ দেহকে এলিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরঘরের সামনে যে-বেশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সেই বেশ ছেড়ে ফেলেছেন। এখন তাঁর পরণে সাধারণ ধুতি। ফতুয়ার বদলে গায়ে একটা গেঞ্জি। একটু যেন ক্লান্ত লাগছে মেসোমশাইকে। তবু তিনি আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দাঁড়িযে কেন বোসো তোমরা। ওখানে দুটো মোড়া আছে। অর্চনা মোড়া দুটো নিয়ে সামনে এসে বোসো।' তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'আমি মাঝে মাঝে ওর নাম ধরেও ডাকি। তাই বলে তুমি যেন তা ডাকতে যেয়ো না। মোটেই ভাল শোনাবে না। সেদিন আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। হাল আমলের বউদি দেওযের কনভারসেশনের একটু যবে কানে এল। তারা পরস্পরকে তুই বলে ডাকছে। আমি তো অবাক। মেয়েরাই মেযেদের তুই বলে। ননদ ভাজে ওটা চলতে পারে। কিন্তু দেওর ভাজে কেন চলবে। যে কোন ভাষায় মেয়েদের ডায়ালেকট্ আলাদা, ছেলেদের

ডায়ালেকট্ আলাদা। ছেলেরা যদি সংস্কৃত বলে মেয়েরা প্রাকৃত।'

অর্চনা কারুকার্যে খচিত দামি চামড়ার দুটি সুদৃশ্য মোড়া এনে দু'পাশে রাখল।

মেসোমশাই বললেন, 'বোসো, দু'জনে পাশাপাশি বোসো। দুই এক্স ক্লাসমেট। তোমাদের দেখে আজ আমার ফের ক্লাস নেওয়ার লোভ হচ্ছে। এক সময় মাস্টারি তো করেছি। টিউশনিও করেছি। একটি ছাত্রকে পড়াতাম বার টাকা মাইনেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার বোনটিও আসত। সেটি ফাউ।'

অর্চনা বলল, 'বাবা, আমি তাহলে আপানার ফাউ?'

মেসোমশাই বললেন, 'তাই কি হয় মা? তুমি হলে ঘরের বউ, কুললক্ষ্মী। ভাল কথা, নিমু বোধ হয় এখনো ফেরে নি?'

অর্চনা বলল, 'না বাবা।'

মেসোমশাইর মুখে একটু যেন ছায়া পড়ল।

'ওরা বোধ হয় কেউ ফেরে নি?'

অর্চনা বলল, 'না।'

মেসোমশাই বললেন, 'দেখ কাণ্ড। অথচ ওরা সবাই জানে সঞ্জীব আজ রাত্রে আমাদের এখানে খাবে। ওকে সেজন্যে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে।'

বললাম, 'তাতে কী হয়েছে মেসোমশাই। আমার সঙ্গে তো কোন ফর্ম্যালিটির প্রশ্ন নেই। মাসিমা রয়েছেন,' আমি অর্চনার দিকে একটু তাকিয়ে বললাম, 'বউদিরা রয়েছেন। এখানে কি আমার আদর-যত্নের অভাব হবে?'

মেসোমশাই বললেন, 'তা হবে না। তবু ওদের থাকা উচিত ছিল। আজ একটু আগে আগেই ওদের আসা উচিত ছিল। কিন্তু রাত দুপুরের আগে ওদের কারো আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না। যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। আমার ছেলেরা হয়েছে সেই সংযমীর দল। আমার কাছে যা রাত্রি ওদের কাছে তা দিন। একবার বাইরে বেরোলে ওরা বাড়ির কথা ভুলে যায়। আমার ছোট বউমাও বাইরে বেরোবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

মেসোমশাই আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

অর্চনা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'বাবা, আমি তো আপনাকে সেকথা বলি নি।'
মেসোমশাই তেমনি হাসলেন, 'বলনি। কিন্তু আমি অন্তর্যামী কি না, তাই কোন কোন ব্যাপারে আমি মনের কথা শুনতে পাই। যেমন আমার কারখানার বয় কি কোন লেবারারের দিকে তাকিয়ে আমি টের পাই ও কি ভাবছে। আমার ছোট বউমা অবশ্য ছেলেদের মত রাতের চৌরঙ্গী দেখতে চায় না, দিনের ডালহৌসীই দেখতে চায়।'
কথাটা যখন মেসোমশাই নিজেই তুললেন, তখন আর এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। আমি মোড়ার ওপরে টান হয়ে বসে অর্চনার পক্ষ সমর্থনের জন্যে তৈরি হলাম।
'আপনি ঠিকই বুঝেছেন মেসোমশাই। ছোট বউদির একটা চাকরি-বাকরি করবার খুব সাধ।'
মেসোমশাই বললেন, সাধ না সখ। সৌখীন মজদুরী। কেন ওর অভাব কিসের? আমি তো প্রত্যেক বউকে আলাদা অ্যালাউন্স দিই।'
'টাকাটাই কি বড় কথা মেসোমশাই? ছোট বউদি লেখাপড়া শিখেছেন। অথচ তার কোন চর্চা হচ্ছে না। এইটাই ওঁর মনে সবচেয়ে বড় দুঃখ।'
মেসোমশাই একটু হাসলেন, 'আমাদের বেশির ভাগ দুঃখই নিজেদের কারখানার প্রোডাক্ট। আসলে এ দুঃখের কোন কারণ নেই সঞ্জীব। ছোট বউমার আগের দুই জা রত্না আর ভারতী ওরাও লেখাপড়া জানা মেয়ে। ওরাও তো এ বাড়িতে বেশ আছে। চাকরি-বাকরির জন্যে ছটফট করছে না। ওদেরও একজন গ্র্যাজুয়েট আর একজন অনার্স গ্রাজুয়েট। লেখাপড়াটা কি শুধু অর্থকরী? চাকরি করবার জন্যে?'
হেসে বললাম, 'কিন্তু চাকরিও তো দরকার। অন্নবস্ত্রের সমস্যা সবচেয়ে আগে।'
মেসোমশাই এবার সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'হাজারবার। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সেই সমস্যায় জর্জর। সেই সমস্যার সমাধান আমার মত দু-চারজন ক্ষুদে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টের

হাতে নয়। এটা একটা ন্যাশনাল প্রবলেম। ন্যাশনাল লেভেলেই এর সমাধানের চেষ্টা দেখতে হবে। তবু ক্ষুদ্রশক্তি মত আমি আমার কাজ করেছি তুমি তা জানো। আমার কারখানা আমার অফিস, আমার ব্রাঞ্চ অফিসগুলি সব ওভারস্টাফড। যারা আমার ক্ষতি না করে, আমার গলায় ছুরি না ধরে তাদের কাউকে আমি ছাঁটাই করিনে। আমি ভাবি, আহা ওদের রুজিরোজগার বন্ধ করে লাভ কি। আমার না হয় দু পয়সা কমই হল।'

নাতনীকে কোলে নিয়ে মাসিমা পাশে এসে দাঁড়ালেন। অমলদার মেয়ে। বেশ সুন্দব হয়েছে দেখতে। ওর মায়ের মতই সুন্দর।।

আমি বললাম, 'বেশ শান্ত হয়েছে, মেয়ে।'

মাসীমা বললেন, 'শান্ত না আরো কিছু। দুষ্টুর একশেষ। এতক্ষণ কী জ্বালানোটাই না জ্বালাচ্ছিল।' মাসিমা মেসোমশাইর দিকে একটু হেসে তাকালেন, 'আর জ্বালাচ্ছ তুমি। সন্ধ্যা থেকে সেই যে বকবক করছ।'

মেসোমশাই হেসে বললেন, 'ওটা বুঝি তোমারই মনোপলি।'

মাসীমা প্রসঙ্গ পাল্টালেন, 'তোমার খাওয়ার সময় হল না? এবার খেয়ে নাও।'

মেসোমশাই বললেন, 'আমি সঞ্জীবদের সঙ্গে খাব।'

মাসীমা বললেন, 'ওদের খেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এখনো ছেলেরা কেউ ফেরেনি। ওরা সব একসঙ্গে বসে খাবে। তুমি খেয়ে নাও। তোমার তো বেশি রাত্রে খাওয়ার অভ্যাস নেই। খেলে হজম হয় না।'

মেসোমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বলছি যে এখন আমি কিছু খাব না। যদি পার তিন কাপ কফি করে দাও আমাদের তিনজনের জন্যে।'

অর্চনা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, তুমি বোসো আমি করে আনছি।'

মাসীমা বসলেন না। নাত্‌নীকে নিয়ে ফের ঘর থেকে চলে গেলেন। একটু বাদে ট্রেতে করে দু' কাপ কফি আর একটি গ্লাস নিয়ে এল অর্চনা। মেসোমশাইর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'মা কিছুতেই

আপনার জন্যে কফি করতে দিলেন না। বললেন, এইসময় কফি খেলে আপনার খিদে মরে যাবে। তাছাড়া রাত্রে ঘুমোতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি একটু ওভালটিন খান।'

মেসোমশাই খানিকটা অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই দাও।'

একটি সেণ্টার টেবিলের ওপর ট্রেটি রেখে অর্চনা গ্লাসটা মেসোমশাইর হাতে তুলে দিল।

মেসোমশাই পুত্রবধূর এইটুকু সেবায় বেশ খুশি হলেন। তিনি প্রসন্ন কোমল সুরে বললেন, 'এই তো তোমার কাজ অর্চনা। এই তো তোমার যথার্থ ক্ষেত্র। আমাদের কাজে উৎসাহ দেওয়া প্রেরণা জোগানো এটা কি কম কাজ? এর চেয়ে তুমি কোন স্কুল কলেজে মাষ্টারি করলে, কি অফিসে বসে কলম পিষলে, কি ধর না হয় তুমি কোন অফিসারই হলে, এর চেয়ে সেটা কি বেশি গৌরবের কাজ হবে?'

অর্চনা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। মেসোমশাইর যুক্তি যে তার কাছে একটুও গ্রহণযোগ্য হয়নি আমি তার মৃদু হাসি দেখে তা বুঝতে পরলাম।

মেসোমশাইও তা বুঝলেন।

তিনি একটু থেমে বললেন, 'বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ের চাকরির দরকার আছে। আমার কাছে যারা আসে আমি তাদের বলি তোমরা শুধু মুখে শ্রমের মর্যাদার কথা আউরে যেয়ো না। কাজ করে তা দেখাও। করবে না চুরি-ডাকাতি আর করবে না ভিক্ষে। পরিবার প্রতিপালনের জন্যে আর সব কাজ মানুষ করতে পারে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের কাজের দরকার আছে। কিন্তু তোমার তো সেই ধরনের কোন দরকার নেই মা। তবু তুমি যদি জেদ করে কোন কাজ নাও তুমি আর একটি লোককে হয়তো একটি গোটা পরিবারকে মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত করবে।'

অর্চনা একথারও কোন জবাব দিল না। আমি বললাম, 'টাকার ওর দরকার নেই। কিন্তু ওর আত্মবিকাশের পক্ষেও তো কিছু কাজ চাই।'

মেসোমশাই একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'সেই কাজ কি স্কুল

কলেজের রুটিন বাঁধা পড়ানো কি অফিসে বসে কলম পেষা? আত্মোন্নতির কি আর কোন রাস্তা নেই? ও পথে শুধু টাকা রোজগারই হয়। আত্মবিকাশ কি জ্ঞানের অনুশীলন হয় না। আমার অন্য দুই বউমার লেখাপড়া নিয়ে বেশি মাথা ব্যাথা নেই। তারা সিনেমা দেখে, সস্তা সিনেমার কাগজ পড়ে। তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির দৌড় ঐ পর্যন্ত। বিয়ের পরেও লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক যা একটু অর্চনারই আছে। ভাল কথা। এটা একটা সদগুণ। আমার বহুদিনের ইচ্ছা বাড়িতে একটা ভাল লাইব্রেরী করব। তুমি সেই লাইব্রেরী গড়ে তোল।' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই এটা একটা ভাল কাজ। হোম লাইব্রেরী আপনার থাকা উচিৎ।'

মেসোমশাই বললেন, 'আমার ছেলেদের ওদিকে রুচি নেই। ওরা সব টেকনিক্যাল লাইনে পড়াশুনো করেছে। টেকনিসিয়ানের দল। সেইজন্যে আমি বউদের বেছে বেছে এনেছি যারা আর্টসের ছাত্রী। ভেবেছিলাম এতে একটা ভারসাম্য থাকবে। ওদের উদ্যোগে এ বাড়িতে শিল্প সাহিত্যের চর্চা বাড়বে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সঞ্জীব আমি হতাশ হয়েছি। পরীক্ষায় পাশ করাটাই সব নয়। অ্যাকাডেমিক পড়াশুনোটাই সব নয়। কিন্তু অর্চনার ওপর আমি এখনো ভরসা রাখি। ও ইচ্ছা করলে সব পারে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

অর্চনাও কোন কথা বলল না।

মেসোমশাই একটু হাসলেন, 'তাছাড়া আমার আরো দু একটা প্ল্যান আছে। আমার কারখানার লেবারারদের জন্যে আমি একটা রিক্রিয়েশন ক্লাব করে দেব। সেখানেও ওদের জন্যে একটা লাইব্রেরী থাকবে, রিডিং রুম থাকবে। রেডিও থাকবে। নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। ওদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ফ্রী প্রাইমারী স্কুল খুলবারও ইচ্ছা আছে। যদি আয়ুতে বেড় পাই আরো কিছু করে যাব। অর্চনা হবে আমার কালচারাল ডিপার্টমেণ্টের সর্বেসর্বা। এর জন্যে কিন্তু মাইনে পাবে না মা।' হেসে বললাম, 'সেকি, ছোট বউদিকে একেবারে বিনা মাইনেতে খাটিয়ে নেবেন?'

মেসোমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, এটা হবে ওর লাভস্ লেবার। অর্চনা

মাঝে মাঝে জনকল্যাণের কাজের কথাও বলে। আপনজনের কল্যাণও জনকল্যাণ।'

পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। মাসীমা এসে বললেন, 'তোমার ফোন এসেছে। রিমাউন্ট রোড থেকে মিঃ তরফদার ডাকছেন তোমাকে।'

মেসোমশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা তোমরা যাও গল্পটল্প কর গিয়ে। অনেকক্ষণ তোমাদের আটকে রেখেছি।'

মেসোমশাইর ব্যস্ততা দেখে মনে হল ফোনটা জরুরী এবং হয়তো ও'র ব্যবসা সংক্রান্ত।

মেসোমশাইর ঘর থেকে বেরোতেই ভারতী বউদির সঙ্গে দেখা। তিনি হেসে বললেন, 'কী রায় বেরোল? ফাঁসি না দ্বীপান্তর? আজকাল তো আবার দ্বীপান্তর নেই। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড? সেটা আরো কঠিন শাস্তি। কী বলিস অর্চনা।'

অর্চনা বলল, 'কী জানি। তুমি কি এতক্ষণ আড়ি পেতেছিলে না কি মেজদি?'

ভারতী বউদি বললেন, 'ওই তো আমার কাজ। আড়ি পাতা আর ফাঁদ পাতা। চল এবার আমার ঘরে চল।'

ভারতী বউদি আমার হাত ধরলেন।

হেসে বললাম, 'এখন আর কোন ঘরেই যাচ্ছি না বউদি। এবার মনকে বলছি, মন চল নিজ নিকেতনে।'

'ওরে বাবা। সবে তো কলির সন্ধ্যা। এখনি এত বৈরাগ্য। নিজ নিকেতনে আজ তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে?'

'সারা রাত আজ কয়েদ করে রাখবেন নাকি? মতলব তো ভাল নয়।'

অর্চনা বলল, 'সারা রাত না হোক, তুমি এক্ষুণি কী করে যাবে। ও'রা কেউ এলেন না। তোমার খাওয়া দাওয়া কিছু হল না।'

বললাম, 'খাওয়া দাওয়া যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। এবার পালাই।'

ভারতী বউদি বললেন, 'কন, কার ভয়ে পালাবে?'

'কার ভয়ে আবার? বাড়ির সবাই চিন্তা করবেন।'

ভারতী বউদি বললেন, 'তুমি তো বলেই এসেছ। তাছাড়া চিন্তা করবার আসল লোকটি তো ঘরে আসেনি যে অর্চনার মত চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে মরবে।'

অর্চনা প্রতিবাদ করে বলল, 'কী যে বাজে কথা বলছ মেজদি। আমি শুকিয়ে মরব কোন দুঃখে। সঞ্জীব যদি বেশি দেরি না করতে পারে তাহলে এক কাজ করা যাক। ঠাকুরদের রান্না বোধহয় নেমে গেছে। বড়দিও তো ওখানেই আছে। চল, সঞ্জীবকে আমরা খাইয়ে দিই। তারপর ও যেতে হয় চলে যাবে।'

ভারতী বউদি বললেন, 'না ভাই, আমার অত বুকের পাটা নেই। কর্তারা কেউ এলেন না। আর ওকে আমরা খাইয়ে দাইয়ে খিড়কি দোর দিয়ে পার করে দেব অত বড় দুঃসাহস—'

অর্চনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী যে বাজে বকছ সেই থেকে। তোমার ওই এক ধরনের রসিকতা ভাল লাগে না সব সময়।'

কথায় কথায় আমরা তিনতলায় উঠে ভারতী বউদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

ভারতী বউদি বললেন, 'এসো ঘরে এসো। গরীবের কুটিরে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাও।'

অর্চনা বলল, 'তোমরা তাহলে বসে বসে গল্প কর। আমি যাই।'

ভারতী বউদি বললেন, 'ওরে হিংসুটি। তুই এক ঘণ্টা ওকে নিজের ঘরে বন্দী করে রেখে মুখোমুখি বসে গল্প করেছিস। আর আমি পাঁচ মিনিটের জন্যে ওকে ডাকছি, তাই তোর সহ্য হচ্ছে না।'

অর্চনা এবার হেসে ফেলল। হাসলে ওর একটি গালে টোল পড়ে। দাঁতের গড়ন ভারি সুন্দর। ওর হাসির মধ্যে ভারতী বউদির মত লাস্য নেই, সব মিলিয়ে কিসের যেন একটু স্নিগ্ধ মধুর লাবণ্য আছে।

অর্চনা হেসে বলল, 'মেজদি, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এবার ভাই সত্যি সত্যি হার মানছি।'

ভারতী বউদি বললেন, 'হার মানলি তো? সঞ্জীব সাক্ষী। এরপর ফের যদি সমানে সমানে যুঝতে আসিস রক্ষে রাখব না। কিন্তু

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার আগে তোকে এক কাজ করতে হবে।'
'কী কাজ ?'
বড়দির ঘরে ফোন আছে। সেখান থেকে সঞ্জীবদের বাড়িতে একটা ফোন করে দিয়ে আয় আজ রাত্রে ওর বাড়ি ফেরা হবে না। আজ ও আমাদের এখানেই থাকবে।'
আমি প্রতিবাদ কবে বললাম, 'না না না, সে কি।'
অর্চনা একটু দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল, 'মেজদি, যদি থাকতে না চায় জোর জবরদস্তি করে লাভ কি।'
ভারতী বৌদি বললেন, 'তুই কিচ্ছু জানিস নে। মাঝে মাঝে জবর-দস্তি চালাতে হয়। নইলে লোকসানের অঙ্ক বাড়ে।'
ওঁর পিছনে পিছনে আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। পরিপাটি করে সাজানো বউদির ঘর। অর্চনার চেয়েও এ ঘরের আসবাবপত্র দামি। খাট আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বুকশেল্ফ, জিনিসগুলি অবশ্য সেই একই। কিন্তু যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে রুচি আর কলা নৈপুণ্যের ছাপ আছে। রং ভালবাসেন ভারতী বউদি। জানালা দরজার পর্দায় বিছানার পর্দায় চাদবে কুশন ঢাকনিতে সেই বর্ণাঢ্যতা। হলুদ আর সবুজ রংই বোধহয় ভারতী বউদির প্রিয় রং। দেয়ালে ওঁর আর শ্যামলদার যুগল ফটো। ইদানীংকালের ফটো নয়। বিয়ের কিছুদিন পরেই বোধহয় এই ফটো তোলা হয়েছিল। নামকরা স্টুডিওর কুশলী ফটোগ্রাফার এই ফটো তুলে দিয়েছেন। শ্যামলদা সুপুরুষ নন। অন্য ভাইদের তুলনায় ওঁর চেহারাটা একটু যেন চোয়াড়ে চোয়াড়ে। রংও ময়লা। কিন্তু চোখ দুটি ভারি তীক্ষ্ন। চাপা ঠোঁটে যেন দৃঢ় সংকল্পের ছাপ আছে।
পশ্চিমদিকের দেয়ালে নীল ঢাকনিতে ঢাকা একটি গীটার ঝুলানো রয়েছে। এর আগে এসে দু' একবার বাজাতে দেখেছি ভারতী বউদিকে।
বললাম, 'ভালই হল বউদি। আজ আপনার বাজনা শুনব। বেশ সময় কাটবে।'
ভারতী বউদি চট করে কথাটা ধরে ফেললেন। 'ঈস, সময় কাটাবার

জন্যে বাজনা। আমার বাজনা কি এতই সস্তা।'

তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললাম, 'ভুল হয়েছে বউদি। আমি বলতে চাইছিলাম চিত্তবিনোদন। ঠিক তাও নয়, স্বর্গীয় আনন্দ লাভ।'

'বটে! চাটুকার চূড়ামণি আমাকে একেবারে স্বর্গে তুলে দিলে।'

বললাম, 'সত্যি বলছি বউদি, একটু বাজান না। আমার যাওয়াটা যখন এমন করে বন্ধই করে দিলেন তখন কিছু গান-বাজনা শুনি।'

আমরা দুজনে দুটি নিচু চেয়ারে বসে কথা বলছিলাম। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আমাদের ছায়া পড়েছিল। বউদি মাঝে মাঝে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন।

একবার বললাম, 'অত কি দেখছেন।'

ভারতী বউদি হেসে বললেন, 'দেখছিলাম আমাদের মানিয়েছে কিনা!'

আমি প্রথমে একটু লজ্জিত হলাম। তারপর সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, 'কী দেখলেন। মানিয়েছে নিশ্চয়ই।'

ভারতী বউদি বললেন, 'ঈস দেমাক দেখ। যা দাঁড়কাকের মত চেহারা একখানা। ময়ূরপুচ্ছেও যদি ঢাকা পড়ত।'

আমি সুপুরুষ নই, তবে দাঁড়কাকও নই তা আমি জানি। তাহলে ভারতী বউদির মত অমন রূপবতী রসময়ী মহিলা আমাকে এতখানি আদর যত্ন করতেন না। আমাকে চটাবার জন্যেই যে উনি এমন খোঁটা দিচ্ছেন তা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

ভারতী বউদি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেন না। শীতল মলম লাগালেন। হেসে বললেন, 'অমনি মুখখানা কালো হয়ে গেল তো? তবে শোন। শুধু তুমি কেন ভাই, কাউকেই মানায় না। তোমার ওই চেয়ারে বসে কতজনই তো এসে গল্প করে গেল। কত মধুর সম্পর্কের দেওর, কত বন্ধু, কত নন্দাই। এই রক্ষণশীল যক্ষপুরীতেও আমি তাদের গেটপাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তবু ভরিল না চিত্ত।'

এ প্রসঙ্গ চলতে দেওয়া বিবেচনা সঙ্গত নয়। আমি তাই আগের সূত্র ধরে বললাম, 'বউদি, আপনার বাজনার কথা হচ্ছিল। শোনান না একটু।

ভারতী বউদি হাসলেন, 'গীটারের কথা বলছ? ওটা একটা ফার্নিচার হিসাবে ঘরে রয়েছে। অনেক দিন বাজাইনে। বাজানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। মন বসে না। তোমাদের মত যদি মন লাগিয়ে কাজ করতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই একদিকের না একদিকের দিকপাল হতামই। কিন্তু ধরি আর ছাড়ি, ধরি আর ছাড়ি। কোন কিছুকেই শক্ত মুঠিতে ধরে রাখতে পারিনে। ধরে রাখতে চাইনে। সোনা মুঠি বলে যা ধরি মুঠি খুলে দেখি কোন এক ম্যাজিকে তা ছাই মুঠি হয়ে গেছে। এখন আমার কিসে মন লেগেছে জানো?'

'কিসে?'

ভারতী বউদি হেসে বললেন, 'আমি একখানা বই লিখছি। সে এক মহাগ্রন্থ হবে।'

বললাম, 'বলেন কি, আপনার ও বিদ্যাও জানা আছে নাকি?'

'কোন বিদ্যা জানা নেই তাই বল? অল্প বয়স থেকে চৌষট্টি কলার মধ্যে অন্তত চারটি বড় বড় কলায় আমি মকস করেছিলাম। লেখা, ছবি আঁকা, গান আর বাজনা। রাঁধা আর চুল বাঁধার মত মাইনর আর্টসগুলির কথা ছেড়েই দিলাম।'

হেসে বললাম, 'আমি পেটুক নই বউদি। তবু রন্ধনবিদ্যাকে আমি মোটেই গৌণ শিল্প বলে মনে করিনে।'

ভারতী বউদি বললেন. 'তাই নাকি, আচ্ছা তোমাকে আমি একটি পদ রেঁধে খাওয়াব।'

বললাম, 'আপনার লেখার কথা হচ্ছিল। কী লিখছেন বউদি? ডায়েরি?'

'দূর? ডায়েরি লিখব কোন দুঃখে? ডায়েরিতে সব কথা লিখে রাখব আর তোমার দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে সব পড়বে। আমাকে কি অতই বোকা ভেবেছ?'

হেসে বললাম, 'স্বামীর সম্বন্ধে আপনার ধারণা তো খুব চমৎকার। পড়তে না দিলে শ্যামলদা আপনার ডায়েরি কেন পড়তে যাবেন?'

'নিজে ডায়েরি লেখার চেয়ে পরের ডায়েরি লুকিয়ে পড়ায় আরো মজা। তোমার শ্যামলদাও তো ভয়ে ডায়েরি রাখেন না। পাছে আমি পড়ে ফেলি। নইলে তোমার শ্যামলদারও গোপন কথা কিছু

নেই নাকি ?'

হেসে বললাম, 'ওঁর সিক্রেসি তো সব পলিটিক্যাল সিক্রেসি। তা যদি আপনি জেনেও ফেলেন নিশ্চয়ই সযত্নে আয়রণ সেফে রেখে দেবেন।'

ভারতী বউদি বললেন, 'দায় পড়েছে। ওঁর রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই, এত চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই আমার কোন আকর্ষণই জাগল না। তোমার দাদার রাগ তো সেই জন্যেই। তিনি চান আমি তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী হই। তাঁর মতই বাইরে বাইরে কাজ করি। পার্টি অফিসে যাই, বক্তৃতা দিই, পাম্পলেট লিখি। ইলেকসনের সময় নিজেদের দলের ক্যাণ্ডিডেটের পক্ষে দিন-রাত খাটি। কিন্তু আমি তা পারিনি।'

বললাম, 'আপনি চাইলেও পারতেন না। মেসোমশাই বাধা দিতেন।'

'তার বাধায় কিছু এসে যেতো না। তোমার দাদা আমাকে নিয়ে আলাদা বাসা করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু আমিই যেতে রাজী হইনি। ওঁর সঙ্গে গিয়ে আলাদা বাড়িতে বাস করাও যা, পার্টি অফিসে দিনরাত কাটানোও তাই। আমি তা পারব না। তার চেয়ে বেশ আছি।'

বেশ থাকবার নমুনা তো দেখলাম।

প্রসঙ্গটা আর বাড়তে না দিয়ে আমি বললাম, 'বউদি আপনি ডায়েরি লেখেন না বললেন, তা হলে কি লেখেন, আত্মজীবনী ?'

ভারতী বউদি বললেন, 'আচ্ছা পণ্ডিত। ওই একই তো কথা হলো, রোজ একটু একটু করে নিজের জীবনের কথা না লিখে পুরো জীবনটাকে আগাগোড়া লিখে যাওয়া। তাছাড়া আত্মজীবনী লেখে লোকে শেষ বয়সে। আমার কি শেষের দিনে এসে হাজির হয়েছে ? আত্মজীবনী লিখব কোন দুঃখে ?

হেসে বললাম, 'আত্মজীবনী লেখায় শুধু বুঝি দুঃখই আছে সুখ নেই ? আমি যদি লিখতে পারতাম আর সেই লেখা বিক্রি করার কোন প্রশ্নই না থাকত তাহলে নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা লিখতাম না।'

বউদি বললেন, 'বোকাচণ্ডী, তুমি যা লিখবে তাই তো তোমার নিজের কথা। পরের জীবনই লেখ আর নিজের জীবনীই লেখ।'

'তাহলে আপনি কী লিখছেন!'

'উপন্যাস। লিখলামই যদি তাহলে গলি-ঘুঁজিতে হাঁটাহাঁটি করে কী হবে। একেবারে রয়াল রোড ধরে চলাই ভাল। উপন্যাস শেষ হলে দেব তোমার হাতে। ছাপাবে তোমাদের পাবলিশিং ফার্ম থেকে?'

কবি যশঃপ্রার্থিনী দু'একজন মহিলার কথা আমার মনে পড়ল। আমি তাই সতর্ক হয়ে বললাম, 'বউদি ছাপাবার কর্তা তো আমি নই। আমার ওপর দু'-তিনজন মনিব আছেন। আপনি লেখা শেষ করুন তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।'

ভারতী বউদি বললেন, 'এই শেষ করাটাই সমস্যা। ওয়েল বিগান ইজ হাফ্ ডান, কিন্তু এই অর্ধেক পর্যন্তই হয়। সব ভাল যার শেষ ভাল।'

'মেজ বউদি!'

বাইরে পর্দার আড়ালে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হল মঞ্জুলার গলা।

ভারতী বউদি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। বসে বসেই বললেন, 'আয় ভিতরে আয়। দোর তো বন্ধ নেই মঞ্জু, খোলাই আছে। পর্দা সরিয়ে সোজা ঢুকে পড়। সঞ্জীব তো আর তার বান্ধবীর ঘরে নেই। বউদির সঙ্গে বসে কথা বলছে। তোর অত গলা খাঁকারি দেওয়ার কী হয়েছে।'

তাঁর গলায় আবার সেই চটুলতা ফুটে উঠল।

মঞ্জুলা ঘরে ঢুকে বলল, 'বাঃ রে, আমি গলা খাঁকারি দিলাম কোথায়, বউদি বলে ডেকেছি তাতেই দোষ। এ যে ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাইনে অনেকটা সেইরকমের ব্যাপার। তাই না সঞ্জীবদা?'

জবাব না দিয়ে আমি মৃদু হাসলাম।

মঞ্জুলা বলল, 'আমাকে বড় বউদি পাঠিয়ে দিলেন। বাবা একসঙ্গে খাবেন বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অথচ দাদারা তো এখনও কেউ

ফেরেনি। মাত্র সাড়ে ন'টা, এত সকালে কেউ ওরা ফেরে না। অত বড় বড় ছেলে। এখনো কি স্কুলের মত ওদের তাড়না করা যায়? বাবা সে কথা বুঝতে চান না। তুমি এখন খাবে নাকি সঞ্জীবদা?'

আমি একটু ইতস্তত করলাম। মেসোমশাইকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। কোন কোন ব্যাপারে মতের বৈষম্য থাকলেও ওঁকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তাই বলে ওঁর সঙ্গে একা একা খেতে আমার যেন মন সরল না।

আমি ভারতী বউদির দিকে তাকালাম, 'আপনারা খাবেন নাকি এখন?'

ভারতী বউদি বললেন, 'ওরে বাবা। পতির আগে সতীদের খাওয়া নিষেধ। তুমি শুধু মঞ্জুলাকে সঙ্গে পেতে পার। আশা করা যায় ময়ূরভঞ্জে বসে ময়ূর ভাজা দিয়ে ওর স্বামী এতক্ষণে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে থাক। দাদারা ফিরে আসুন, এক সাথেই খাব। মেসোমশাই আবার কিছু ভাববেন নাতো?'

মঞ্জুলা বলল, 'তা নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। আমরা ম্যানেজ করে নেব।'

একটু বাদে মঞ্জুলা ফিরে এসে বলল, 'বাবা বেশি কিছু খেলেন না। ফল আর মিষ্টি খেয়ে শুয়ে পড়লেন।'

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'এই রে উনি রাগ করলে না তো?'

মঞ্জুলা বলল, 'না না, রাগ করবেন কেন? আসলে বেশির ভাগ দিনই বাবা রাত্রে খান না। খেলে হজম হয় না। উনি খেতে চাইলেও মা খেতে দেন না। মা বলেন ও দুষ্টু ক্ষিদে। বাবা মার কাছে যত জব্দ তত আর কারো কাছে নয়।'

আমি হেসে বললাম, 'এ বাড়ির বউরাও কি এ ব্যাপারে শাশুড়ীর কাছে শিক্ষা নিচ্ছে?'

মঞ্জুলা বলল, 'সে কথা বউদের জিজ্ঞাসা কর সঞ্জীবদা। আমি কী করে বলব?'

ভারতী বউদি কৃত্রিম ক্ষোভের ভঙ্গি করে বললেন. 'সেই শিক্ষাই যদি নিতে পারতাম তাহলে আর কথা ছিল কী।'

খাওয়াটা তো এড়ানো গেল। এখন কী করা যায়। এবার সত্যিই আমি একটু বোরড ফীল করতে শুরু করেছি। মেয়েদের সান্নিধ্য আমার ভালই লাগে। তবু তারও একটা সীমা আছে। অর্চনাবই বা কী আক্কেল। মেজ বউদির সঙ্গে আমাকে ভিড়িয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে। নাকি শুয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে? কে জানে। অথচ আমি তো ওর নিমন্ত্রণেই আসলাম এখানে অব্দি।

আমি এক সময় বললাম, 'ওরা সব কোথায় মেজ বউদি?'

ভারতী বউদি বললেন, 'কারা? অর্চনারা? তোমার বুঝি একজনকে নিয়ে মন উঠছে না? সবাইকে চাই। কী করবে সবাইকে নিয়ে?'

'কী আর কবব? দাদাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আপনাদের সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যেত। দেখিয়ে দিতাম আমরাও নিশাচর হতে পারি।'

'ওরে বাবা তোমার সাহস তো কম নয়।'

বললাম, 'নাইট শোয়ে একটা সিনেমা-টিনেমা দেখে আসা যেত। কিন্তু তারও তো সময় চলে গেছে।'

ভারতী বউদি আবার বললেন, 'তোমার সাহস তো কম নয়। আজকাল শহরের যে অবস্থা তাতে কি আর মেয়েরা নাইট শো দেখে? তা ছাড়া তুমি যা বীর! তোমার সঙ্গে বেবোব কোন ভরসায়?'

বললাম 'আপনারা নিজেরা তো বীরাঙ্গনা আছেন। তাই তো যথেষ্ট। কাপুরুষই হই আর বীরপুরুষই হই সিনেমার সময় যখন নেই তখন আর তর্ক করে লাভ কি। তার চেয়ে আসুন এক হাত তাস খেলি। তাস আছে?'

ভারতী বউদি খুশি হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই, কী নেই তাই বল। আমার ঘরে সব পাবে। এ হল সব পেয়েছির ঘর।'

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে ভারতী বউদি এক জোড়া তাস বের করলেন। দামি তাস। বেশি পুরোন হয় নি।

তিনিই তোড়জোড় করে খেলার সঙ্গীদের ডেকে আনলেন। তাঁর টানা-টানির চোটে অর্চনা এল, মঞ্জুলা এল, বড় বউদিও এসে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, 'সঞ্জীব কিছু মনে কোরো না। আমি তাসের কোন খেলাই জানিনে। ভারতী আমাকে অনেকবার শেখাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে নি। আমি বরং আমার ঘর ছেড়ে দিতে রাজি আছি।'

ভারতী বউদি বললেন, 'আহা ঘর দিলে কী হবে। যেখানে আছি এও তো ঘরই। মাঠও নয়, গাছতলাও নয়। তুমি তা হলে খেলা দেখবে আর খেলুড়েদের পান-দোক্তা জোগাবে দিদি।'

ভারতী বউদির খাটের ওপরই খেলার আসর বসল। প্রথমে কে কার পার্টনার হবে তাই নিয়ে খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি বলব না, কথা চালাচালি হল।

ভারতী বউদি বললেন, 'তোমার পার্টনার হয়ে লাভ নেই। বরং তোমার সঙ্গে রাইভলরির জন্যে আমার হাত নিসপিস করছে। তুমি আসল যুদ্ধে কতটা বীর তাসের যুদ্ধেই তার নমুনা বোঝা যাবে।'

মঞ্জুলা আর ভারতী বউদি একদিকে গেল। আমি আর অর্চনা আর একদিকে। অকসন ব্রীজের খেলা। খেলা ওরা মোটামুটি সবাই জানে। কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলাম অর্চনার খেলায় মন নেই। কল দিতে ভুল করে, লীড দিতে ভুল করে। ভারতী বউদি একাই বাজি মাত করলেন। তিনি রাবার করলেন আর আমরা একবার খেলা নিয়েও ডাউন দিলাম।

আমি ভারতী বউদির দিকে চেয়ে বললাম, 'অনিচ্ছুক আর অমনোযোগী পার্টনার নিয়ে খেলতে গেলে সে খেলায় কি জেতা যায় বউদি?'

তিনি বললেন, 'নিজে খেলতে জানো না। এখন পার্টনারের নামে দোষ। আমার জাকে যা তা' বলা হচ্ছে।'

অর্চনা লজ্জিত হয়ে একটু হেসে বলল, 'আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলাম আমি খেলতে জানিনে।'

ওর সেই লজ্জিত হাসি আর ভঙ্গিটুকু সমস্ত অক্ষমতা আর অমনোযোগিতাকে যেন মাধুর্যে মুড়ে দিল।

ভারতী বউদি বললেন, 'জানা না জানার প্রশ্ন নয়। তোর মন কোথায় পড়ে আছে সে আমি জানি।'

আমি বললাম, 'কোথায় ?'

'কোথায় আবার ? নির্মল ঠাকুরপোর ক্লাবে। আরে আমাদের স্বামীও তো এখন পর্যন্ত কেউ বাড়ি ফেরে নি। তাই নিয়ে কি আমরা আনন্দ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে বসে আছি ?'

অর্চনা মৃদুস্বরে বলল, 'দিদি, তোমাদের কথা আলাদা।'

ভারতী বউদি বললেন, 'কিন্তু ফল তো একই।'

অর্চনা কোন জবাব দিল না। ওর আনত মুখে ঈষৎ অবনত দেহাবয়বে আমি একটি করুণ বিষণ্ণতার মূর্তিকে ফুটে উঠতে দেখলাম।

একটু বাদে অর্চনা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, 'তোমরা বোসো। গল্প কর। আমি যাই।'

ভারতী বউদি বললেন, 'ঘরে গিয়ে একা একা কী করবি ?'

'কী আর করব ?'

অর্চনা উঠে চলে গেল।

কেউ তাকে বাধা দিল না।

বড় বউদি আর মঞ্জুলাও বিদায় নিল। ভারতী বউদি বললেন, 'যে যার ঘরে গিয়ে তো খিল দিল, আমিও যদি ওই পথ নিয়ে তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিই তুমি যাবে কোথায় ?'

হেসে বললাম, 'কোথায় আর যাব ? পথে দাঁড়াতে হবে।'

'তার চেয়ে চল ছাতে গিয়ে একটু দাঁড়াই। ঘরের মধ্যে কেমন একটা গুমট ভাব। বাইরে হাওয়া আছে চাঁদের আলো আছে। যাবে ?'

বললাম, 'যেতে আপত্তি কি। কিন্তু কেউ কিছু বলবে না তো ? আপনাদের যা একখানা বাড়ি।'

ভারতী বউদি হাসলেন, 'বললে, বলবে। এই বুঝি তোমার পৌরুষ ? এই সাহসে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে ? আর একটু ছাদে বেড়াবে তাতে এত কাতর ?'

ছাদে ওঠার পর অবশ্য ভালই লাগল। বিরাট ছাদ। এক কোণে মেসোমশাইর রাধাগোবিন্দের ঘর। সে ঘর এখন তালা বন্ধ। বাকি ছাদটা খোলা। আলসের ওপর ফুলের টবগুলি পাশাপাশি সাজানো। হাওয়ায় বেল ফুলের গন্ধ। পূর্ণিমার তিথি হলেও

আকাশের চাঁদ অবারিত নয়। বার বার মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিচ্ছিল।
এরই মধ্যে পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পাশের বড় রাস্তায় বাস চলাচলের শব্দ বিরল হয়ে এসেছে।
নিচে মেসোমশাইর কারখানার হিন্দুস্থানী দারোয়ানরা ঢোল বাজিয়ে কী যে গান গাইছে আমি তার কোন অর্থ বোধ করতে পারলাম না।
ভারতী বউদি পুব কিনারে সরে এলেন। আমাকে বললেন, 'এদিকে এসো।'
আমি এগিয়ে এসে ওঁর পাশে দাঁড়ালাম।
তিনি বললেন, 'কেমন লাগছে।'
বললাম, 'খুব সুন্দর। ছাদ আমার খুব ভাল লাগে। আমরা যে ভাড়াটে বাড়িটায় থাকি সেখানে ছাদে ওঠার জো নেই। ছাদটা মেয়েদের এলাকা। তারাই কাপড়-চোপড় শুকোতে দেয়।'
আমার কথাগুলি যেন ভারতী বউদির কানে গেল না। কি ইচ্ছা করেই তিনি কানে তুললেন না।
খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি হঠাৎ বললেন, 'এই জায়গাটা সুইসাইড স্পট হিসাবে আইডিয়াল কী বল ?'
আমি একটু চমকে উঠলাম, 'এমন সুন্দর জায়গায় এসে আপনার আত্মহত্যা করার কথা মনে হল কী করে? আপনি আত্মহত্যা করবেন কোন দুঃখে ?
ভারতী বউদি বললেন, 'কী আশ্চর্য। আমি কেন করতে যাব ? আমি আমার উপন্যাসের নায়িকার কথা ভাবছি। সে যদি আর কোন পথ খুঁজে না পায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেও পারে। তাছাড়া মানুষ কি শুধু দুঃখেই মরে, সুখেও মরতে চায়। এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল্। শোন নি গানটা ?'
'শুনেছি। সে তো কাব্যের মৃত্যু।'
'আমার নায়িকার বেলাতেও তাই। কাব্যের মৃত্যু। বেঁচে থেকেও অনেক অধিকার আমাদের হাতে থাকে না। কিন্তু মরবার স্বাধীনতা যদি থাকে—।'

'আপনি নিজে দেখি বীরাঙ্গণা। আপনার নায়িকা মরবার কথা ভাববে কেন? তার কত বয়স?'

'ভরা যৌবন। লোকে কি বুড়ো বয়সে মরবার কথা ভাবে? বুড়ো বয়সে মৃত্যুকে ভয় করে। আমার শ্বশুরকে দেখ না। হার্ট-ডিজিজের রোগী। একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। কত সাবধানে থাকতে হয়। তবু ওঁর একশ বছর বেঁচে থাকবার সাধ। যৌবনই শুধু মৃত্যুকে নিয়ে খেলতে পারে। তার মানেই জীবন নিয়ে খেলা।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনি যদি আপনার উপন্যাসের প্লটটা আমাকে বলেন, আপনার নায়িকার অপমৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ আছে কি না আমি ভেবে বলতে পারি।'

'বললে তুমি চুরি করে নেবে না তো। কি আর কাউকে বলে দেবে না তো?'

'না না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ভারতী বউদি কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার উপন্যাস একটা বড় উপন্যাস হবে। আজকাল শুনেছি বড় উপন্যাসেরই চাহিদা বেশি। তাতে অনেক চরিত্র অনেক উপাখ্যান থাকবে। কোনটা যে মূল অ্যাখ্যান তা আমি এখনো ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তোমাকে একটি উপাখ্যানের কথা শোনাই। ধর বড়লোকের বাড়ির একটি বউ। তার বাপের বাড়ির অবস্থা তত ভাল নয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সে বড়লোকের ঘরে পড়ল। শুধু রূপের জোরে নয়, কিছু কিছু গুণযোগ্যতাও তার আছে।'

'তারপর?'

'ধুমধাম করে বিয়ে হল। বাসি-বিয়ে গেল। শুভরাত্রি গেল। তারপর আরও অনেক দিন-রাত্রি কেটে গেল। সে দেখল স্বামী তাকে মোটেই আদর-আহ্লাদ করে না। বাপের বাড়িতে ফিরে এলে তার বন্ধুরা, তার খুড়তুতো জ্যেঠতুতো বোনেরা তাকে ঘিরে ধরল। কিরে রাত্রে কি সব হয়েছে-টয়েছে বল। শুনি গোপন কথা। কিন্তু গোপান কথা শোনাবে কি—মেয়েটির কোন গোপন কথা নেই।

এ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবার মত কথাও নয়। তাই সে কিছু না পেয়েও বলল পেয়েছি। সব পেয়েছি। বন্ধুদের কাছে সে হার মানবে কেন? যারা তাকে ঈর্ষ্যা করে তাদের কাছে সে কেন করুণার পাত্রী হতে যাবে? ক্রমে ক্রমে এই মিথ্যাটাকেই সে সত্য করে তুলল। বাপ-মা আত্মীয়স্বজন কাউকেই সে কিছু বুঝতে দিল না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে কি এতই বোকা হয়? স্বামীর সঙ্গে সে কি একটা বোঝাপড়া করে নিতে পারল না?'

'কী বোঝাপড়া করবে? স্বামীর ব্যবহার তার কাছে একটা হেঁয়ালির মত। একি স্বামীর মনের রোগ না শরীরের ব্যাধি মেয়েটি বুঝতে পারে না। স্বামী তাকে প্রথম রাত্রেই বলেছিল এ বিয়েতে তার মত ছিল না। বাবার জেদে কোন একটা দুর্বল মুহূর্তে সে রাজি হয়ে গেছে। এখন সে ভুলটা শুধরে নিতে চায়। তার জন্যে স্ত্রীকে সে এড়িয়ে যেত। গরজটা যেন মেয়েটিরই। সেই সেপারেশনের জন্যে অ্যাপ্লাই করবে, পরে ডিভোর্স কেস করবে। একজন ভুল করেছে তার খেসারত শুধু মেয়েটিকে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'দিক না খেসারত। তবু অল্পের ওপর দিয়ে যাক। নইলে সারা জীবনটাই যে তার নষ্ট হবে।'

'মেয়েটি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবে। কিন্তু তবু পারে না।'

'কেন পারে না?'

'কেন যে পারে না কে বলবে। হয়তো সংস্কার, লোকলজ্জা, ভুয়ো মর্যাদাবোধ, মেয়েমানুষ যখন ভাল খাওয়া পরা, গয়নাগাটির লোভের কথাও ভেবে নিতে পার। যে স্বামীর কাছ থেকে কিছুই পায় নি, যে স্বামীকে সে চূড়ান্তভাবে ঘৃণা করে, প্রতিরাত্রে যার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়, তাকেও সে বোধহয় একটু একটু ভালবাসে। ঘুমোলে সেই স্বামীর মুখ অবুঝ ছেলেমানুষের মত দেখায়। মেয়েটির পিঠাপিঠি যে ভাইটি অকালে মারা গেছে—সেই ভাইটির মুখ তার মনে পড়ে। সেও তার দিদির ওপর কম উৎপাত, কম অত্যাচার করে নি। মেয়েটি ভাবে একজীবন তারা না হয় ভাইবোন

হয়েই রইল।'
আমি একটুকাল চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনার এ গল্প এ যুগে অচল। রক্ষণশীল বাড়ির বউ হয়ে আপনি আরও রক্ষণশীল লেখিকা হয়েছেন। তার চেয়ে ওই বঞ্চিতা মেয়েটিকে বের করে নিয়ে যান বাড়িব বাইরে। সে এই মিথ্যে বিয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলুক। আবার বিয়ে করুক, বিয়ে যদি নাই হয় বিয়ের বিকল্প কিছু করুক। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী হোক।'
ভারতী বউদি একটু হাসলেন, 'সে তো রিফর্মারের কাজ। তোমার দাদা যদি এ নভেল লিখত সে হয়তো এইভাবেই শেষ করত। সে অবশ্য রিফর্মের নামে নাক কুঁচকায়। রিভলিউসন ছাড়া তার মুখে কথা নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয় রিফর্ম সব বিপ্লবের মধ্যেই আছে। অন্তেও আছে। তোমরা সবাই রিফর্মের ভক্ত। কিন্তু আমি ফর্মের জন্যে প্রাণ দিতে পারি।'
একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনার নায়িকার কথা বলুন। সেই নায়িকা কি এখনো ভার্জিন?' ভারতী বউদি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি চকচক করে উঠল। তিনি অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'সে কথা তোমাকে বলে কী হবে?'
সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। কপালে সিঁদুরের টিপ। হাতে শাঁখা চুড়ি।
মেঘমুক্ত চাঁদের আলোয় আমি ভারতী বউদির দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।
একটু পরেই মঞ্জুলা আমাদের ডাকতে এল।
'সঞ্জীবদা, শিগগির এসো। দাদারা এসে গেছে।'

ছাদ থেকে তিনতলায় নেমে এসে দেখলাম তিন দাদার মধ্যে দুই দাদা এসেছেন কিন্তু নির্মলদার এখনো দেখা নেই।
অমলদার বেশ স্বাস্থ্যবান লম্বা ফর্সা চেহারা। শ্যামলদা সেই তুলনায় একটু রোগা আর কালো। দু'জনেরই পরনে সার্ট-ট্রাউজার্স। অমলদাকে মেসোমশাইর মত খানিকটা রাসভারি বলে মনে হয়। শ্যামলদার চেহারার মধ্যে তীক্ষ্নতা বেশি।

অমলদা বললেন, 'এই যে সঞ্জীব তুই আজ আসবি শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম একটু আগে আগেই ফিরব। কিন্তু ফিরতে ফিরতে সেই দেরি। নানা ঝামেলা।'

হেসে বললাম, 'ঝামেলা তো হবেই। তুমি নাকি নতুন কারখানা খুলেছ অমলদা?'

'তুই কার কাছে শুনলি?'

'শুনতে পাই। তুমি আর যুবরাজ থাকতে রাজি নও। নিজেই এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ।'

অমলদা হেসে বললেন, 'সাম্রাজ্য তো ভারি। বাবার কারখানার তুলনায় সে কিছুই নয়। মধুপর্কের বাটি। তবু সেখানে আমি নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি। বেশ আছি। চিরকাল বাপের জুনিয়রগিরি করা বড় শক্তরে ভাই। তোকে তা বুঝতে হল না।'

আমার বাবা অল্প বয়সে মারা গেছেন। পিতৃস্মৃতি আমার কাছে বড়ই মধুর। তাঁর কাছে কোন দিন কোন কড়া শাসন পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। মার ঘরের দেয়ালে টাঙানো ফটোতে যেমন দেখি বাবার প্রকাণ্ড সৌম্য সুন্দর প্রসন্ন স্নেহশীল একটি মূর্তিই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁব কি অন্য মূর্তিও ছিল? কিংবা বাবা যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাঁর সঙ্গেও কি আমার এই রকম বিরোধ বাধত? রুচিতে প্রবৃত্তিতে শিক্ষা-দীক্ষায় মেসোমশাইর সঙ্গে তাঁর ছেলেদের যে বিরোধের কথা শুনি আমার আর বাবার মধ্যেও কি সেই সম্পর্কই গড়ে উঠত?

শ্যামলদা হেসে বললেন, 'দাদা, তোমার অন্তত বাবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ক্যাপিটাল তুমি বাবার কাছে থেকে নিয়েছ। কিছুটা জানিয়ে কিছুটা না জানিয়ে। কিছুটা হয় মা কিংবা বউদির মধ্যস্থতায়। তারপর রত্না বলে তুমি যে নতুন প্রোডাকটা বার করেছ—বাজারে তা বেশ চালুও হয়েছে—তাতে তোমার পত্নী প্রেমের নিদর্শন যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহটা তোমার ওরিজিন্যালিটিতে। বাবার দুঃখ তুমি তাঁর ফর্মুলাই চুরি করে একটু এদিক ওদিক করে নিজের নামে চালাচ্ছ।'

অমলদা চটে উঠে বললেন, 'মিথ্যে কথা। বাবা যদি তা বলে থাকেন মিথ্যে কথা বলেছেন।'
বলতে বলতে অমলদা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।
শ্যামলদা তাঁর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।
বললাম, 'হাসছ যে শ্যামলদা ?'
'দাদাকে চটিযে দিতে বেশ লাগে। ও অল্পেতেই এত চটে যায়। অন্যান্য ব্যাপারে দাদা হাসিঠাট্টা বেশ বোঝে, কবতেও পারে। কিন্তু নিজের কারখানার ব্যাপারে দারুণ সিরিয়াস। ঠিক বাবার একটি অবিকল প্রোটোটাইপ।'
হেসে বললাম, 'তুমি প্রোটোটাইপ নও শ্যামলদা ?'
শ্যামলদার মুখ এবার একটু গম্ভীর হল।
তিনি বললেন, 'না। আমি মোটেই বাবার মত না। কোন দিক থেকেই না। এমন কি চেহাবায় পর্যন্ত মিলেব চেয়ে অমিল বেশি।'
আমি মনে মনে হাসলাম। অমলদার আর দোষ কি। শ্যামলদারও কি ওরিজিন্যাল হবার গর্ব কম ?
শ্যামলদা বললেন, 'বাবাব সঙ্গে আমাব যদি মতের পথেব মিল থাকত তাহলে বাবা আমাকে এত ভয় করতেন না।'
আমি একটু কৌতুক বোধ করে বললাম, 'মেসোমশাই তোমাকে ভয় করেন বুঝি ?'
শ্যামলদা একটু হাসলেন, 'বাবা আমাদের তিনজনকেই ভয় করেন। দাদাকে ভয, দাদা বাবাব কমপিটিটর হবে। বাবার সর্বস্ব আত্মস্যাৎ করে বাবাকে অস্বীকার করবে। নির্মলকে ভয় ওর হাতে একদিনের জন্যেও যদি এই কারখানার ভার দেওয়া যায় ও জলস্রোতে সব ভাসিয়ে দেবে।'
'জলস্রোতে !'
'বুঝিস নি ব্যাপারটা ?'
'বাবা সেইজন্যে কারখানার কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ ওকে দেন নি। অথচ টাকাটা ও মোটাই পাচ্ছে।'
বললাম, 'আর তোমাকে ভয় করেন কী জন্যে ?'
শ্যামলদা বললেন, 'আমারটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বাবা ভাবেন

আমি যে কোন মুহূর্তে লেবার ট্রাবল ঘটাতে পারি। বোমা মেরে সব উড়িয়ে দিতে পারি।'

বললাম, 'তুমি তা পার না, শ্যামলদা। তাছাড়া মেসোমশাইকে অত বোকা বলে মনে হয় না।'

শ্যামলদা বললেন, 'খুব যে মেসোমশাইর ভক্ত হয়ে উঠেছিস। বাবা বোকা হবেন কেন। তিনি বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু তাঁর ট্রেডের ব্যাপারে বুদ্ধিমান। ট্রেডের বাইরে তাঁর পাকা বুদ্ধির পরিচয় পাই নি। যতই পাকা মাথা হোক। তা ছাড়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও নানা রকম ইডিয়োসিনক্রেসি থাকে। তাঁরও আছে। সেইগুলি দিনের পর দিন বাড়ছে। সেনিলিটির লক্ষণ এসে গেছে।

রত্না বউদি এসে তাড়া দিলেন, 'ঠাকুরপো, রাত প্রায় এগারটা। এবার তোমরা খেয়ে-টেয়ে নাও। তারপর তর্ক কোরো।'

আমাদের জেনারেশনে ঠাকুরপো ঠাকুরঝি সম্বোধনগুলি প্রায় অচল হয়ে গেছে। আমার নিজের বউদি আমাকে নাম ধরে ডাকেন। কিন্তু মেসোমশাই কিছু কিছু পুরোন বস্তুকে বেশ বাঁচিয়ে রেখেছেন। রাধাগোবিন্দের মন্দিরের মত বহু পুরোন রীতিনীতি আচার-নিয়ম এ বাড়িতে রক্ষিত হয়েছে। আমার হাল আমলের দাদারাও সেসব ব্যাপারে হাত দেন নি। ধনীরাই ঐতিহ্যকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন।

বউদির কথার জবাবে শ্যামলদা বললেন, 'হ্যাঁ যাই। হাত মুখ ধুয়ে এক্ষুণি আসছি বউদি। নিমু এসেছে?'

রত্না বউদি বললেন, 'না। সে এখনো ফেরেনি। মনে হচ্ছে তার আরো রাত হবে। নির্মলের জন্যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? তোমরা খেয়ে নাও। বেচারা সঞ্জীব সেই সন্ধ্যা থেকে বসে আছে।'

শ্যামলদা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, 'বেচারা সঞ্জীব! বেচারা সঞ্জীবের সময়টা নিতান্ত খারাপ কাটেনি বলে মনে হচ্ছে।'

তারপর তিনি জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুম ঢুকলেন।

দোতলায় ডাইনিং রুম। টেবিল চেয়ারে খাবার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা আমাদের বাড়িতেও আছে। তবে এত বড় টেবিল এত দামি দামি চেয়ার আমাদের নেই। মেসোমশাই অবশ্য মাটিতে আসন পেতে

খেতেই বেশি ভালবাসেন। একটি ঘরে সেরকম ব্যবস্থাও রয়েছে। মেসোমশাই নিজেদের বন্ধুদের নিয়ে সে ঘরে খান। কি জামাইরা এলে তাদের পাশে বসিয়ে গল্প করতে করতে খেতে ভালবাসেন মেসোমশাই। মাসীমা পরিবেশন করেন।
আজও এত বড় টেবিলে অমলদা, শ্যামলদা আর আমি খেতে বসলাম। চার পাঁচখানা চেয়ার খালি পড়ে রইল।
বউদিরা সবাই উপস্থিত। কিন্তু কেউ খেতে বসছেন না।
আমি বললাম, 'কী ব্যাপার। আপনারা বসে পড়ুন।'
রত্না বউদি বললেন, 'আমরা একটু পরে বসব। দেখি নির্মল আসে নাকি।'
শ্যামলদা বললেন, 'নির্মলের ভাগ্য ভাল। ওর জন্যে সবাই অপেক্ষা করে। তোমরা অন্তত দু একজন সঞ্জীবের সঙ্গে বসতে পার। ওকে কম্পানি দেওয়া উচিত।'
রত্না বউদি সবাইর মুখপাত্রী হয়ে বললেন, 'আমরা অনেকক্ষণ কম্পানি দিয়েছি। এবার তোমরা দাও।'
মঞ্জুলা বলল, 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি বসে যাই।'
সে এসে আমার পাশের চেয়ারে বসল।
আমি বললাম, 'তুইই একমাত্র ভদ্রমহিলা।'
ডাল তরকারি মাছ মাংস অনেকগুলি পদ রান্না হয়েছে।
আমি বললাম, 'এ যে এলাহি কাণ্ড। আজ কারো বার্থ ডে না ম্যারেজ অ্যানিভারসারি।'
অমলদা বললেন, 'ও সব কিচ্ছু না।'
শ্যামলদা বললেন, 'তুই তো কালে ভদ্রে আসিস। ধরে নে তোর আবির্ভাব বার্ষিকী।
ভারতী বউদি বললেন, 'এর মধ্যে একটা পদ অর্চনাকে দিয়ে রাঁধিয়েছি। বলতে হবে কোনটা তোমার এক্স সহপাঠিনীর রান্না। বুঝব জিভের কিরকম তাক।'
হেসে বললাম, 'বলতে পারব না বউদি। আমাদের ক্লাসে রান্না খাওয়ার পাট ছিল না।'
অমলদা সবচেয়ে জোরে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি থামলে অর্চনা

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে বলল, 'অত খোঁটা দিচ্ছ কেন মেজদি। সবাই জানে আমি তেমন ভাল রাঁধতে জানিনে।'
মাসীমা একবার এসে দেখে গেলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কত ভাল লাগছে দেখতে। মাঝে মাঝে যদি আসিস, থাকিস এসে দু একদিন কত আনন্দ হয়।'
বললাম, 'বউদিরা যা লোভ লাগিয়ে দিলেন আসতেই হবে মাসীমা।'
শ্যামলদা একটু হেসে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন।
আমি বললাম, 'শ্যামলদা তুমি কিছু বলবে?'
শ্যামলদা বললেন, 'হ্যাঁ বলব। আমাদের কারখানার কথা তুই যেন কী বলছিলি।'
বুঝতে পারলাম, কথাটা শ্যামলদা ঘুরিয়ে দিলেন।
রত্না বউদি বললেন, 'কারখানার কথা থাক ঠাকুরপো। তুমি আর নির্মল কারখানার জন্যে কত কাজ কর তা সবাই জানে।'
শ্যামলদা একটু হেসে বললেন, 'আজকাল দাদাও আমাদের এজমালি কারখানার জন্যে বেশি কিছু করবার সময় পায় না বউদি। সে তার নিজের কারখানার জন্যেই খাটে। তাছাড়া তোমরা তো সন্তোষপুরে আলাদা বাড়ি করে উঠে যাচ্ছ। তখন একেবারেই কোন যোগাযোগ রাখবে না। এই সঞ্জীবদের মত অবস্থা হবে।'
শ্যামলদা হাসতে হাসতেই কথাটা বললেন। কিন্তু অভিযোগের সুরটা প্রচ্ছন্ন রইল না।
রত্না বউদি বললেন, 'কী করব ভাই আমাদের তো দিনরাত শুধু পার্টি করলে হবে না, আমাদের খেটে খেতে হবে।'
শ্যামলদা হেসে বললেন, 'মানে খাটিয়ে খেতে হবে।'
অমলদা গম্ভীরভাবে খেয়ে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই আলোচনাটা তাঁর মনঃপূত নয়। খাওয়ার টেবিলে এ আলোচনা আমার কাছেও মুখরোচক বলে মনে হচ্ছিল না।
আমি তাই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললাম, 'এই আনারসের চাটনিটা বোধহয় অর্চনার নিজের হাতের, না মেজবউদি?'
ঠিক সেই মুহূর্তে মেসোমশাই খাবার ঘরের কপাটের সামনে

দাঁড়ালেন।

'এই যে তোমরা বুঝি সব খাচ্ছ ?'

আমি তাঁর দিকে না তাকিয়ে পরম মনোযোগে চাটনির স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলাম।

মেসোমশাই আমাকে কিছু বললেন না।

অমলদা শ্যামলদাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা সব খাচ্ছ, নিমু কোথায় ?'

আমি এবার নির্ভয়ে মেসোমশাইর দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হল আমার অনধিকার চর্চা তাঁর কানে যায় নি।

অমলদা বললেন, 'নিমু এখনো ফেরেনি বাবা।'

মেসোমশাই বললেন, 'এখনো ফেরেনি ?'

অমলদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছ ফেরেনি। তুমি তো শুয়ে পড়েছিলে। আবার কোন উঠে এসেছ।'

মেসোমশাই বললেন, 'উঠে এসেছি যে কেন তুমি তার কি বুঝবে। ছেলেটা চোখের সামনে বয়ে যাচ্ছে কারো কেন ভ্রুক্ষেপ নেই।'

অমলদা বললেন, 'ভ্রুক্ষেপ করে কী হবে ? তোমার ছেলে কি এখনো ছেলেমানুষ আছে নাকি বাবা ? ওকি স্কুল কলেজের ছাত্র ?'

'ওসব কথা এখানে কেন ? চল বাইরে চল।' বলে শ্যামলদা উঠে পড়লেন।

তার আগেই অমলদা উঠে গিয়েছিলেন।

রত্না বউদি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ও কি তোমরা রসগোল্লার পায়েসটা খেলে না ?'

তাঁর কথা অমলদা-শ্যামলদার কানে গেল না।

আমি তখনো টেবিলে বসে রয়েছি। আমার সামনে পায়েসের বাটি। অর্চনা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রত্না বউদির মুখে হাসি। যেন কোথাও কিছু হয় নি। তিনি তেমনি পরিহাসতরল সুরে বললেন, 'তোমার মোটেই জিভের তাক নেই সঞ্জীব। চাটনিটা আমার। আর পায়েসটা আমার ছোট জা'র। তালিম আমি দিয়েছি। কিন্তু করেছে অর্চনা নিজের হাতে।

খেয়ে নাও। মধুরেণ সমাপয়েৎ হোক।'

আমি ভাবলাম মধুর পরিসমাপ্তি আর হচ্ছে কই।

খানিক বাদে আমিও উঠে গিয়ে বেসিনে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। মাসীমা অমলদা আর শ্যামলদা মিলে মেসোমশাইকে ততক্ষণে ফের তাঁর ঘরে নিয়ে গেছেন। কী যেন সব বোঝাতে শুরু করেছেন। সব আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রত্না বউদি বললেন, 'এবার তুমি শুয়ে পড় সঞ্জীব। বাবার ঘরের পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে দিয়ে এসেছি।'

'সে কি এখনই শুয়ে পড়ব! আপনাদের এখনো খাওয়া হল না।'

ভারতী বউদি বললেন, 'আমাদের খাওয়ার দেরি আছে। কেন, তুমি কি পরিবেশন করবে নাকি?'

'তা করতে পারি। একেবারে আনাড়ি ভাববেন না।'

ভারতী বউদি বললেন, 'যখন হাফপ্যাণ্ট পরতে বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণের আসরে বোধহয় নুন আর নেবু টেবু দিতে।'

অর্চনা মৃদুস্বরে বলল, 'সত্যিই তুমি শুয়ে পড়না গিয়ে।'

তার গলার স্বরে কাতর অনুরোধ ফুটে উঠল।

আমি বুঝতে পারলাম অর্চনা চাইছে না আমি জেগে থাকি। আমি রাত্রির বাকি ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষদর্শী হই।

কিন্তু আমি সেটুকু না বুঝবার ভান করে বললাম, 'ছোট বউদি, তোমাদের অনুরোধ উপরোধে নির্মলদাকে ফেলে খেয়ে নিলুম। কিন্তু তার আসার আগে ঘুমিয়েও পড়ব? সেটা কি উচিত হবে ছোট বউদি?'

এবার অর্চনার মুখে হাসি ফুটল, 'থাক, তোমাকে আর ছোট বউদি ছোট বউদি করতে হবে না।'

আমি আজ এই দুর্লভ হাসিটুকুই দেখতে চেয়েছিলাম।

রত্না বউদি ডেকে বললেন, 'অর্চনা আয় এবার। আর কত রাত করবি। ছোট ঠাকুরপোর ভাত বেড়ে রেখে আমরা খেয়ে নিই।'

ঝি-চাকর রাঁধুনীদের আগেই ছুটি দিয়ে ওঁরা একতলায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অমলদা কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'শ্যামলদা, নির্মলদা কোথায় গেছে বলতো? অমলদাকেও বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।'

শ্যামলদা একটু হেসে বললেন, 'হুঁ। মনের উদ্বেগ অশান্তি বাবাকে সারারাত জাগিয়ে রাখে আর দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। দাদা ঠিক গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তুই দেখে নিস। তুই কী করবি? ঘুমোবি না জেগে থাকবি।'

'সে তোমার ওপর নির্ভর করে। তুমি যদি রাজনৈতিক আলোচনা কর আমার ঘুম পাবে।'

শ্যামলদা বললেন, 'বাদশাজাদাদের নিদ্রা ছুটে যাবার সময় হয়ে এসেছে। আর কোন আলোচনা তোকে জাগিয়ে রাখবে? রসতত্ত্ব? যৌনজীবন?'

শ্যামলদার সঙ্গে আমি তাঁর তিনতলার ড্রয়িং রুমে এসে বসলাম। আলমারি ভরা বই। বাইরেও স্তূপীকৃত পত্রপত্রিকা। বেশির ভাগই দলীয় পুস্তক।

শ্যামলদা আমার সামনের সোফাটায় বসে সিগারেট ধরালেন। আমার দিকে কেসটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'খাবি নাকি একটা? চলে?'

আমি বললাম, 'না।'

শ্যামলদা একটু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। তখন আমাদের কারখানার ব্যাপারে তুই আমাকে একটা খোঁচা দিয়ে কথা বলেছিলি। সেটা আগে পরিষ্কার হয়ে যাক।'

হেসে বললাম, 'তুমি কথাটা ভোলনি দেখছি।'

শ্যামলদা বললেন, 'আমি কেউ হাঁ করলেই তার মনের কথাটা বুঝতে পারি।'

আমি বললাম, 'তোমার ধারণা মানুষের মন তার মুখগহ্বরে।'

শ্যামলদা অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'বাজে কথা রাখ। তুই যা বলতে চেয়েছিলি আমি তা বুঝতে পেরেছি। তুই বলতে চাস যেহেতু আমি আমাদের কারখানার একজন অংশীদার, ভাতা হিসাবে মোটা টাকা পাই, ভবিষ্যতের একজন উত্তরাধিকারী আমি আমার নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারিনে।'

হেসে বললাম, 'ঠিক তাই।'
শ্যামলদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'অত্যন্ত ভুল কথা। আমাদের কারখানায় শ্রমিকদের যে সুযোগ-সুবিধা হয়েছে তা আমার জন্যেই। বাবার মত ছিল না, দাদার মত ছিল না।'
বললাম, 'শ্রমিকদের নিজেদের ইউনিয়নের কোন জোর ছিল না?'
শ্যামলদা বললেন, 'নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আমি তাদের সাহায্য করি। গাইড করি। এইজন্যে বাবা আর দাদা আমাকে ভাবে ঘরের শত্রু বিভীষণ। আমি যে টাকা এখান থেকে পাই তার অর্ধেকের বেশি পার্টি ফাণ্ডে যায়। দাদা আলাদা কারখানা করে ভাবছে আমাকে তার ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবে না। কিন্তু আমি না ঢুকি আর একজনে ঢুকবে। ওর প্রত্যেকটি শ্রমিকের মধ্যে যে আমি মিশে থাকব ও তা জানে না।'
আমি বললাম, 'কী জানি শ্যামলদা, এই তিনতলার ওপর থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে রোজ দশ-বার পদ দিয়ে খাবার খেয়ে তুমি যে দিন-মজুরের সঙ্গে মিশে যেতে পার কল্পনা করা একটু কঠিন।'
শ্যামলদা হেসে বললেন, 'নেমক হারাম। এইমাত্র টেবিলে বসে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খেয়ে আমাদেরই নিন্দা করছিস। অতগুলি আইটেম দিয়ে আমরা রোজ খাইনে। আজ বউদিরা সখ করে করেছেন তাই।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'কল্পনা করতে হবে কেন একথা বাস্তব সত্য। আমি যে কোন মুহূর্তে এই তিনতলা থেকে নেমে যেতে পারি। নুন ভাত খেয়ে থাকতে পারি। সে পরীক্ষা নিজের ওপর দিয়ে আমি করে দেখেছি। তুই যাই ভাবিস না কেন বাবার সঙ্গে দাদার সঙ্গে আমার তফাৎ আছে। যদিও আমরা একই কারখানার মালিক, একই বাড়ির বাসিন্দা। আমি আমার নিজের লক্ষ্যকে জানি। আমি জানি আমি কাদের জন্যে লড়াই করছি।'
আমি চুপ করে রইলাম। শ্যামলদার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবন আর আদর্শের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা কি সবাইকে নিঃসংশয় করবে?
শ্যামলদা আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মাসীমা এসে প্রায়

হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলেন।

শ্যামলদা বললেন, 'কী ব্যাপার মা। তুমি এখনো ঘুমোও নি?'

মাসীমা বললেন, 'কথা শোন ছেলের। একজন রইল বাড়ির বাইরে আর আমি ঘুমোব? তাছাড়া তোর বাবা আমাকে পাগল করে দিচ্ছেন।'

শ্যামলদা বললেন, 'যাওনা পাগল হয়ে।'

মাসীমা বললেন, 'গেলে তো বাঁচতাম।'

শ্যামলদা বললেন, 'কী করছেন বাবা?'

'কী আর করবেন? একবার উঠছেন, আবার শুয়ে পড়ছেন, ফের গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াচ্ছেন। এখন বুঝি আবার গিয়ে টেলিফোনের কাছে বসেছেন। এত করে বলি তুমি যে সব জায়গায় ফোন করবে তার কোথাও ওকে পাওয়া যাবে না। মিছিমিছি লোক জানাজানি করে কেলেঙ্কারি বাধাবে। তা কি আমার কথা শুনবে?'

শ্যামলদা একটু হেসে বললেন, 'থানায় আর হাসপাতালেও ফোন করতে বল,' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলে দিতে হয় না। ওর ফিরতে দেরি হলে ও সব জায়গাতেও বাবা মাঝে মাঝে খোঁজ নেন।'

ওঁর অবিচল ঔদাসীন্যে আমি একটু বিস্মিত হলাম।

শ্যামলদা ফের মাসীমাকে বললেন, 'তুমি যাও। বাবাকে গিয়ে একটু শক্ত করে রাখ। আমি এক্ষুণি আসছি।'

মাসীমা চলে গেলেন।

শ্যামলদা বললেন, 'এই প্রিমনিশন, এই অশুভ অমঙ্গল আশঙ্কার মধ্যে কি আছে বল তা? ডেথ উইস? এত ব্যস্ত হবার কী আছে বলতো? ব্যস্ত হয়ে যখন কিছু করা যাবে না। নিমুর সঙ্গে গাড়ি থাকে। যেদিন গাড়ি না নিয়ে যায় ওর ক্লাবের বন্ধুরা ওকে গাড়ি করে পেঁাছে দিয়ে যায়। যত রাতই হোক ও শান্তভাবে ফেরে। বাবা চেঁচামেচি না করলে ও কোন চেঁচামেচি করে না। খাবার ঢাকা থাকে। যেদিন ইচ্ছা হয় না খায় না। যেদিন ইচ্ছা হয় খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমোয় বেলা দশটা-এগারটা পর্যন্ত।'

বললাম, 'তুমি এ সব সমর্থন কর শ্যামলদা? সহ্য কর?'

শ্যামলদা বললেন, 'সমর্থন ঠিক করিনে। তবে সহ্য না করে কী করব। বাবা আর দাদাকেও তো আমার সহ্য করতে হয়। আমি তো আর রাতারাতি সবাইর ধাত বদলে দিতে পারছি নে। তবে বাবার মত এ সবের বিরুদ্ধে আমার অত 'প্রেজুডিসও নেই।'

আমি বললাম, প্রেজুডিস? তুমি কি একে শুধু একটা প্রেজুডিস বল?'

'তাছাড়া কী?'

আমি বললাম, 'মোটেই তা নয়। তোমাদের না হয় সাধ্য আছে তোমরা খাও। যাদের সাধ্য নেই, ভাত জোটে না—'

শ্যামলদা হেসে বললেন, 'তারা পচানি খায়।'

আমি বললাম, 'তুমি হাসতে পার। কিন্তু ব্যাপারটা কি অতই হেসে উড়িয়ে দেবার? আমি জানি আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এর চলন বেড়ে গেছে। কে যেন বলছিল স্কুলের ছেলেরা খায়, কলেজের মেয়েরাও নাকি কেউ কেউ খায়। এর মূলে কতখানি সত্য আছে তা জানি নে। কিন্তু যে দেশে বেশির ভাগ লোক খেতে পায় না, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে যারা সব আধপেটা খেয়ে থাকে সে দেশটা মোটেই অ্যাফ্লুয়েন্সের দেশ নয় যে তুমি একে প্রশ্রয় দিতে পার। তুমি মুখে চীন রাশিয়ার আদর্শ আওড়াবে আর বাঁচতে চাইবে মার্কিন দেশের লোকের মত এই কনট্রাডিকশনের কোন মানে নেই।'

শ্যামলদা হাসলেন, 'মানে নেই বলেই তো এই কনট্রাডিকশন। এই পানাহারের অভ্যাসের মধ্যে রাজনীতিকে টেনে আনা বোকামী। ভাই রে গঞ্জিকা আর সোমরস কি আজকের জিনিস? তা সেই মুনি-ঋষির আমল থেকে চলছে।'

'অথচ এখনকার ছেলেমেয়েদের ধারণা এইটাই আধুনিকতা।'

শ্যামলদা বললেন, 'জিনিসটা আধুনিক নয়, গ্রহণ করবার ভঙ্গিটা আধুনিক।'

হেসে বললাম, 'গ্রহণ না করবার ভঙ্গিটা আধুনিক হতে পারে। মুনিঋষির আমল থেকেই চলছে। কিন্তু যথার্থ কোন ঋষি একে সমর্থন করেন নি, না সেকালে না একালে। যাই বল না, নিকোটিন

আর অ্যালকোহল অ্যানটি হাইজিনিক এ কথা তো ঠিক।’
শ্যামলদা হেসে বললেন, ‘স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ বস্তু কি কেবল ওই দুটোই ? আরো বহু আছে। আরো অভ্যাস আছে যা মানুষের রুচি শালীনতা স্বাস্থ্যের প্রতিকূলে। তবু তো মানুষ সেগুলিকে ছাড়তে পারে না।’
আমি বললাম, ‘অসংখ্য দোষ আছে বলেই তুমি আরো একটি দোষকে সমর্থন করতে পার না। সেটাও দোষের পর্যায়ে পড়ে। দোষের তালিকাই তাতে বাড়ে। সেটা গুণ বলে ধরা যায় না।’
শ্যামলদা বললেন, ‘কে বলছে যে যায় ? যদিও দোষটাও গুণবাচক। আমরা অনেক জিনিসকেই খারাপ বলে জানি খারাপ বলে মানি। তবু তা ছাড়তে পারি নে। তবে আগের জেনারেশনের চেয়ে একালের ছেলেমেয়েদের সাহস বেড়েছে। তাদের মধ্য হিপক্রিসি কম। এইটাই যা শুভ লক্ষণ।’
নিচে মাসীমা আর মেসোমশাইর মধ্যে কী যেন বাদানুবাদ হচ্ছে শোনা গেল।
শ্যামলদা বললেন. ‘যাই ওঁদের একটু সামলে আসি। নির্মলটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। একটু বুঝে-শুনে চললেই হয়।’
বাবা-মাকে শান্ত করে শ্যামলদা একটু বাদেই ফিরে এলেন।
আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোর বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে।’
আমি প্রতিবাদ করে বললাম, ‘না-না ঘুম পাবে কেন।’
শ্যামলদা হেসে বললেন, ‘তা হলে বোধহয় যোগনিদ্রা। ঝিমুনি লক্ষ্য করছি। এককাপ করে কফি খেলে এটুকু যেত। বউরা বোধ হয় যে-যার ঘরে দোর দিয়ে শুয়েছে। খিল না দিলেও ভেজিয়ে রেখেছে। তুই বলবি ভারতীকে ? দু’ কাপ কফি করে দেবে।’
হেসে বললাম, ‘তুমি বল না।’
শ্যামলদাও হাসলেন, ‘আমি বললে দেবে না। খাই-খাই করে উঠবে।’
বললাম, ‘তোমাদের ব্যাপারটা কি বল তো ?’
শ্যামলদার মুখ গম্ভীর হল, ‘কেন ভারতী তোকে কিছু বলেছে না

কি ?'
'কী আবার বলবেন ?'
'তুই নিজেই অনুমান করেছিস ? হোর্স সেন্স ? শুনেছি ঘোড়া আর কুকুর দুইয়েরই ঘ্রাণ নাকি প্রবল ।'
হেসে বললাম, 'আমি বোধ হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব ।'
শ্যামলদা বললেন, 'ওরে বাবা । সে আরো মারাত্মক । ক্ষেপে গেলে কামড়ে দেয় ।'
বললাম, 'মুশকিল এই, আমি জায়গামত ক্ষেপতেও পারি নে । আমি চির অনুগত । তুমি আমাকে নিয়ে স্বর্গ পর্যন্ত যেতে পার ।'
শ্যামলদা বললেন, 'মহাপ্রস্থানের পথে ? সে পথ আমার পথ নয় । তাছাড়া আমি যুধিষ্ঠিরও নই । সুতরাং ধর্মরাজ, তোমার পথ আর আমার পথ আলাদা । আমি স্ত্রীকেও সে কথা বলে দিয়েছি । তোমার পথ আমার পথ আলাদা ।'
বললাম, 'কিন্তু ঘর যখন এক, পথও এক করে নিতে পারলেই তো ভাল ছিল ।'
শ্যামলদা বললেন, 'এক করে নেওয়া কি মুখের কথা ? আমাকে কেউ কেউ বলে তোমাদের অতগুলি রাজনৈতিক দল কেন ? এক হয়ে মিশে গেলেই পার । এ যেন জায়ে জায়ে ঝগড়া । এ বেলার বিবাদ ওবেলা মিটিয়ে নিলেই হয় । তাও আজকাল মেটে না । ভিন্ন স্বার্থ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি । রাতারাতি কি মন্ত্রবলে মিলে যাবে ? যারা বাইরে থেকে দেখে তারা ও সব কথা বলে । যারা হাতে-কলমে কাজ করে তারাই জানে সমস্যাটা কত জটিল । যতটুকু মেলে তার ওপর ভিত্তি করে এগোতে হবে । পারসুয়েড করতে হবে ।'
আমি বললাম, 'পারসুয়েশনে কাজ না হলে পারসিকিউশন ।'
শ্যামলদা বললেন, 'দরকার হলে তাও । তোরা রক্তপাতের কথায় আঁৎকে উঠিস । কিন্তু রক্তপাত কি হচ্ছে না ? বহুকাল ধরেই হচ্ছে । ইনটারনাল হেমারেজ চোখে দেখা যায় না । কিন্তু ভিতরের সেই রক্তস্রাব আরও সাংঘাতিক ।'
আমি এ প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে বললাম, 'ভারতী বউদির কথা বলছিলে শ্যামলদা ।'

শ্যামলদা বললেন, 'বুঝতে পারছি প্রসঙ্গটা তোর কাছে তেমন রুচিকর লাগছে না। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গও কি রুচিকর হবে? ভারতীকে আমি বলে দিয়েছি তোমার পথ আমার পথ আলাদা। এর পরেও যদি একঘরে থাকতে হয় থাকো। সে আছে ভাই আমিও আছি।'
বললাম, 'পথ আলাদা কিসের?'
শ্যামলদা বললেন, 'আমার পথ কাজের, আমার পথ রক্তের, তার পথ রসের। ও ভাবে আমি সখের শ্রমিক। এর চেয়ে দাদার মত মন দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য দেখলে কাজের কাজ হত। ভালবাসার ধরণ-ধারণও আমাদের আলাদা। ও চিরকাল অষ্টাদশী হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু আমি তো তা পারি নে। আমি সেই আঠের বছরের তারুণ্যকে অনেক দিন পার হয়ে এসেছি। নির্মলের মত ওর বাইরের কোন নেশা নেই। কিন্তু নেশা আছে ওর ভিতরে। রসের নেশা। খেজুর রসই হোক আর তালের রসই হোক তা যেমন মজে গেলে তাড়ি হয় ও-ও তেমনি আমার কাছে একটি তাড়ির হাঁড়ি। আর ওর কাছে আমি কলে পেষা রস নিংড়ে নেওয়া একখানি শুকনো আখ।'
আমি চুপ করে রইলাম।
শ্যামলদা একটু হাসলেন, 'ওর আরো গুণ আছে।'
'কী রকম?'
'ও একসময় একটু লেখা-টেখার অভ্যাস করেছিল, কিন্তু মনের মত হয় নি বলে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মনে মনে লেখাটা ছাড়ে নি, মুখে-মুখে বানানোটাও ছাড়ে নি। অসাধারণ ওর কল্পনাশক্তি। স্থূল ভাষায় বলতে গেলে মিথ্যা কথা বলবার শক্তি। ও নিজেও যেন বুঝতে পারে না মিথ্যাকথা বলছে। যা বলে তখনকার মত তাই সত্য। তারই সঙ্গে ও একাত্ম। নিজে এক কাল্পনিক জগৎ তৈরি করে নিয়ে যতক্ষণ খুশি তার মধ্যে বাস করতে পারে। এ একধরনের রোগ। কিন্তু এর জন্য ওকে আমি মেনটাল হসপিটালে নিয়ে যেতে পারি নে। যেতে চাইলেই বা ও যাবে কেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেও বলতে পারি নে। বললেও ও যাবে না। এই সহবস্থান অসহনীয়।'
শ্যামলদা অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরোটি চেপে নিবিয়ে রাখলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তবু হঠাৎ কোন কোন দিন ওকে যখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে দেখি মনটা কেমন হয়ে যায়। রাশ-রাশ মেঘের মত, পাঁজা-পাঁজা অন্ধকারের মত তাল-তাল দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমে ওঠে। তখন একটি দুঃখিনীকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরি।'

একই ব্যাপারে দু রকমের ব্যাখ্যা আমি দু'জনের মুখ থেকে শুনলাম। সন্ধ্যায় এক রকম, দুপুর-রাত্রে আর একরকম। এই দুই জবানীর কোনটি সত্য কে জানে।

আমি শুধু নিজের প্রকৃতিকে কিছুটা জানি। আমার যেন কোন মতামত নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, আমি যেন এক রূপমুগ্ধ ধ্বনিমুগ্ধ তরল জলীয় সত্তা। সেই ধ্বনিরূপের অন্তর্নিহিত আবেগ আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়। আর আমাকে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপান্তরিত করে।

গেটের কাছে একখানা গাড়ি এসে থামবার শব্দ হ'ল।

শ্যামলদা বললেন, 'এই বোধহয় এল। দারোয়ান আছে নিচে। সেই দোর খুলে দেবে।'

একটু বাদে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের ঘরের সামনে নির্মলদাকে দাঁড়াতে দেখলাম।

দীর্ঘ দেহ, ফর্সা রঙ। নাক-মুখের গড়নও সুন্দর। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ নির্মলদা। পরণে ধূসর ট্রাউজার্স গায়ে হাফসার্ট, তাতে কিন্তু সবুজ, বেগুনি, হলদে তিন-চারটি রঙের ছিট আছে। নির্মলদার মুখখানা একটু ফোলা ফোলা। চোখ দুটো একটু লালচে।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে তোমরা এখনো জেগে আছ। সঞ্জীব কখন এসেছিস?'

শ্যামলদা বললেন, 'ও তো এসেছে সন্ধ্যাবেলায়। তুই আজ একেবারে রাত একটা করে ছাড়লি।'

নির্মলদা বলল, 'দেরি হয়ে গেল। সিনেমায় গিয়েছিলাম। তারপর সান্যালের পাল্লায় পড়ে গেলাম।'

শ্যামলদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'যা ঘরে যা।'

হঠাৎ সিঁড়ির কাছ থেকে চড়া গলায় বজ্রনাদ শোনা গেল, 'দাঁড়াও।' আমি আর শ্যামলদা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি মেসোমশাই ততক্ষণে ঘুরে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বড়সড় চেহারা। বাইরে থেকে এখনো বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হয়। পরণে সেই আটহাতি ধুতি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। খোলা গা। চেয়ে দেখলাম মেসোমশাইরও চোখ দুটি লালচে, নির্মলদার মত তারও পা দুটি কাঁপছে।

মেসোমশাই সাধু ভাষায় বলতে শুরু করলেন, 'দাঁড়াও! আমি তোমাকে বার বার নিষেধ করেছি ওসব খাবে না, এমন রাত করে ফিরবে না। তবু কেন—'

নির্মলদা প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'আঃ ছাড়ো। রোজ এই নাটক সহ্য হয় না। পথ ছেড়ে দাও।'

মেসোমশাই বললেন, 'আগে আমার কথার জবাব দাও। তারপর যাবে।'

নির্মলদা বলল, 'আচ্ছা জ্বালাতন। এর আবার জবাবের কী আছে। দেখতে পাচ্ছ আমি না বেরিয়ে পারি নে। আমাকে বেরোতে হয়। তুমি বুড়ো হয়েছ। তোমার বেরোবার দরকার হয় না। তুমি শুয়ে থাকো, বিশ্রাম কর। ঘুমোও। আমি কী করি না করি, কখন ফিরি না ফিরি সে খোঁজে তোমার তো দরকার নেই। আমি এখন আর শিশু নয়, ছেলেমানুষ নয়। আমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছি।'

মেসোমশাই বললেন, 'ছাই হয়েছ।'

নির্মলদা বলল, 'বেশ তাহলে তাই হয়েছি। তোমার রুচি অনুযায়ী তুমি চল, আমার রুচি নিয়ে আমাকে চলতে দাও। তুমি তোমার মত করে বাঁচো, আমাকে আমার মত বাঁচতে দাও।'

মেসোমশাই বললেন, 'বাঁচা? এই তোমার বাঁচা? তিলে তিলে ক্ষয়, তিলে তিলে অপমৃত্যু! আমি চোখের সামনে সেই মৃত্যু দেখছি তোমার। এর চেয়ে একনিমেষে তোমাকে আমি শেষ করে দেব।'

নির্মলদা হেসে উঠল, 'হাউ ফানি, শেষ করে দেবে! কী করে শেষ করবে?'

আমি মেসোমশাইকে ধরে টানাটানি করছি। শ্যামলদা নির্মলদাকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেউ কাউকে নড়াতে পারছেন না। এতক্ষণে বাড়ির সবাই রঙ্গমঞ্চে হাজির। মাসীমা এসে গেছেন, বাড়ির বউরা, মেয়েরা সব উঠে পড়েছে। অমলদা আর রত্না বউদিও এসে দাঁড়িয়েছেন সেই ভিড়ে। শুধু নিচ থেকে দারোয়ান আর চাকর-বাকররা ভয়ে উঠে আসতে পারে নি। তারা নিচে দাঁড়িয়েই ওপরের মজা দেখছে।

নির্মলদা বুক ফুলিয়ে তার বাবার দিকে এগিয়ে গেল, 'কর দেখি শেষ। গায়ে একবার হাত তুলে দেখ দেখি। তোমার কতখানি সাহস দেখে নিই একবার।'

মেসোমশাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'নিশ্চয়ই শেষ করব। আমি সৃষ্টি করেছি, আমি পালন করেছি, আমিই তোকে—'

বলতে বলতে মেসোমশাই হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

নির্মলদা বলল, 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এসেছেন! এবার মহেশের নিজেরই মহাযাত্রা হবে। হয় তো হোক। আমি তার জন্যে দায়ী নই।'

বাকি সবাই 'কী হল কী হল' বলে মেসোমশাইকে তাড়াতাড়ি তুলে ধরলেন। তারপর ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

কে যেন বলল, 'ডাক্তারকে ফোন করে দাও। হয়তো সেকেণ্ড স্ট্রোক।'

কিন্তু মেসোমশাই হাতের ইসারায় নিষেধ করলেন। তিনি নিঃশব্দে বিছানায় পড়ে রইলেন। বউরা শুশ্রূষা করতে বসল।

নির্মলদা দোতলায় নেমে এসে মেসোমশাইর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'শেষ করে ফেলবে। এ তোমার কারখানার মাল কি না, পছন্দ হ'ল না অমনিই ফেলে দিলে। তাও তো প্রাণ ধরে ফেলে দিতে পার না, রিজেকেটড মালও নানা কারচুপি করে বাজারে চালাও। আমি তোমার বড়লোক হওয়ার সমস্ত কথা ফাঁস করে দেব।'

মাসীমা বললেন, 'আর গজগজ করিস নে, এবার যা। তুই ওঁকে

মেরে ফেলবি।'

নির্মলদা বলল, 'ফেলি তো ফেলব। আমার হাতে যদি মরে তোমার স্বামীর স্বর্গবাস হবে। নইলে অনেক অপঘাত ওঁর কপালে লেখা আছে।'

বউদিরা উঠে গিয়ে নির্মলদাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল। অর্চনা মেসোমশাইকে শুশ্রূষা করতে লাগল। মঞ্জুলাও কাছেই ছিল। কিন্তু মাসীমা ওদের তুলে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে এসে বসলেন।

অমলদা অনেক আগেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে ডেকে আনতে। শুধু টেলিফোন করলে এত রাত্রে যদি না আসেন। যদিও মেসোমশাইর বাড়ি থেকে ফোন করলে একজন কেন তিন জন ডাক্তার এসে হাজির হবেন। তবু অমলদা নিজেই গেছেন।

ডাক্তার এলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, 'তেমন ভয়ের কিছু নেই। তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে। বেশি যেন কথা না বলেন। কয়েকদিন বিছানা থেকে উঠতে দেবেন না।'

প্রেসক্রিপশনখানা অমলদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না, ওষুধ কাল আনলেও হবে। ঘুমের ওষুধ আমার কাছে আছে।'

সবাই ঘরে চলে গেলে আমি মাসীমা-মেসোমশাইর কাছে আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

মাসীমা বললেন, 'রাত শেষ হয়ে এল। যা, পাশের ঘরে বিছানা করা আছে। এবার শুয়ে থাক গিয়ে।'

কিন্তু শুয়ে পড়বার আগে ভাবলাম একবার নির্মলদার খোঁজ নিয়ে আসি।

তিনতলায় উঠে গেলাম। ঘরে ঘরে খিল পড়েছে। শুধু পূব-দক্ষিণ বরাবর নির্মলদার ঘরের দোরটি খোলা।

দোরের সামনে সে চুপচাপ বসে অছে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গোঁজা। পাশেই অর্চনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রে দুটি স্ট্যাচুকে আমি সামনে দেখতে পেলাম।

একটু এগিয়ে এসে অর্চনাকে বললাম, 'ওকে শুইয়ে দাও নি কেন ?'
অর্চনা মৃদুস্বরে বলল, 'না শুতে চাইলে কী করে শোয়াব ?'
আমি নির্মলদাকে একটু নেড়ে দিয়ে বললাম, 'এভাবে বসে আছ কেন। যাও শোও গিয়ে।'
নির্মলদা মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। একটু দেখে নিয়ে বলল, 'কে সঞ্জীব ? সেই থেকে বসে আছিস ? আমি তোকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলাম কিন্তু খাওয়াতে পারলাম না।'
'আমার খাওয়ার জন্যে ভাবছ কেন। আমি পেটভরে খেয়ে নিয়েছি। তোমারই বোধ হয় খাওয়া হয় নি।'
নির্মলদা বলল, 'আমাকে কে খাওয়াবে বল। আমার কি কেউ আছে ? আই হাভ নান, নান ইন দিস্ ওয়ার্ল্ড।'
অর্চনা আগের মতই কোমল স্বরে বলল, 'তোমার খাওয়ার জন্যে এত সাধাসাধি—'
আমি ওকে হাতের ইসারায় থামিয়ে নির্মলদাকে বললাম, 'খাবে এখন ?'
নির্মলদা বলল, 'না। আমাকে বিরক্ত কোরো না। সে আমাকে শেষ করে দিতে চায়। শেষ করে দেওয়া যেন এত সোজা।'
বললাম, 'ও কথা কেন ধরছ। রাগের সময় একটা কথা বলে ফেলেছেন।'
নির্মলদা বলল, 'রাগের সময় নয়। এটা তার সব সময়ের চিন্তা। হি ডাজ নট্ লাভ মি। হি লাভস অনলি হিমসেলফ।'
বললাম, 'কী যে বল। আমি যতদূর জানি তোমাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তোমার ওপরই তাঁর বেশি আশা-ভরসা।'
নির্মলদা বলল, 'বাজে কথা। ফেলে দে তোর ভালবাসা আর আশা-ভরসা। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে। বাপ হওয়া ভারি শক্ত। ভারি শক্ত।'
হেসে বললাম, 'তুমি হয়ে দেখেছ না কি ?'
নির্মলদা বলল. 'হই নি। কিন্তু একদিন তো হব। একটা আইডিয়া তো আছে। শিশুর বাপ হওয়া সহজ, বাচ্চা ছেলে-মেয়ের বাপ হওয়া সহজ, কিন্তু জোয়ান ছেলের বাপ হওয়া খুব

কঠিন। দেখিস নি ছেলেমেয়েরা বড় হলে বুড়োবুড়িরা তাদের ডিঙ্গিয়ে বাচ্ছা নাতি-নাতনীদের আদর করে। ভালবাসার অর্থ তাদের কাছে শুধু কেয়ারেসিং। গায়ে পিঠে হাত বোলানো, জড়িয়ে ধরা চুমু খাওয়া। অ্যান্ড নাথিং এলস্। কিন্তু বয়স্ক ছেলেকে ভালবাসতে হলে শুধু তার শরীরকে ভালবাসলে চলে না। তখন সে তার শরীর নিয়ে দূরে সবে থাকে। তখন ভালবাসতে হয় শরীরের চেয়েও যা বেশি সেইগুলিকে। তার রুচি প্রবৃত্তি অভ্যাস, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শ, তার দুঃখ বেদনা নৈরাশ্যকে ভালবাসতে হয়।'

বললাম, 'কিন্তু সব কিছুকে ভালবাসা কি সম্ভব? বাপেরও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে।'

'তাহলেই বোঝ, বাপ শুধু তার পছন্দকেই ভালবাসে। তার বাইরে কিছুকে নয়, কাউকে নয়। ছেলের আনন্দের জন্যে ছেলে নয়। নিজের প্রয়োজনের জন্যে ছেলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ছেলে।'

মাঝে মাঝে নির্মলদার গলা চড়ে উঠছিল। আমার ভয় হল পাশের ঘরে শ্যামলদারা জেগে উঠতে পারেন।

আমি বললাম, 'নির্মলদা চল এবার তোমার ঘরে গিয়ে বসি। সেখানে কথা হবে।'

নির্মলদা বলল, 'না ঘরে যাব না। ঘরে বড গরম।'

'গরম কিসের। ফ্যান খুলে দিলেই হবে।'

নির্মলদা বলল, 'ইলেকট্রিক ফ্যান তো দূরের কথা। অর্চনা যদি হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে বসে তাহলেও গরম যাবে না।'

নির্মলদা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

অর্চনা শান্তভাবে বলল, 'আমি জানি, আমার পাখার জোর অত বেশি নয়।'

নির্মলদা বলল, 'তার চেয়ে চল বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।'

বললাম, 'এত রাত্রে বাইরে কোথায় যাবে! যেতেই যদি হয় ছাদে চল। খোলা জায়গা আছে, হাওয়া আছে।'

নির্মলদা বলল, 'ও, তোর তো আবার ছাদের খুব বাতিক। বেশ

চল, আমার আপত্তি নেই।'
আমি অর্চনার দিকে চেয়ে বললাম, 'যাবে না কি ?'
নির্মলদা আমার দিকে চেয়ে আধা কৌতুকের সুরে বলল, 'আবার অর্চনাকে কেন ? না হলে তর্ক জমবে না ? কথা বেরোবে না ? নাউ কাম মাই ফ্রেন্ড ইউ রিকোয়ার এ ওমান এ্যান্ড আই রিকোয়ার এ গ্লাস অব ওয়াইন। দি সেম্ সেম্। কারো কারো পক্ষে ইদার অর, কারো কারো পক্ষে বোথ দি কয়েশ্চনস আর কমপালসরি। সেরা রসিক কে বল তো ?'
নির্মলদা আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'বল, বলতেই হবে। সেরা রসিক কে ? বেতাল কহিল, মহারাজ বলুন তো এই তিন ব্যক্তির মধ্যে রসচূড়ামণি কে ? মহারাজ কহিলেন, কী কহিলেন বল না।'
নির্মলদা উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধ ধরে একটু ঝাকুনি দিল।
আমি বললাম, 'অর্চনা, তোমার গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং ঘরেই থাকো।'
অর্চনা বলল, 'না চল আমিও যাই।'
নির্মলদা বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। আমি যাব, সঞ্জীব যাবে, অর্চনা যাবে। আমরা সবাই যাব। তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন সঞ্জীব ? ভেবেছিস আমি মাতাল হয়েছি ? মোটেই না। আমি বেশ স্ট্যান্ড করতে পারি। আমার সিস্টেম এখন ধরিত্রীর মত ধারয়িত্রী।'
অর্চনা বলল, 'তাহলে একটা মাদুর-টাদুর নিয়ে আসি।'
নির্মলদা স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাল, 'মাদুর ? মাদুরে কী হবে ?'
অর্চনা বলল, 'ছাদে তো বসবার মত আর কিছু নেই। মাদুর ছাড়া বসবে কিসে ?'
নির্মলদা বলল, 'কেন তোমার আঁচল বিছিয়ে দেবে। দেব কাঙালিনীর আঁচল তোমার পথে পথে বিছিয়ে। পথে বিছাতে হবে না। ছাদের ওপর একটু বিছিয়ে দিয়ো তাহলেই যথেষ্ট।'
তারপর নির্মলদা আমার দিকে ফিরে তাকাল, 'কিন্তু সঞ্জীব, সে আঁচলে তো ভাই, দু'জনের ঠাঁই হবে না। উঁহু, নেভার। আমি অত স্বার্থত্যাগী নই। তুমি যোগীপুরুষ। তুমি বরং একখানা কুশাসন বগলে নিয়ে চলে এসো।'

এর পরেও অর্চনা মাদুর আনতে যাচ্ছিল কিন্তু নির্মলদা বাধা দিয়ে বলল, 'বলছি যে কিছু আনতে হবে না, অমনিই চল।'
এরপর আমরা সব ছাদে উঠলাম।
পরিষ্কার ছাদ। আকাশ এখন নির্মেঘ, নির্মল, জ্যোৎস্নাধোয়া। আমি পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে নির্মলদার হাতে দিতে যাচ্ছিলাম। সে বাধা দিয়ে বলল, 'থাক থাক, এমনিই বসতে পারবি। অত ফর্সা কাপড়-চোপড় দিয়ে কী হবে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?'
বললাম, 'ভুলে গেছি।'
নির্মলদা বলল, 'আমি ভুলি নি। ভবি ভুলবার নয়। দেখছিস তো নেশার গুণ? স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, কনসেনট্রেশান বাড়ায়। ইনটক্সিকেশান-এর কথা হচ্ছিল। এ বস্তু সবারই দরকার। কারো মদ, কারো মেয়ে, কারো বা চাঁদের আলো।'
'সব কি সমান?'
নির্মলদা বলল, 'সব সমান। যার সিসটেমে যা সয়, তার পক্ষে তাই শ্রেয়। যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে। বিহারের বেলায় যেমন এ কথা সত্য পানাহারের বেলাতেও তাই। যার রুচিতে যা সয়, যার সিসটেমে যা সয় সে তাই খাবে। তাতে যদি কেউ বাধা দিতে আসে সে মার খাবে।'
বললাম, 'তোমার সিসটেমের ওপর তোমার বুঝি খুব বিশ্বাস?'
'নিশ্চয়ই। আত্মবিশ্বাস আমার একমাত্র সম্বল। অহংকার একমাত্র অলংকার। তৃণাদপি সুনীচেনের উপদেশে আমি কোনদিন আকৃষ্ট হই নি। হবও না।'
বললাম, 'ভাল কথা। আত্মবিশ্বাস বলে বস্তু আমার একেবারেই নেই। তা যাদের আছে আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। যিনি যে কোন ক্ষেত্রে কিছু অ্যাচিভ করতে পেরেছেন আমি তাঁকে মর্যাদা দিই।'
নির্মলদা বলল, 'সে অ্যাচিভমেণ্ট যতই মেকী হোক না, যতই ভিত্তিহীন, শূন্যগর্ভ হোক না তাতে কোন ক্ষতি নেই। শুধু তার বাজারদর থাকলেই হল। এই তো, বলে যাও, বলে যাও।'
বললাম, 'তা নয়। আমি চেষ্টা করি যার যথার্থ মূল্য আছে

তাকেই মূল্য দিতে। হয়তো বিচারে ভুল হতে পারে।
নির্মলদা বলল, 'বিচারে ভুল মানে? তোরা বিচারের ধারধারিস নাকি? নির্বিচারে চোখ বুজে সব মেনে নিস। তারই নাম ট্রাডিশন। তারই নাম ভক্তিশ্রদ্ধা।'
বললাম, 'একটা একটা করে সারা যাক। তুমি তোমার সিসটেম-এর কথা বলছিলে। তার ওপর অত বিশ্বাস রেখো না। নিজের শরীরটা তোমার হাতের মুঠোয় নয়। এ দেশের জলহাওয়া মাটির প্রভাব তার ওপর অনেক বেশি। তাছাড়া আমাদের এই সিসটেম বড় বিট্রে করে। প্রকৃতি ছলনাময়ী।'
নির্মলদা বলল, 'রেটোরিক এ্যান্ড প্রোসোডির ছড়াছড়ি। উপমা আর অলঙ্কার। কোন প্রকৃতির কথা বলছিস? দেহপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি না এই নারীপ্রকৃতি?'
অর্চনার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে নির্মলদা একটু হাসল।
অর্চনা কোন জবাব দিল না। চাঁদের আলোয় তার মুখ তেমনি শান্ত আর স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। একটু ক্লান্ত একটু বা অবসন্ন।
আমি বললাম, 'তোমার কি ঘুম পাচ্ছে? তাহলে শুতে যাও না।'
অর্চনা বলল, 'পরে যাব। ভোর প্রায় হয়েই এল।'
বললাম, 'মিছামিছি রাত জাগলে। তুমি খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে পারতে।'
অর্চনা বলল, 'সে তো তুমিও পারতে, উনিও পারতেন। কিন্তু কারই বা ঘুম হল।'
নির্মলদা বলল, 'অনিদ্রাটা আমার সিসটেমে সয়ে গেছে। আমার অসুবিধে হয় না। তোমরা যদি ইচ্ছা করে না ঘুমোও আমি কী করতে পারি।'
বললাম, 'আবার সেই সিসটেমের গর্ব। তোমার সিসটেম এত উল্টাপাল্টা অভ্যাস কিছুতেই সইবে না। আজ সইছে। কিন্তু দু দিন বাদে দেখবে আর সইছে না। দেখবে শরীর ভেঙে পড়েছে। সেই শরীর নিয়ে কিছুতেই কোন কাজ করতে পারছ না। সেই জন্যেই সংযম। সেই জন্যেই নিয়ম-কানুন, স্বাস্থ্যবিধি।'
নির্মলদা বলল, 'দূর দূর। পুরোন বস্তাপচা সব তত্ত্ব। পদে পদে

বিধিনিষেধই যদি মেনে চলতে হল তাহলে জীবনে মজা রইল কোথায়। নিজের বিধিনিষেধ আমি নিজে তৈরি করে নিয়েছি। আমি তাই মেনে চলি। আমি স্বয়ম্ভু। নিজের মনের সংহিতাই আমার মনুসংহিতা। তুই আর কী এমন ভাঙাগড়ার ভয় দেখাচ্ছিস। শরীর ভেঙে পড়বে তাতে হয়েছে কী। না হয় মরে যাব। তার চেয়ে বেশি কিছু তো আর হবে না। বাবা ভাবেন তিনিই একমাত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। এই ত্রিমূর্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে।'

আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্মলদা নতুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর পরম উল্লাসে বলতে লাগল, 'এই ত্রিমূর্তি আমরা প্রত্যেকেই। আমিও সৃষ্টি করি, পালন করি, সংহার করি।'

'কাকে ?'

নির্মলদা বললেন, 'আমার মনের মধ্যে কত আইডিয়া, কত সঙ্কল্প কত প্রতিশ্রুতি, কত প্রতিশ্রুতি ভাঙার খেলা। আমার ফ্যাক্টরী বাবার ফ্যাক্টরীর চেয়ে ঢের বড়। আমার ফ্যাক্টরীতে যখন প্রোডাকশন আরম্ভ হবে কোয়ানটিটি কোয়ালিটিতে আই স্যাল স্যারপাস মাই ফাদার।'

হেসে বললাম, 'ভালই তো। সেই তো চাই।'

নির্মলদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমিও ত্রিমূর্তি। আমিও জন্ম দিই, পালন-পোষণ করি তারপর আমারও অসন্তোষ অতৃপ্তি বাড়তে থাকে। তখন আমি সব গলা টিপে মেরে ফেলি। অ্যান্ড দোস থিন্কস আর মাসকিউলিন। সবই পুরুষের কাজ। কোন মেয়ের সাধ্য নেই তা করতে পারে। অর্চনা, তুমি পার ?'

অর্চনা এবার একটু হাসল, বলল, 'না।'

নির্মলদা বলল, 'আমি সেখানে একজন নিরলস কর্মী। এ ডিভোটেড ওয়ার্কার। ডবল ওভার-টাইম পাবার যোগ্য। বাইরে থেকে লোকে দেখে আমি কেবল ব্রুড করি চুপচাপ বসে থাকি। তা নয়। আমি সেখানে কাজ করি, প্লান করি, ডিজাইন তৈরি করি। ভেরি কমপ্লেকস, ভেরি কমপ্লেকস ডিজাইন, আমি তা ওয়ার্ক-আউট করি,

অ্যান্ড আই ডেস্ট্রয় দেম অলটুগেদার। অ্যান্ড দেন দি সার্কেল বিকামস কমপ্লিট।

নির্মলদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'নাও। এবার তোমাদের সূর্য উঠবে। এবার আমার ঘুমোবার সময় হল। সঞ্জীব, তুমি প্রাণভরে সূর্যোদয় দেখ। অর্চনা, ইচ্ছা করলে তুমিও থাকতে পার। আমি যাই। শুয়ে পড়ি গিয়ে। এখন হয়তো ঘুম আসবে।'

পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সূর্য উঠতে এখনো দেরি। আমরা সে জন্যে কেউ অপেক্ষা করলাম না। নির্মলদার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এলাম।

নির্মলদা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি ইতস্তত করছিলাম। অর্চনা বলল, 'এসো না।'

ঘরে ঢুকলাম। ডবল বেডের খাটে যত্ন করে বিছানা পাতা রয়েছে। পাশাপাশি দু' জোড়া বালিশ। কিন্তু সারা রাতের মধ্যে কেউ সে বিছানা স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না। নির্মলদা তাড়াতাড়ি গিয়ে এবার সেখানে শুয়ে পড়ল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলে আয়। শুয়ে পড়। এখানে এসে ঘুমো। অফ কোর্স ইফ ইউ ক্যান স্ট্যান্ড দি স্মেল।'

নির্মলদা একটু হাসল।

আমি বললাম, 'সে জন্য নয়। এখন শুলে আমার ঘুম আসবে না। তুমি ঘুমোও।'

আমি বেরিয়ে এলাম।

অর্চনা এল পিছনে পিছনে। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ।'

আমি বললাম, 'আর কি। নিশি ভোর হল। এবার বাড়ি যাই।'

'রাত জেগে চোখমুখের যা অবস্থা হয়েছে।'

বললাম, 'হ্যাঁ, কেউ দেখলে ভাল ধারণা হবে না।'

অর্চনা বলল, 'চা-টা খেয়ে যাবে না?'

'না। এখন না গেলে ফার্স্ট ট্রাম ধরতে পারব না।'

অর্চনা একটু হাসল, 'ফার্স্ট ট্রাম ধরতেই হবে এমন কোন কথা আছে নাকি?'

বললাম, 'ওই আমার এক বিলাস। সুযোগ পেলেই ফার্স্ট ট্রাম ধরি ফার্স্ট বাস ধরি। বাইরে কোথাও গেলে ফার্স্ট ট্রেন।'

অর্চনা বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ার ক্ষতিপূরণ।'

'ঠিক বলেছ।'

অর্চনা করিডোর দিয়ে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে এল।

'মাকে বলে যাবে না ?'

'না। ওঁরা হয়তো এখন ঘুমোচ্ছেন, তুমিই মাসীমাকে বলে দিয়ো। বেলা হলে আমিও টেলিফোনে খবর নেব।'

অর্চনা হঠাৎ বলল, 'আমার চাকরির কথা যেন মনে থাকে।'

হেসে বললাম, 'চাকরি ? চাকরি কি তুমি সত্যিই করতে পারবে নাকি ?'

অর্চনা বলল, 'কেন পারব না ?'

বললাম, 'তুমি কি এ বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে ?'

অর্চনা একটু হাসল, 'কেন পারব না ? চিরকালের জন্যে তো বেরোব না। রোজ বেরোব, রোজ ফিরব।'

'তুমি কি সেই অনুমতিটুকুও আদায় করতে পারবে ?'

'পারব ?'

'তোমার দেখছি বেশ আত্মবিশ্বাস আছে।'

অর্চনা হাসল, বলল, 'যৎসামান্য। তোমার দাদার মত অগাধ নয়।'

'অগাধ আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল।'

'কেন ?'

'অনেক যেতে যেতেও তবু খানিকটা থেকে যায়। ওকি তুমি আর আসছ কেন ?'

অর্চনা বলল, 'দারোয়ানকে বলে দিই। গেট খুলে দেবে।'

'কেন, আমি বললে খুলবে না ?'

'তাও খুলবে। তবু আমার বলাটাই ভাল।'

লনের পাশ দিয়ে গেটের দিকে দু'জনে এগোতে লাগলাম।

আমি বললাম, 'নির্মলদা শিগগিরই বদলে যাবে।'

'কী করে বুঝলে ? তুমি কি সম্প্রতি জ্যোতিষচর্চা ধরেছ ?'

'জ্যোতিষের ওপর আমার আস্থা নেই। কিন্তু তোমার ওপর আছে।

তুমি ওকে বদলে দেবে।'

অর্চনা বলল, 'আমার শ্বশুরেরও অবশ্য সেই ধারণা। কিন্তু কে কাকে বদলাব তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তোমাদের কি বিশ্বাস আমি একটা ওষুধ?'

'ওষুধ কেন হবে? তুমি ব্যাধির শুশ্রূষা।'

অর্চনা হাসল, 'তোমার নির্মলদা ব্যাধিগ্রস্ত এ কথা শুনলে তোমার দাদা তোমাকে খুন করে ফেলবেন।'

বললাম, 'ব্যাধিগ্রস্ত আমরা সবাই। কেউ স্বীকার করি, কেউ করি না। আবার কেউ তা নিয়ে গর্ব করি। কেউ করি না।'

অর্চনা বলল, 'তুমি কোন দলে।'

বললাম, 'কি জানি। বোধহয় দুই দলেই আছি।'

দারোয়ানের ঘরের কাছে গিয়ে অর্চনা এবার অনুচ্চ মধুর স্বরে ডাকল, 'চৌবে।'

দারোয়ান সাড়া দিয়ে বলল, 'হাঁ মাইজী।'

অর্চনা বলল, 'গেট খোল দো। সাহব বাহার যানা।'

'আচ্ছা মাইজী।'

বড় একটা চাবির তোড়া নিয়ে বিপুল গুম্ফ দারোয়ান গেটের দিকে এগিয়ে এল।

আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমি কিছুদিন ধরে ভাবছি আপনাকে আমার জীবনের কথা বলি। সবাইকে সব কথা বলা যায় না, বলতে ইচ্ছাও হয় না, ভরসাও হয় না। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয়েছে আপনাকে যদি বলি আপনি সহানুভূতির সঙ্গে আমার সব কথা শুনবেন, ঘৃণায় আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উপহাসে বিদ্ধ করবেন না। কেন আপনাকে দেখে আমার এ ভরসা হয়েছে জানেন? আপনি লেখক বলে নয়, আপনি আমাকে স্নেহ আর প্রীতির চোখে দেখেছেন বলে। আর একটি কথা আমার মনে হয়েছে। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি যে সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলে এসেছি, আপনার জীবনে আপনিও কোন না কোন সময় ওই সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। আপনি আপনার জীবনের কোন কথা আমাকে বলেননি, আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। শুধু অনুমান করেছি। আপনার লেখাগুলি কি সবই কাল্পনিক? আপনার গল্প উপন্যাসগুলির ভিতর থেকে কি আপনাকে খুঁজে বের করা যায় না?

কিন্তু এই খাতায় আমি আপনার কথা লিখতে বসিনি। আমার কথা আপনাকে শোনাতে বসেছি। শোনবার জন্যে আপনি আগ্রহ দেখিয়েছেন সেই ভরসা পেয়ে লিখছি। ভেবেছিলাম মুখেই বলব। কিন্তু মুখে কতটুকুই বা বলা যায়। কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ দেওয়া যায় মাত্র। তাছাড়া সামনাসামনি অনেক কথাই বলা যায় না। আড়ালে বসে লেখার সেই সুবিধাটুকু আছে। লজ্জা সংকোচ এসে পদে পদে বাধা দেয় না। আবার অসুবিধেও আছে। লিখতে চাইলেই তো লেখা যায় না। সেই বিদ্যাটুকু জানা থাকা চাই। আপনাদের মত ক্ষমতা কোথায় পাব। আমি আমার বন্ধুদের অজস্র চিঠি লিখেছি আর লিখেছি ডায়েরি। মনে যখন

খুব আনন্দ হয়েছে, কি সহ্য করা যায় না এমন দুঃখ কষ্টে বুক ভেঙে যেতে চেয়েছে তখন লিখেছি ডায়েরি। কিন্তু সেসব আমার কাছে নেই। পাছে সেগুলি কারো হাতে পড়ে আমি তাই সব নষ্ট করে ফেলেছি। সে ও কি কম কষ্ট? যদি জানতাম আপনার মত লেখকের সঙ্গে একদিন আমার আলাপ হবে তাহলে সেগুলি আমি যত্ন করে রেখে দিতাম, সব আপনার হাতে ধরে দিতাম। বলতাম, 'রাখতে হয় রাখুন, ফেলে দিতে হয় দিন।'

যা নষ্ট করে ফেলেছি সেগুলি তো আর ফিরে পাওয়ার উপায় নেই, তাই আমাকে আবার নতুন করে লিখতে হবে।

একবার ভেবেছিলাম ডায়েরির মত করেই লিখি। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলাম লেখা যায় না। সনগুলি মনে থাকলেও বহু তারিখই ভুলে গিয়েছি। ছোট ছোট যে সব সুখ দুঃখের স্মৃতি মণি-মুক্তোর মত দিনের পর দিন সঞ্চয় করে রেখেছিলাম সেগুলি কোথায় গেল। গয়নার বাক্সের ডালা খুলে দেখি সবই প্রায় উধাও।

অথচ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর নয়, মাত্র দশ বছর আগের ইতিহাস। তার কি দশা দেখুন। এরই মধ্যে সে যেন সুদূর প্রাগৈতিহাসিক আমলে গিয়ে ঢুকে বসে আছে। আর আমি যেন প্রত্নতাত্ত্বিকের মত মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করছি ভাঙা-মন্দিরের দেউল আর মূর্তি-গুলির ভগ্নাবশেষ; মাটির প্রদীপ আর পিলসুজ।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমার জীবনে যারা এসেছিল সত্যিই কি আমি তাদের ভুলে গিয়েছি? ভুলে যেতে পেরেছি? মাটির প্রদীপে সলতের একেকটি করে পোড়া কালো দাগ কি তারা রেখে যায়নি?

সব দাগ যদি মিলিয়ে যেত তাহলে আর এত কথা লেখার কি দরকার ছিল? তাহলে কি আপনার সময় এমন করে নষ্ট করতে যেতাম?

কোত্থেকে আরম্ভ করি তাই ভাবছি। আমি তো এমন কোন মহিয়সী মহিলা নই, কি কোনদিন হতেও পারব না যে জন্মের সন-তারিখ জন্মস্থানের ঠিকানা, বাবা-মার নাম ধাম, তাদের বৃত্তি

প্রবৃত্তির বর্ণনা দিয়ে শুরু করব। ওগুলি আপনার কোন কাজেই লাগবে না। মজা দেখুন, আমি এরই মধ্যে ধরে নিয়েছি আপনি আমার জীবনকে আপনার লেখার উপাদান করে নেবেন। না নিয়ে পারবেন না। যেন লেখার বিষয়বস্তুর আপনার অভাব আছে। যেন আমার মত আরো অনেক মেয়ে আপনাকে তাদের জীবনের কথা শোনায়নি। মনে মনে প্রতীক্ষা করে থাকেনি আপনি কবে তাদের নিয়ে লিখবেন। আপনি আপনার খুশি মত সেই সব কাহিনীর খানিকটা নিয়েছেন. বাকিটা ফেলে দিয়েছেন। কেটেছেন ছিঁড়েছেন, এর মাথার সঙ্গে ওর ধড় মিলিয়েছেন। আর আপনার মডেলরা লেখাগুলি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে, 'কোথায় আমি কোথায় আমি ?'

আমাকে নিয়ে অমন লেখা আপনাকে লিখতে হবে না। লেখকের মডেল হওয়ার চেয়ে ফেটোগ্রাফারের মডেল হওয়া ভাল। আর্টিস্টের, কুমারের, ভাস্করের মডেল হওয়ায় লাভ আছে। তাতে নিজের চেহারার সবখানি দেখা যায়। আয়নায় যেমন নিজের মুখ দেখে চিনতে পারি, আয়নার মতই স্বচ্ছ জলে যেমন নিজের ছায়া চিনতে পারি তেমনি নিজের পোর্ট্রেট দেখে নিঃসংশয় হতে পারি এই আমি।

কিন্তু আপনারা লেখকরা তো ওই ভাবে আমাদের ঠিক চিনিয়ে দেন না। আমার প্রিয়তম উপন্যাসের নায়িকার সঙ্গেও নিজেকে মেলাতে গিয়ে দেখেছি সবখানি মেলে না। তার খানিকটা আমি, খানিকটা না-আমি। তবু কেন ভাল লাগে ? আমি নিজেও তো তাই। খানিকটা আমি অনেকখানিই আমি না। আমি যা হয়েছি তা আর কতটুকু। যা হইনি হতে পারিনি, যা করিনি যা করতে পারিনি তার পরিমাণ যে অনেক বেশি। জলের ওপরে দেউলের যে অংশটুকু আছে তা সামান্য, বেশির ভাগই তলিয়ে আছে জলের নিচে। দেখা যায় না, তাই বোঝাও যায় না। তা বলে কি তার অস্তিত্ব নেই ?

আপনাকে গোপন করব না, পরমাসুন্দরী না হয়েও আমি দু-একজন আর্টিস্টের মডেল হতে পেরেছি। তাঁরা স্বেচ্ছায় আমার

ছবি এঁকেছেন, মূর্তি গড়ে দিয়েছেন। তবু কেন আপনার গড়া বাণীমূর্তির দিকে আমার লোভ? লোভ এই জন্যে যে আপনি শুধু আমার মুখই আঁকবেন না, মুখে কথাও বসিয়ে দেবেন। সে কথা আমার গভীর অন্তরের কথা। আমি যা বলতে পেরেছি শুধু তাই নয়, যা বলতে পারিনি, তাও। আপনি শুধু আমার অঙ্গে একটি ভঙ্গিকে তুলে ধরবেন না, আমার মুখে একটি মাত্র মুডকে প্রতিফলিত করবেন না, আমার চোখের তারায় একটিমাত্র তৃষিত দৃষ্টি এঁকে দেবেন না, আপনি আমার গোটা জীবনকেই আপনার লেখার মধ্যে ধরে দেবেন।

আপনি হয়তো মনে মনে ফের হাসতে শুরু করেছেন। ভাবছেন, কি স্পর্ধা মেয়েটির। ওর আবার একটা জীবন, তার গোটা আর আধখানা!

আপনাকে অসামান্য গৌরবের, উচ্চস্তরের এক মহৎ জীবন কাহিনী উপহার দিতে পারব না। তা যদি হত লেখকেরা নিজেরাই কলম নিয়ে ছুটে আসতেন আমার কাছে। আমাকে বলতেও হত না। তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ধূলিমলিন কলঙ্কে বিলীন জীবন বলেই তো আপনাকে এত সাধাসাধি। শুনেছি গুণীর হাতে ধূলোমুঠিও সোনামুঠি হয়ে ওঠে, আপনি কি তাহলে তত বড় গুণী নন?

আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে আর ভাব করতে করতে আমি আমার কথা নিয়ে এগোতে থাকি। জানিনে কতটুকু এগোতে পারব। যদি দেখি শ্রোতা অন্যমনস্ক, সঙ্গে সঙ্গে বলব আমার কথাটি ফুরলো। যখনই বুঝব বলবার আর ইচ্ছা নেই তখন তো নটেগাছটি আপনা থেকেই মুড়িয়ে যাবে। যতদূর মনে হচ্ছে আপনাকে বেশিক্ষণ জ্বালাব না, জ্বালাতে পারব না। আপনি তেমন দাহ্য-পদার্থ নন।

কি আবোল তাবোলই না বকে যাচ্ছি। কেন বকছি জানেন? আসলে হাঁতড়ে বেড়াচ্ছি কোত্থেকে শুরু করব। কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। এই খুঁতখুঁতে ভাবটা যেমন পরের বেলায় তেমনি নিজের বেলায়। আমার স্বভাবে এ একটা মস্তবড় খুঁৎ। হয়তো ছেলেবেলা

থেকে বাবা মার কাছ থেকে অতিরিক্ত আদর আহ্লাদ পেয়ে পেয়েই আমি এমন হয়েছি। কি মজা, নিজের দোষত্রুটির বোঝা আমরা হেরিডিটি আর এনভিরনমেণ্টের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে যেতে পারি। আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা আর তাঁদের মা ঠাকুমারা যেমন অদৃষ্টের ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা পেতেন।
বাবা মার প্রশ্রয় পেয়েছিলাম ঠিকই। পাব না কেন বলুন? আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। এসেছিও বেশ দেরিতে। আসব এমন আশা যখন তাঁরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তখনই আমি এসে দুজনের কোল জুড়ে বসলাম। তাঁদের মন যতই আধুনিক হোক, ছেলে হলে অবশ্য তাঁরা আরো বেশি খুশি হতেন। শুধু আমাদের দেশে কেন, সব দেশে সব সমাজেই আজও ছেলের কদর বেশি। কিন্তু যাঁদের কিছু হয়নি, আর কিছু হলও না, মেয়ে তাঁদের কাছে ফেলনা হবে কি করে?
তাই সেই শিশুবয়েস থেকে জামা জুতো খেলনা আমি প্রচুর পরিমাণে পেতাম। ফেলতাম ছড়াতাম ভাঙতাম হারাতাম। আবার সেগুলি নতুন করে আসত। কিছুতেই আমার মন উঠত না। একটা পেতে না পেতেই অন্য হাত বাড়িয়ে বলতাম—'আর এত্তা।' এসব কথা বড় হয়ে মার মুখে শুনেছি। আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, যে জগতে আমার বাস আমি তার অধিশ্বরী। আমাকে ছাড়া আমার মারও চলে না, বাবারও চলে না। সব আদর আহ্লাদ আমারই প্রাপ্য। সব সুখভোগে আমি অধিকার নিয়ে জন্মেছি। বিন্দুমাত্র অনাদর অবহেলা আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমার দারুণ রাগ হত অভিমান হত। ওসব যেন আমার পাওয়ার কথা নয়।
মা আমাকে খুব ভালবাসতেন। তবু কখনো-সখনো যদি আমার চোখে পড়ত বাবা মাকে আদর করছেন আমার ভারি হিংসা হত। শিশুবয়সেই আমি নাকি আবদার করতাম আমাকেও ভাল ভাল শাড়ি এনে দিতে হবে, গয়না দিতে হবে, আর আমাকেও 'ওগো শুনছ' বলে ডাকতে হবে। বাবা অবশ্য মাকে নাম ধরেই ডাকতেন। কখনো-সখনো কৌতুকের ভঙ্গিতে বলতেন, 'ওগো শুনছ?'

ওই একান্ত সম্বোধনটুকু সেই বয়সেই আমার ভারি মধুর লাগত। ওই শব্দ দুটির মধ্যে যে বিশেষ একটু ব্যঞ্জনা আছে তা যেন আমি তখন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম।

বাবা হেসে বলতেন, 'দাঁড়া, তোকে ওগো শুনছ বলবার লোক শিগগিরই এনে দেব।'

মা বলতেন, 'রাক্ষুসি তুই যে আমাকে এত হিংসে করিস, তুই কি আমার সতীনের মেয়ে?'

সতীন কথাটার অর্থ তখন বুঝতাম না। পরে বুঝেছি। মেয়েদের প্রকাশ্য সতীন অবশ্য আমাদের আমলে আর নেই, আমাদের মা মাসীমাদের আমলেও ছিল না। তবু তাদের পরোক্ষ অস্তিত্ব কি দূর হয়েছে?

আমি মায়ের সতীনের মেয়ে নই। কিন্তু আমাকে আর মাকে যে পাশাপাশি দেখত সে-ই অবাক হয়ে যেত। ভাবত, সত্যিই বুঝি আমি আর কারো পেটে হয়েছি। মা দেখতে ছিলেন কালো মোটা। তেমন লম্বাও ছিলেন না। আমি যে দেখতে কেমন তা আপনি দেখেছেন। তবু আমার কৈশোরের, প্রথম যৌবনের চেহারা তো আপনি দেখেননি। দেখলে কি হত? কি হত তা বলা যায় না। খুব অহঙ্কারের মত শোনাচ্ছে, তাই না? যার আর কিছু নেই, সে যদি নিজের রূপটুকু নিয়েও গর্ব না করে তো কি করবে? গর্ব করবার মত কিছু না কিছু তো সবারই থাকা চাই।

আমার বাবা মোটামুটি সুপুরুষ ছিলেন। আমি তাঁর দৈর্ঘ্য, রঙ, মুখের গড়নের খানিকটা পেয়েছি, আর বাকি সব আমার নিজের। তা কারো কাছে পাওয়া নয়। বলুন, ভাবতে কি ভাল লাগে না, রূপ গুণের কিছু কিছু অংশ, দোষ গুণের কিছু কিছু অংশ একান্তই আমার স্বোপার্জ্জিত; আমি তার জন্যে কারো কাছে ঋণী নয়।

ছেলেবেলা থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম বাবা যে আমাকে মার চেয়ে বেশি ভালবাসেন তা আমি ওই—দেখতে ভাল বলে। বাবার বন্ধুরাও যে আমাকে ভালবাসেন, কাছে ডেকে আদর করেন, সহজে কাছ-ছাড়া করতে চান না, তার কারণও ওই—দেখতে ভাল বলে।

তাঁদের চোখের ভাল-লাগা দেখতে দেখতে আমার কেমন যেন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আমার আর কিছু হওয়ার দরকার নেই। আমি যে আছি আমি যা আছি তাই যথেষ্ট।

ভাগ্যে এই ছেলেমানুষি অহঙ্কার আমার বেশিদিন থাকেনি। থাকলে লেখাপড়া যেটুকু শিখেছি তা শিখতে পারতাম না।

আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার, মা-ও এম. এ. পাশ মহিলা ছিলেন। কলেজ ছাড়ার সঙ্গেই সঙ্গেই পড়াশোনার চর্চা তিনি ছেড়ে দেননি। আদর আহ্লাদ তাঁরা আমাকে যতই দিন না, আমার লেখাপড়ার দিকে তাঁদের নজর ছিল কড়া। সেখানে ফাঁকি দেবার পথ ছিল না। পাঠ্যবইয়ের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে রাশ রাশ অপাঠ্য বই পড়তাম। সব কি আর তখন বুঝতে পারতাম? কিন্তু একটি অজানা জগৎ অপরূপ রহস্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে তা অনুভব করতাম। তখন বিচার বুদ্ধি প্রায় কিছুই ছিল না। যা পড়তাম তাই ভাল লাগত। প্রতিটি ছাপার অক্ষর আমার কাছে ছিল রসক্ষরা। অখ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের উল্লেখের অযোগ্য বইও আমি সাগ্রহে পড়তাম আর সেই রচনা থেকে অপার্থিব আনন্দ আহরণ করতাম। সেই অবুঝ অনভিজ্ঞা পাঠিকা আর বিস্ময়ের আনন্দের সেই অফুরন্ত রসভাণ্ডার কিছুই আজ আর নেই। শুধু তার স্বাদটুকু লেগে আছে। আমি এখনও মাঝে মাঝে সেই বাল্যের কৈশোরের দিনগুলিকে চেখে চেখে উপভোগ করি। কেন এমন হয় বলুন তো? কেন ছেলেবেলার স্মৃতি আমাদের কাছে এমন অবিমিশ্র মধুর বলে মনে হয়। যেন সেই অধ্যায় কটির প্রতিটি পংক্তি সোনার জলে লেখা। অথচ তা তো সত্যি নয়। সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে যথেষ্ট দুঃখ ছিল, বাবা মার শাসনের ভয় ছিল, ইচ্ছামত চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল না। মিশনারি স্কুলের নিয়মকানুনের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকা, একটু দুষ্টুমি কি দুরন্তপনা করলেই হেডমিস্ট্রেসের শাস্তির ভয়। ক্লাসের সব মেয়ের সঙ্গেই তো আর বন্ধুত্ব ছিল না। আবার সব বন্ধুত্বই যে অবিচ্ছেদ্য ছিল তাও না। কত ভাব আর আড়ি, হয়তো সামান্য একটা পেনসিলের টুকরো নিয়ে ঝগড়া, পরম বন্ধুর সঙ্গেও কত মারামারি, চুলোচুলি,

কথা বন্ধের পালা চলেছে দিনের পর দিন। একটু ভাবলেই সেই সুখস্বর্গে দুঃখকষ্টের তালিকা আরো কত বাড়িয়ে তুলতে পারি। কিন্তু সব যেন ভেবে ভেবে মনে আনতে হয়। যা সহজে মনে পড়ে তা আনন্দ উল্লাসে উৎসবে ঝলমল জীবনের একটি অখণ্ড অধ্যায়। কেন এমন হয় বলুন তো? গোল্ডেন পাস্ট, যা অতীত, তাকেই কি আমরা এমন করে সোনার পাতে মুড়ে রাখি? আমি যখন বুড়ো হব তখন এই বিচিত্র স্বাদের যৌবনকালও কি আগাগোড়া মধুময় বলে মনে হবে? যত তিক্ততা কটুতা সব সেই অপার মধুসমুদ্রে লীন হয়ে যাবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা থাক। এখন তো সবই মনে আছে। সুখ দুঃখ হর্ষবিষাদ ন্যায় অন্যায় সব যেন আলাদা আলাদা খোপে সাজানো। কিছুই ভুলিনি। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

আমাকে অল্পবয়সে নাটক নভেল পড়তে দেওয়া উচিত কিনা এই নিয়ে বাবা মার মধ্যে প্রথম প্রথম বেশ মতভেদ হত।

বাবা বলতেন, 'পড়ুক না। সব পড়লেই সব তো আর বুঝতে পারবে না।'

মা বলতেন, 'যেটুকু বুঝবে তাই কি কম নাকি? তাতে ওর আরো বোঝবার জন্য লোভ বেড়ে যাবে। আর একটু বয়স হোক, তখন সব পড়বে। জানবার বুঝবার কিছুই তখন বাকি থাকবে না। তোমার মেয়ে অমনিতেই পাকা। যেন পেট থেকে বুড়ি হয়ে জন্মেছে। তার পরে যদি যত রাজ্যের বাজে নভেল ওকে পড়তে দাও তাহলে ও আর কিছু বাকি রাখবে না।'

বাবা হেসে বলতেন, 'মিলি, মেয়ে নিয়ে তোমার যে রকম দুর্ভাবনা দেখছি, তাতে ওকে অষ্টম বর্ষে গৌরী দান করে ফেললেই হত। একেবারে ল্যাঠা চুকে যেত।'

মায়ের নামটা একটু বুড়োটে ধরনের ছিল—প্রমীলা। বাবা আদর করে ডাকতেন মিলি। আমার নাম তো আপনি জানেনই, আরো বুড়োটে। সেই সেকেলে—কল্যাণী। ঠাকুরমার রাখা সেই সেকেলে বস্তাপচা নাম, কল্যাণী। কতবার আমি নামটা বদলাবার চেষ্টা

করেছি। কিন্তু আমার মাতৃভক্ত বাবা কিছুতেই বদলাতে দেননি। আপনাকে বলতে বাধা নেই, আরো অনেক ভাল ভাল নাম কারো কারো কাছে থেকে আমি উপহার পেয়েছি। কিন্তু সেগুলি বাইরে ব্যবহার করবার মত নয়। আমার সরকারী নাম ওই একটিই— কল্যাণী। আজ ভাবছি, নামটা কি আমাকে সত্যিই মানায়?
প্রথম প্রথম বাবার বন্ধুদের সঙ্গেই আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁরা আমাকে আদর করতেন, আমার খুব সুখ্যাতি করতেন। আমার মত মেয়ে নাকি আর হয় না। আমি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।
মা হেসে বলতেন, 'ওকে আর অমন ফুলোবেন না। এমনিতেই মেয়ের পা মাটিতে পড়ে না, এরপর ওকে আর আকাশ থেকে নামানো যাবে না।'
নিজের সুখ্যাতি আমি যত শুনতাম তত ভাল লাগত। স্তবস্তুতিতে কে-ই বা বিমুখ হয় বলুন। খুব প্রিয় খাদ্যও বেশি খেলে আর খাওয়া যায় না। কিন্তু স্তবই বলুন, আর স্তাবকই বলুন, তাতে কখনও কি কারো অরুচি হয়েছে?
ছেলেবেলা থেকে বাবাও আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। সব কথা আমাকে বলতেন, তাঁর সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। আমার বুঝবার উপযোগী করে বলতেন।
মনে আছে আমার যখন এগারো বারো বছর বয়স, তখনই আমি বাবাকে বলেছিলাম, 'বাবা, তোমাদের ভালবাসার গল্প বল।'
বাবা আবাক হয়ে বলেছিলেন, তার মানে?
'তুমি তো মাকে ভালবেসে বিয়ে করেছ?'
বাবা হতবাক। একটু নীরব থেকে হেসে বলেছিলেন, 'তুই কি করে জানলি? কে বলেছে তোকে?'
'বলবে আবার কে? তুমি কায়েত, মা বামুনের মেয়ে। ভালবাসা ছাড়া এমন বিয়ে হয় নাকি?'
বাবা মাকে ডেকে বলেছিলেন, 'কথা শোন মিলি, নিশ্চই তোমার মা এই সব কাণ্ড করেছেন।'
মা বলেছিলেন, শুধু 'শুধু আমার মাকে কেন দোষ দিচ্ছ, তোমার

মেয়ের অসাধ্য কোন কাজ আছে নাকি ? ও যখনই সুযোগ পায়, আমার বাক্স দেরাজ ঘাঁটাঘাটি করে। যত পুরনো চিঠি-পত্র, ডায়েরি-টায়রি সব খুলে খুলে পড়বে।'

দিদিমার কাছে অবশ্য কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু আমি তা স্বীকার করলাম না। দিদিমা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। মার চিঠিপত্রগুলির ওপরও সত্যি আমার খুব লোভ ছিল। সেগুলি যেন এক নিষিদ্ধ উপন্যাসের ছেঁড়া পাতা। তাতে রহস্যের অন্ত নেই। আমি যে বাবা মাকে চোখের সামনে দেখি, যাঁদের আলাপ নিতান্তই ঘর-গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি কথায় ভরা, তাঁরা যেন সেই চিঠির পাতার ডায়েরি খাতার মানুষ নন। সেই দুটি তরুণ তরুণী সম্পূর্ণ আলাদা। তারা রূপকথার রাজপুত্র আর রাজকন্যা। তাদের খাওয়া পরার ভাবনা নেই। খাওয়া পরার কথা তারা মুখেও আনে না। তারা চাঁদের আলো আর ফুলের গন্ধে বাঁচে। আর বাঁচে নিজেদের ভালবাসার মধ্যে। তাদের একমাত্র দুঃখ বিরহের দুঃখ। পলকের অদর্শনে তাদের প্রলয় হয়। ভালবাসার কথা ছাড়া তাদের মুখে আর কোন ভাষা নেই। পরস্পরকে কাছে পাওয়া ছাড়া তাদের জীবনে দ্বিতীয় কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই।

এত স্পষ্ট করে তখন যে সব ভাবতে পারতাম তা নয়, কিন্তু একটা আবছা রোমাণ্টিক ভাবরাজ্যে আমি তখন থেকেই বাস করতে শুরু করেছিলাম। আপনাকে সঙ্গোপনে বলি, তারপর জীবনে কত কাণ্ড-কারখানাই তো ঘটল, কিন্তু আজও সেই রাজ্য থেকে আমি একেবারে নির্বাসিত হইনি। বরং আমার একটি সত্তা সেই কৈশোরের মধ্যেই চিরকাল বাসা বেঁধে রয়েছে।

আমার মন সেই তরুণ তরুণীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়। কখনো তারা আমার বাবা মা, যাঁরা প্রথম প্রেমে পড়েছেন, কখনো বা অন্য কোন তরুণ তরুণী। আর উপন্যাসগুলির নায়ক নায়িকারা তো আছেই। আমি যখন যে উপন্যাস পড়ি তখন লেখকের গড়া সেই জগতে বাস করি। আর নায়িকার সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে যাই। আমাদের বাস্তব জগতের ছোট সংসার আমার কাছে কেমন যেন এক-ঘেয়ে লাগে। সেখানকার কথাবার্তা চালচলন কেমন যেন স্থূল আর

নীরস মনে হয়। যত রস বৈচিত্র্য সব যেন বইয়ের জগতে স্থান নিয়েছে।

সিকদারবাগানে পুরনো একটা ভাড়াটে বাড়িতে আমরা অনেকদিন ছিলাম। ষোল সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই কেটেছে। বাড়িটা এমন কিছু ভাল ছিল না। সরু গলির মধ্যে। আমার কিন্তু এই ছোট বাড়িটা ভারি ভাল লাগত।

একতলা দোতলায় মিলিয়ে খানচারেক ঘর। প্রথম প্রথম আমি মার কাছেই শুতাম। একটু বড় হওয়ার পর ওদের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানা পুরোপুরি আমার দখলে এল। আমার সে কি আনন্দ। যেন পুরো একটা রাজ্যের আমি অধিশ্বরী হয়েছি। সেই ঘর আমার পড়বার, শোবার, সাজবার, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবার। এই ঘর একান্ত আমার। মা যদি গেরস্থালীর কোন জিনিস এ ঘরে রাখতে আসতেন আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতাম, 'ওগুলো আবার এখানে এনেছ কেন? ওসব বাক্স ডেস্ক এখানে রাখা চলবে না। যা ওদের চেহারা। বিশ্রী বাজে দেখতে।'

মা বলতেন, 'ও মা, দরকারী জিনিস, কাজের জিনিসের আবার চেহারা কি। মেয়ের কেবল রূপের বিচার। নিজে দেখতে ফর্সা বলে মেয়ের মাটিতে পা পড়ে না। দেব একটা কালো কুচ্ছিৎ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তখন বুঝবি মজা।'

আমি হেসে জবাব দিতাম, 'ঈস, দিলেই হল। দুদিন বাদেই আমি তাকে ডিভোর্স করে দেব না। আচ্ছা মা, বাবা তোমাকে কি দেখে পছন্দ করেছিলেন?'

মা বলতেন, 'সে তোর বাবাকেই জিজ্ঞেস করিস।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে গাল লাগিয়ে বলতাম, 'মা, রাগ করলে?'

মা হেসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, 'দূর পাগলি।'

নিজের শরীরের দিকে মায়ের তেমন যত্ন ছিল না। সাজসজ্জায় তিনি যেন খানিকটা উদাসীনই ছিলেন। কিন্তু আমি ছিলাম যেন তাঁর দ্বিতীয় সত্তা, নতুন দেহ। আমার শরীরের যত্নে তাঁর একটুও

অমনোযোগ ছিল না। আমাকে সাজিয়ে তিনি পরম আনন্দ পেতেন। আমি বলতাম, 'মা, তুমি তো সাজসজ্জা মোটেই পছন্দ কর না। রঙীন শাড়ি-টাড়ি পরতেই চাও না। তাহলে আমার সাজসজ্জার দিকে তোমার অত নজর কেন?

মা হেসে বলতেন, 'আমার বয়স আর তোর বয়স। তাছাড়া সাজলে তোকে মানায়। আমাকে কি আর মানায়? কোনদিনই মানাত না।'

বাবা কি জন্যে তাঁকে পছন্দ করেছিলেন তা আমি ততদিনে জেনে ফেলেছি। মায়ের গুণের জন্যে। মা ছিলেন বাবার সব কাজে সহকারিণী। কখনো মার মুখে রূঢ় কথা শুনিনি। তাঁকে মেজাজ খারাপ করতেও খুব কমই দেখেছি। প্রথম জীবনে ওঁরা দুজনে ছিলেন একই রাজনৈতিক দলের কর্মী। সাম্যবাদে বিশ্বাসী। একই সঙ্গে জেল খেটেছেন আত্মগোপন করে থেকেছেন মাসের পর মাস। সেই সূত্রে ওঁদের আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব প্রণয় আর পরিণয়। এমন বিয়ে সেই সময় ওঁদের দলে আরো অনেকে করেছিলেন। কত বিয়ে বিচ্ছেদে শেষ হয়েছে। কিন্তু ওঁরা রয়েছেন অবিচ্ছিন্ন। পার্বতী মহেশ্বরের মতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক।

তারপর ওঁরা অবশ্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। দলের নেতাদের সঙ্গে কি নিয়ে যেন মতের অমিল হয়েছিল।

ওঁদের বন্ধুরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, 'তোমরা তো প্রেমে পড়বার জন্যে আর বিয়ে করবার জন্যেই দলে ঢুকে ছিলে। কাজ হাসিল হয়েছে অমনি দল ছেড়ে দিয়েছ।'

বাবা সম্পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন তাঁর প্রাকটিসে। ডিসপেনসারি করলেন, নার্সিং হোম করলেন। বাড়িতে তিনি কম সময়ই থাকেন। ডাক্তার হিসেবে তাঁর নাম যশ হল, অর্থও আসতে লাগল। যদিও অর্থের দিকে তাঁর তেমন একটা স্পৃহা ছিল না। নিজের বাবা বলে বলছিনে, অবনী ডাক্তার যে কত গরীব রোগীকে বিনা ফীতে কি নামমাত্র ফী নিয়ে চিকিৎসা করেছেন তার ঠিক নেই। দলের লোকদের তিনি তো উপকার করতেনই, অন্যদলের লোকরাও কিছু

চাইলে তিনি তাদের বিমুখ করতেন না। কেউ কিছু বললে জবাব দিতেন, 'রোগীর আবার জাতিধর্ম আছে নাকি ?'

বাবার এই বদান্যতার জন্যে তাঁর হাতে নগদ টাকা তেমন জমত না। তবে খেয়ে পরে সচ্ছল ভাবেই আমাদের দিন কেটেছে।

তবে ছেলেবেলায় যখন বাবার সেই দুঃসাসিক জীবনের গল্প শুনতাম আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম, কখনো পুলিশের তাড়া খাচ্ছেন, পায়ে গুলি লেগেছে, কখনও নিজেরাও রুখে দাঁড়িয়েছেন, সরাসরি সংঘর্ষ। সেই বেপরোয়া জীবনের সঙ্গে রোগীদের নাড়ী টেপা আর প্রেশক্রিপসন লেখা এই নিরীহ ডাক্তারের সাধারণ গৃহস্থের জীবনের কি কোন তুলনা হয় ? এর মধ্যে সংগ্রাম সংঘর্ষ কোথায়, বীরত্ব পৌরুষ কোথায় ? একথা আমার মনে হত। তারপর অবশ্য ভিন্ন ক্ষেত্রে বাবার অন্য ধরনের পৌরুষকেও আমি বুঝতে আর শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম।

আমাদের একতলার বসবার ঘরে অনেক লোকের ভিড় হত। রোগীরাও আসতেন, যাঁদের রোগ ব্যাধি নেই তাঁরাও আসতেন। নির্ভেজাল রাজনীতি ছাড়া যাঁরা কিছু জানেন না, তাঁদেরও যেমন আনাগোনা ছিল, আবার বিদগ্ধ সাহিত্য শিল্প ছাড়া যাঁদের আর কিছুতে রুচি নেই, তাঁদেরও কেউ কেউ তেমনি আসা যাওয়া করতেন। দ্বিতীয় দফতর ছিল আমার মায়ের। সাহিত্যে অনুরাগী মায়ের ওই ধরণের দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিল। আপনি শুনে হাসবেন, অল্পবয়সে বয়স্ক লোকদের ওপর আমার কেমন একটা পক্ষপাত ছিল। ওই বয়সের মানুষ ধীর স্থির বিদ্বান বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন বলে আমি ভাবতাম। তখন বৃহতের দিকে আমার ঝোঁক। ছোটখাটোতে মন উঠত না। আমি ভাবতাম আমার বরও হবে একজন বড়-সড় ব্যক্তি।

কিন্তু আমার রুচি পরিবর্তনে দেরি হল না, কিছুদিনের মধ্যেই আমি আর একজনকে দেখলাম। সে আমার বাবার বয়সী নয় মার বয়সীও নয়, বলতে গেলে আমার সমবয়সী। আমার চেয়ে পাঁচ ছ' বছরের মাত্র বড়। আমার চেয়ে যাঁরা বয়সে তিন গুণ বড়, সেই গুণান্বিতদের সঙ্গেই এতদিন আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের কারো

কারো কাছে চিঠি লিখতাম, ফোনে আলাপ করতাম, সাক্ষাতে আমার পড়া গল্প উপন্যাস নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতাম, তাঁদের মতের বিরুদ্ধতা করতে আমার দারুণ উৎসাহ ছিল। তাঁদের কেউ কেউ হেসে আমার সব দোষ ক্ষমা করতেন, আমার চাপল্যকে স্নেহসিক্ত করতেন, আমার ঔদ্ধত্য অসহিষ্ণুতাকেও প্রশ্রয় দিতেন। হয়তো ভাবতেন অমৃতং বালভাষিতম্। তাঁদের মত বন্ধু আর আমি পাব না।

কিন্তু সেবার পুরীতে বেড়াতে গিয়ে আমি যে নতুন বন্ধুকে পেলাম তার মুখ আমাকে আর সব প্রবীণ বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিল।

সে কলকাতারই ছেলে। কিন্তু আলাপ হল বাইরে গিয়ে। পুরীর সমুদ্রের ধারে। আপনি হাসছেন? সেই চিরচেনা জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্রে। আমার প্রথম প্রেমের পটভূমি হিসেবে অভিনব কোন স্থানের নাম আপনাকে শোনাতে পারলাম না। সেই পুরাতন পুরী—যেখানে টিবি রোগীরা হাওয়া বদলাতে যায়—অন্তত আগে খুবই যেত, রথের সময় এখনও হাজার হাজার যাত্রীর ভিড় হয়। লোক গিজগিজ করে। বড় নোংরা শহর। শুধু একটি মাত্র সম্পদ আছে ওর—সমুদ্র। সেই সমুদ্রের তুলনা হয় না। আর ওই সমুদ্রের জন্যেই পুরনো হয় না। আমি বারতিনেক গিয়েছি। আপনি যদি আমাকে বলেন, আরো একবার চল, আমি আবারও যাব।

তবে পুরী যদি আপনার পছন্দ না হয়, আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের প্রথম আলাপের পটভূমি হিসেবে অন্য কোন জায়গাও বেছে নিতে পারেন। শুধু একটি অনুরোধ, সেখানে যেন সমুদ্র থাকে। কিন্তু পুরীর মত অমন উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র আপনি এদেশে আর কোথায় পাবেন? অমন সুন্দর আর ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ?

প্রতি বছরই আমরা অন্তত একবার করে বেরোতাম। বাবার যে খুব বেরোবার আগ্রহ ছিল তা নয়, তিনি তাঁর রোগীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, দরকার হলে তাদের বায়ু পরিবর্তনের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু নিজে কিছুতেই বেড়াতে যেতে চাইতেন না।

বলতেন, 'আমার ওসবে দরকার নেই।'
মা বলতেন, 'তোমার না থাক, আমাদের আছে। বছরে কটা দিনও কি তোমার এই একঘেয়ে ঘর-সংসারের কাজ থেকে ছুটি পাব না? দিনের পর দিন একই জায়গায় থেকে আমার দম আটকে আসে।'
আসলে বাবার জন্যেই মা নিজের অসুবিধার কথাটা তুলতেন। নইলে তো ওঁকে বের করা যাবে না। বাবা দিনরাত খাটেন, একটুও বিশ্রাম করেন না, নিজের শরীরের দিকে তাকান না; এই নিয়ে মার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। তাই ছলে বলে যেভাবেই হোক তিনি বছরে একবার করে বাইরে বেরোবার ব্যবস্থা করতেন। বাবা মার সঙ্গে আমি নানা জায়গায় বেড়িয়েছি। পাহাড় পর্বত সমুদ্র সৈকত কোথাও কিছু দেখতে বাকি নেই। তার পরেও দেশভ্রমণের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু সেসব পরের কথা।
সেবার আমরা ভেবেছিলাম নৈনিতালে যাব। আমি আর মা দুজনে মিলে সেই পরামর্শই করেছিলাম। কিন্তু বাবা সব ভেস্তে দিলেন। তিনি বললেন, 'না, এবার আর দূরে যাওয়া চলবে না। এখানে আমার কাজ আছে। তার চেয়ে চল, হপ্তা খানেকের জন্যে পুরী থেকে ঘুরে আসা যাক। কাছেও হবে, দরকার হলে তোমাদের ওখানে রেখে আমি একদিন এসে নার্সিং হোমটার খোঁজও নিয়ে যেতে পারব।'
মা বললেন, 'নার্সিং হোমই এখন তোমার জপমালা। আমরা পরস্য পর।'
প্রথমটায় পুরী যাওয়ার প্রস্তাবে আমিও ভ্রূ কুঁচকে ছিলাম। কিন্তু পরে বাবার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। তার জন্যেই ওর সঙ্গে দেখা হল আমার। আলাপ হল তার সঙ্গে। সেই দেখাকে সৌভাগ্য বলব না কি দুর্ভাগ্য বলব আমি নিজেই ভেবে পাচ্ছিনে।
কলকাতায় বাবার যত বন্ধুবান্ধবই থাকুক বেড়াবার সময় আমরা প্রায় নির্বান্ধব হয়েই বেরোতাম। কাউকে সঙ্গে নেওয়ার কথায় বাবা বলতেন, 'দূর অত দলবল ভাল লাগে না।'
যিনি এক সময় দল ছাড়া চলতে জানতেন না, তিনি আজকাল দলের বাইরে থাকাই বেশি পছন্দ করেন।

বাবা বলতেন, 'সারাদিন তো ভিড়ের মধ্যেই কাটে, বাইরেও যদি সেই ভিড় নিয়ে বেরোই তাহলে আর বেরনো কেন।'
দু'জন একজন আত্মীয় স্বজন সঙ্গে থাকলে যে ভিড় হয় না, সে কথা বাবাকে বোঝাতে পারতাম না।
আমি মাকে বলতাম, 'মা, তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলবার জন্যেই বাবা বাইরে বেরোন। এইজন্যেই তিনি কাউকে সহ্য করতে পারেন না। নিতান্তই আমি তোমাদের মধ্যে এসে পড়েছি বলে আমাকে সহ্য করতেই হয়। যদি পারতে আমাকেও বোধ হয় তোমরা বাদ দিতে।'
মা শাসনের ভঙ্গিতে বলতেন, 'আচ্ছা ফাজিল হয়েছিস। পাকা বুড়ি।'
বাবা যখন কলকাতায় থাকেন নিজের কাজকর্মে মগ্ন হয়ে থাকেন। রোগী হাসপাতাল আর নার্সিং হোম ছাড়া তিনি তখন আর কিচ্ছু জানেন না। সংসারের সমস্ত কাজের ভার থাকে মার ওপর। আর ছোটখাটো ব্যাপারে আমিও মাকে সাধ্যমত সাহায্য করি। কিন্তু বাইরে বেরোলে বাবার আর এক চেহারা। যে একটা মাস আমরা বাইরে থাকি, বাবা একেবারে সংসারের ভিতরে ঢুকে পড়েন। তখন তো তাঁর আর রোগ-টোগী কিছু থাকে না, তিনি তখন নিজের হাতে বাজার করেন, রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করেন। নিজেও মার সঙ্গে কখনও কখনও রাঁধতে বসে যান। হোটেল-টোটেলে ওঠা বাবার তেমন পছন্দ নয়। তার চেয়ে বাসা-ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী সংসার পাততে তিনি বেশি আনন্দ পান।
পুরীতে গিয়েও বাবা একটি বাড়ি ভাড়া করলেন। ভাড়া করলেন বললে ভুল বলা হবে, বাবার এক পুরনো রোগী ছিলেন, দীনবন্ধু পাল। তাঁর একটা বাড়ি আছে স্বর্গদ্বারে। পাল মশাই বললেন, 'আমার বাড়ি তো খালি পড়ে আছে। আপনি সেখানে গিয়ে থাকুন ডাক্তারবাবু।'
বাবা বললেন, 'থাকতে পারি। কিন্তু আপনাকে ভাড়া নিতে হবে।'
পালমশাই বললেন, 'সে দেখা যাবে। আগে বাস করে আসুন তো।'
বাবা আমাদের বললেন, 'ভাড়া যদি উনি না নেন তাহলে আমিও

ভিজিটের টাকা নেব না, ওষুধের দামও ছেড়ে দেব।'

দেখে শুনে বাড়িটি মার খুব পছন্দ হল। ছোট একতলা বাড়ি। সমুদ্রের ঠিক ধারে নয়, তবে বেশ নিরিবিলি। সামনে কয়েকটি ঝাউগাছের চারা। ভিতরে উঠোন। তাতে বড় একটি পাতকুয়ো। আমার সবচেয়ে ভাল লাগল বাড়ির ছাদটি। সেই ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের খানিকটা দেখা যায়। বহুদূর থেকে ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে এপারে ভেঙে পড়ছে। ছাদ থেকে শুধু মধ্য সমুদ্র চোখে পড়ত। তার আদিও দেখতে পেতাম না, অন্তও দেখতে পেতাম না। কিন্তু রাত্রে ছাদে শুয়ে শুয়ে সমুদ্রের যে শব্দ শুনতে পেতাম তার মধ্যে যেন কোন অপূর্ণতা ছিল না। সেই শব্দের ভিতর দিয়ে সমুদ্র যেন আমার কাছে আরো বেশি করে ধরা দিত।

তারপর সেই সমুদ্রতীরেই তার সঙ্গে আমার আলাপ হল। তার নামটা কি আপনাকে বলব? প্রথমে ভেবেছিলাম তার আসল নামটা গোপন রেখে যে কোন একটা নাম বসিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু আমার সেই প্রিয় নামটির বদলে কত যে নাম ভাবলাম কিছুতেই পছন্দ হল না। আপনারা কি করেন বলুন তো? যে কোন নাম যে-কোন চরিত্রের কপালে এঁটে দেন? নাকি নামটি যাতে মানুষটির উপযোগী হয় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন? একেকজনের শুনেছি একেক রকমের স্বভাব। কারো নাম নিয়ে খুব খুঁতখুঁতি। কেউ বা রাম শ্যাম যদু মধু কলমের মুখে যা আসে তাই বসিয়ে দেন। আমিও ভেবেছিলাম তাই দেব। কিন্তু কিছুতেই তা পারলাম না। দীপঙ্করকে দীপঙ্কর ছাড়া আর কোন নামই যেন মানায় না। তাছাড়া নামটা যদি বদলে দিই লেখার আনন্দই নষ্ট হয়ে যাবে। লিখতে লিখতে বারবার ওই নাম আমার কলমের মুখে আসবে—কত সুখ দুঃখের স্মৃতি নতুন করে মনে পড়বে, সেই সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করি কেন?

যদি এই লেখা কোনদিন শেষ করতে পারি, যদি এই আখ্যায়িকা কোনদিন আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে এই খাতা নিয়ে আপনি যা খুশি তাই করবেন। সেই অধিকার আপনাকে দেওয়া রইল। কিন্তু যতক্ষণ আমার হাতে আছে আমিই এর সর্বময়ী

কর্ত্রী। আমি আপনার মত কিছুই বানিয়ে লিখব না। বানাবার ক্ষমতা আমার নেইও। তাছাড়া বানিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা অনুভূতিগুলিকে ছদ্মবেশ পরিয়ে আপনাদের কি আনন্দ হয় জানিনে, কিন্তু নিজের কথা অবিকল ভাবে নিজে বলতে পারায় যে আনন্দ, ডায়েরি লিখে লিখে, চিঠি লিখে লিখে, তার স্বাদ আমি একটু আধটু পেয়েছি। কিছুই আমি গোপন করব না। শুধু নিজের গৌরবের কথা না, নিজের লজ্জার কথা, দুঃখের কথা, ভুল ভ্রান্তি বোকামির কথা—সব আমি এই খাতায় গেঁথে রাখব। এই খাতা আর কলমের সাহায্যে আমি আমার সেই দিনগুলিতে ফিরে যাব। যে দিনগুলি বেশি দূরের নয়। বলতে গেলে এই তো সেদিনের। আবার কখনও কখনও মনে হয় আমি যেন অতি দূরবর্তী কোন ঐতিহাসিক আমলের কথা স্মরণ করছি।
সেই ভাল। আমি আপনাদের মত কল্পনার বর্ণজাল বিস্তার করব না। অত রঙের পুঁজি তো আমার নেই। তার চেয়ে আমি নির্ভেজাল একখানি ইতিহাস লিখব। সেই ইতিহাসের নাম হবে কল্যাণী সাম্রাজ্যের উত্থান পতন।

দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পুরীর সমুদ্রের ধারে। বাবা আর আমি দুজনেই স্নান করতে ভালবাসি। মা নাইতে তত ভালবাসেন না। ভারি শরীর নিয়ে তিনি জলে বেশিক্ষণ থাকতে তেমন ভরসা পান না। দু-তিনটি ডুব দিয়েই তিনি ওপরে উঠে আসেন। এসে তাগিদ দিতে শুরু করেন, 'আর কতক্ষণ থাকবে তোমরা? উঠে এস।'
বাবা দুজন নুলিয়া রেখে দিয়েছিলেন। তারা আমাদের প্রথম কদিন হাত ধরে সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যেত। কিন্তু নুলিয়ার সাহায্য নিতে মার যেমন ভয় তেমনই আপত্তি।
তা দেখে বাবা বললেন, 'বেশ, আমিই তোমাকে চান করাব। আমিই তোমার নুলিয়া হব।'
মা বললেন, 'দরকার নেই অত বীরত্বে। আমিও ডুবব, তুমিও ডুববে।'

বাবা জবাব দিলেন, 'তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে গেল।'
মা বললেন, 'আহা, মেয়েটার কি দশা হবে তাহলে। ও তো এখনো বড় হয়নি বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়নি। কেবল দেখতেই ঢ্যাঙা হয়েছে। দুজনেই যদি মরি তাহলে ও অনাথ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।'
বাবা হেসে বললেন, 'থাকগে। তাহলে দুটো দিন পরেই মরা যাবে।'
মার দরকার হয় না বলে একটি নুলিয়াকে আমরা ছাড়িয়ে দিলাম। আর একটি নুলিয়াও নামমাত্র রইল। বাবাই আমাকে ধরে ধরে স্নান করান। কদিন বাদে বাবাকেও আর আমার দরকার হয় না। সমুদ্র স্নানে আমি পুরোপুরি স্বাবলম্বিনী হয়ে উঠলাম।
মার সেই দৃশ্য সহ্য হয় না। আমি কখনও ঢেউয়ের তলায় চলে যাচ্ছি কখনও ওপরে ভেসে উঠছি। সেই তরঙ্গলীলা দেখে ভয়ে মার বুক কাঁপে। তিনি রাগ করেন বকাবকি করেন, 'বুঝতে পেরেছি, তোকে আর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। তোকে এখানেই রেখে যেতে হবে।'
আমি লক্ষ্য করি, খানিকটা দূরে আর একজন বৃদ্ধ একটি যুবকের দুরন্তপনায় ঠিক একইভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনিও বলতে থাকেন, 'আর কত নাইবি দীপু, এবার উঠে আয়।'
দীপু জবাব দেয়, 'তুমি হোটেলে চলে যাও দাদু, আমি পরে যাচ্ছি।'
বৃদ্ধ বলেন, 'তুই সর্বনাশ ঘটাবি।'
কিন্তু সর্বনাশের দিকেই যেন ছেলেটিব ঝোঁক। কূলহীন সেই বিশাল সমুদ্র যেন তার খেলার বস্তু। সমুদ্রের রঙ নীল, আর ওর গায়ের রঙ সাদা গৌর। অমন সুন্দর রঙ এর আগে আমি আর কারো গায়ে দেখিনি। শুধু রঙ নয়, নাক চোখ মুখের গড়নে, দেহের দৈর্ঘ্যে অমন রূপবান পুরুষ এর আগে আমার চোখে পড়েনি। আমার বাবাও সুপুরুষ। তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও কেউ কেউ সুদর্শন ছিলেন। কিন্তু সবই পড়ন্ত বয়সের রূপ। এক সময় যে তাঁদের রূপ ছিল ভগ্ন দেউল যেন সাক্ষ্যটুকু ধরে রেখেছ। কিন্তু পুরীর সমুদ্রের কূলে সমুদ্রের জলে আমি যাকে দেখলাম সে কোন ইতিহাস নয়, সে এক জীবন্ত মুহূর্ত। বলতে গেলে

রূপ আর যৌবন যে অভিন্ন তা আমি প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম, শিরায় শিরায় অনুভব করলাম।

দেখে আনন্দ হল, সেই দেখা একা একা দেখা নয়, শুধু দু-চোখের দেখা নয়। আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারতাম সেও আমাকে দেখেছে, দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। এই অনুভূতি যে কি আনন্দের তা আপনাকে বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। আপনি জীবনে বহুবার তার বর্ণনাও করেছেন। তবু কি আপনার মনে হয় আপনি সব বলতে পেরেছেন, নাকি বলার সাধ সম্পূর্ণ মিটে গেছে?

আলাপ পরিচয় প্রথমে অবশ্য বাবার সঙ্গে আর দীপঙ্করের দাদুর সঙ্গেই হল। কলকাতায় থাকাকালীন পাশাপাশি বাস করলেও কারো সঙ্গে কারো আলাপ হয় না, প্রত্যেকেই যে যার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন। বাবাও নাগরিক আদব কায়দা কম মানেন না। কিন্তু বাইরে বেড়াতে এসে নাগরিক বিধি নিষেধের গণ্ডি যেন আপনিই ভেঙে যায়। যে ভিড় এড়াবার জন্যে বাবা কলকাতার বাইরে বেড়াতে আসেন সেই ভিড়ই কিন্তু আবার তাঁর চারপাশে জমতে থাকে। শুধু তফাৎ এই যে, সেই ভিড় নব পরিচিতদের, ক্ষণ পরিচিতদের। কলকাতায় ফিরে আসবার পর এদের কজনের সঙ্গেই বা দেখা সাক্ষাৎ হয়, কজনের সঙ্গেই বা যোগাযোগ থাকে।

জানি না আমার বাবাই প্রথম কথা বলেছিলেন নাকি দীপঙ্করের দাদুই আলাপ পরিচয়ের জন্যে প্রথম ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। নিশ্চয়ই দুজনেই উৎসুক ছিলেন। সঙ্গী পাবার আগ্রহ কারোরই কম ছিল না।

দীপঙ্করের দাদুর বয়স আমার বাবার চেয়ে অনেক বেশি। হিসাব করে দেখেছি তিনি আমার বাবার বাবাও হতে পারতেন। যে সময়ের কথা বলছি বাবা তখন পঞ্চাশেও পৌঁছাননি, আর দীপঙ্করের দাদুর বয়স তখন সত্তর বাহাত্তরের কম হবে না।

কিন্তু বয়স হলে কি হবে, স্বাস্থ্য কিছুটা ভেঙে পড়লেও স্বভাবে তিনি বাহাত্তুরে বুড়ো হয়ে পড়েননি। উৎসাহ উদ্দীপনায়, আমোদ প্রমোদে, রঙ্গ কৌতুকে তিনি যেন তাঁর নাতির বয়সী। ওঁর সঙ্গে দীপুর—নামটা এখন ছোট করেই বলি, ওই নামেই তো ওকে

ডাকতাম, আরো কত নামেই তো ডেকেছি—কিন্তু সেসব পরের কথা পরে বলব। দীপুর সঙ্গে তাঁর ঠাকুরদার চেহারার অপূর্ব সাদৃশ্য আছে। লক্ষ্য করে দেখেছি ওই বৃদ্ধও রূপবান। তবে সে রূপ ভগ্নস্তূপের। দীপুর বাবা কম বয়সে মারা গেছেন। শুনেছি তিনি নাকি আরো সুন্দর ছিলেন। আরো সুন্দর? দীপুর চেয়েও সুন্দর? আমার তো বিশ্বাস হয় না। দেখে শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম অনেক গুণ ওর স্বোপার্জিত, কিন্তু রূপটা তা নয়। রূপ ওর বংশপরম্পরায় পাওয়া। রূপ প্রকৃতির খেয়ালখুশির দান। রূপের জন্যে দীপু কোন কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, তবু আমি ওর রূপেই মজেছিলাম। পরে হয়তো গুণে, কিন্তু তখন আমার কাছে রূপ গুণ সব একাকার হয়ে গিয়েছে।

দীপুর দাদুর নাম রামজীবন শীল। গোপন করব না, প্রথমে যখন ওই পদবীটির কথা শুনি আমার বুকে শেলের আঘাত লেগেছিল। বাবার কাছে শুনেছি পূর্ববঙ্গে শীল পদবীটি পরামানিকদের একচেটিয়া। আর কলকাতায় যে স্বর্ণবণিকরা ওই পদবীটি ব্যবহার করেন তা আমি নিজেই জানি। আমাদের ক্লাসের একটি মেয়েরই ওই শীল পদবী আছে। দীপু যে জাতে বামুন কায়েত বৈদ্য নয়, একথা মেনে নিতে আমার সামান্য সময় লেগেছিল। কিন্তু কাঁটার খোঁচার মত এক বিন্দু দুঃখের কথা ভুলে যেতে আমার দেরি হয়নি। রামবাবুরা উঠেছেন সমুদ্রের ধারের বড় হোটেলে। ওঁদেরও হোটেলে ওঠার অভ্যাস কম। যেখানে যান বাড়ি ভাড়া নিয়েই থাকেন। সঙ্গে সেবাযত্নের জন্যে অনেক লোকজনও আসে। কিন্তু এবার নাতির আবদার রাখতে হোটেলে উঠেছেন। সঙ্গে এসেছেন শুধু দীপুর ঠাকুমা আর একজন কেয়ারটেকার। আগে যাকে গোমস্তা বলা হত সেই শ্রেণীর একজন কর্মচারী।

বাবার কাছে শুনলাম রামজীবনবাবুরা খুব বড়লোক। আগে আরো বড়লোক ছিলেন। এখন পড়ন্ত ঘর। কিন্তু পড়তে পড়তেও যা আছে তা দিয়ে আমাদের মত বিশটি ডাক্তার পরিবারকে কিনে রাখতে পারেন। কলকাতার বাইরে খানদশেক বাড়ি আছে এখনও।

এক্সপোর্ট ইমপোর্টের কারবার আছে। অবশ্য আগেকার জাঁকজমক আর নেই। কিন্তু যেতে যেতেও যা আছে তার পরিমাণও কম নয়। কিন্তু কী হবে দীপুর দাদুর ঐশ্বর্যের হিসেবে নিয়ে, দীপু নিজেই তো এক মহাসম্পদ। ও যদি পথের ভিখারীও হত তাহলেও কি আমি ওর বন্ধুত্ব চাইতাম না? ও তখন বি. এ. পড়ছে। কিন্তু পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলোয় ওর আগ্রহ বেশি, দক্ষতাও আছে। সাঁতারে যে কত পটু তা তো নিজের চোখেই দেখেছি।

ও যে পণ্ডিত নয়, কথায় কথায় বইয়ের রেফারেন্স দেয় না, কবিতা আবৃত্তি করে না, তাতে আমি খুশিই হলাম। এর আগে বাবার যে দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলাম তাঁরা ওইসব করতেন। তাদের দেখে আমার ধারণা হয়েছিল পুরুষের কাজই বুঝি ওই—বিদ্বান হওয়া, পণ্ডিত হওয়া, দিনরাত লেখাপড়া নিয়ে থাকা আর ধরাছোঁয়া না দিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে ভালবাসা।

কিন্তু দীপুকে দেখে আমার সেই ভুল ভাঙল। ওর মধ্যে আমি পুরুষের আর এক মূর্তি দেখলাম। মন আছে কি নেই সে কথা মনে করবারও সময় দেয় না। বরং ভাবতে ভাল লাগে যে এই দেহই সমস্ত সুখের আধার। দেহের বাইরে কিছু নেই। যা কিছু সবই এই দেহের মধ্যে। দীপু আমাকে পুরোপুরি দেহাত্মবাদিনী করে তুলেছিল। ও যদি নিরক্ষর হত তাতে কিছু এসে যেত না, ও যদি কপর্দকশূন্য হত তাতেও কিছু এসে যেত না। ও যে নিরবয়ব নয় তাই আমার পরম ভাগ্য।

সমুদ্রে স্নান করতে করতে আমরা কখনও কখনও খুব কাছাকাছি এসে পড়তাম। সেই নীল সমুদ্রে সর্বশরীর ডুবিয়ে দিয়ে আমি বুঝতে পারতাম না কোন্ তরঙ্গ আমাকে অমন করে আঘাত করছে, ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে আবার কাছে টেনে নিচ্ছে? সে কি সমুদ্র না আর কেউ?

আমার সেই প্রথম প্রেমের কাহিনীকে ঠিক এইভাবে এই ভাষায় লিখতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। ঠিক তখন আমার সেই ষোল বছর বয়সে যেভাবে দিনগুলিকে কাটিয়েছি, নানা ছলনার অজুহাতে

আমরা যেভাবে দেখা সাক্ষাৎ করেছি, যে সব তুচ্ছাতি তুচ্ছ কথা বলেছি, বলিয়েছি একটি একটি একটি করে ঝিনুক কুড়াবার মত আমার স্মৃতিসমুদ্রের বেলা থেকে বালুমাখা, রঙের ছিটে লাগা সেই তুচ্ছতার রাশি যদি কুড়িয়ে আনতে পারতাম, আপনি হয়তো তাতে বিরক্ত হতেন, কিন্তু আমার আনন্দের অবধি থাকত না। আমি ভেবেছিলাম বুঝি পারব। মুনিমুক্তাগুলি আমার নিজেরই সম্পদ। তুলে আনলেই হল। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি তোলা সহজ কাজ নয়। সেগুলি তো ঠিক সমুদ্রের তীরে তীরে ছড়িয়ে নেই, সমুদ্রের অতলে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে। তাদের তুলে আনব এমন ডুবুরী আমি নই। আপনাকে দিলাম সেই ভার। আপনি দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী। সেই অধিকার আপনি প্রয়োগ করুন।

আশ্চর্য, দীপঙ্করের সঙ্গে আমার প্রথম দিনের আলাপের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল বলে মনে পড়ে না। জলের মধ্যেই আমাদের প্রথম আলাপ হয়েছিল। দীপঙ্কর আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'তুমি একা একা এতদূর এসেছ! তোমার সাহস তো কম নয়।'
আমি বলেছিলাম, 'আপনারও তো খুব সাহস দেখছি। পারমিশন না নিয়ে আপনি আমাকে তুমি বলছেন যে?'
দীপঙ্কর হেসে বলেছিল, 'তোমার মত বাচ্চা মেয়েকে তুমি ছাড়া কি বলব?'
আমি বলেছিলাম, 'বাচ্চা! আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আপনি আর আপনার দাদু সমবয়সী।'
দীপঙ্কর হেসে জবাব দিয়েছিল, 'তুমি যেভাবে দাদুর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছ তাতে দাদু হতেই আমার ইচ্ছে হচ্ছে।'
'দেখুন না দাদু হয়ে। কেউ আপনার দিকে ফিরেও তাকাবে না।'
দীপঙ্কর বলেছিল, 'নাতি হয়েও তো দেখলাম। কে আর তাকাচ্ছে।'
দীপু নিজেই জানে ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। ওকে দেখবার পর থেকে আমি যে কতবার লুকিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছি তার সীমা সংখ্যা নেই। তাকাতে গিয়ে বহুবার ধরাও পড়ে গেছি। দীপুও কি ধরা পড়েনি? দুজনেই চোর। কে কাকে হাতকড়ি পরাবে।

নাকি হাতকড়ি পরাবার জন্যেই আমরা অধীর হয়ে উঠেছিলাম ?

তারপরেও ওই রকম অল্প-স্বল্প আলাপ। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি আজ এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন যে ?'

দীপু বলল, 'দাদুর শরীরটা খারাপ। হার্টের ট্রাব্‌ল আছে। দেরি করলে তাঁর উদ্বেগ আরো বাড়বে। তুমি আরো কিছুক্ষণ থাকবে নাকি ?'

বললাম, 'না, আমিও এবার ফিরব। আপনার দাদু আর আমার মা দুজনের কেউ চান না আমরা জলে নামি।'

দীপু বলেছিল, 'যা বলেছ। কিন্তু দাদুর অসুখ, তুমি একবার আসবে না দেখতে ? তিনি তোমার কথা প্রায়ই বলেন।'

বললাম, 'আজ বাবার সঙ্গে যাব।'

'তোমার বাবা তো ডাক্তার, গেলেই ফী দিতে হবে। তাঁর ফী কত ?'

বললাম, 'অনেক। আপনারা দিতে পারবেন না। তিনি বেড়াতে এসে প্র্যাকটিসই করেন না। তবে কেউ বিপদে পড়লে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন।'

দীপু বলল, 'আমি তাঁর চ্যারিটেব্‌ল হসপিটালের রোগী হতে রাজি আছি। কিন্তু দাদু কি কারো সাহায্য নেবেন ?'

ডাকতে হল না। খবর পেয়ে বাবা নিজেই গেলেন ওঁদের হোটেলে। আমি আর মা-ও ছুটে গেলাম।

বড় বড় দুখানা ঘর। সামনে খোলা বারান্দা। যেখানেই দাঁড়ানো যায় সমুদ্র চোখে পড়ে। আর তার অনন্ত সঙ্গীত কানে আসে।

দাদু বিছানায় শুয়ে ছিলেন। বাবা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন। ডাক্তার অবশ্য আগেই দেখানো হয়েছিল। প্রেসক্রিপসন দেখে বাবা একটি দুটি ওষুধ বদলাবার সাজেশন দিলেন।

তারপর বললেন, 'কোন ভয় নেই আপনার।'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'সমুদ্রে যার শয়ন তার শিশিরে কি ভয়। খেয়া ঘাটে এসে লেগেছে, উঠে বসলেই হল।'

বাবা বললেন, 'বিশ্রামই এখন চিকিৎসা। বিশ্রাম করলেই ভাল হয়ে যাবেন।' তিনি বললেন, 'বছরের পর বছর ধরে বিশ্রামই তো করছি। আপনি জানেন না, হাত পা থাকতেও বিনা কাজে বসে থাকা যে কি

কঠিন—'

দীপুর ঠাকুমাকে দেখলেও বোঝা যায় তিনি যৌবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন। এখনো টুকটুকে রঙ ; প্রতিমার মুখের গড়ন। তবে সে মুখ আধখানা ঘোমটায় ঢাকা। সবারই সামনে ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিলেন। তাঁর সেই লজ্জা দেখে আমি ভারি মজা পেলাম। যেন তিনি ঠাকুমা দিদিমা হননি, বাড়ির নতুন বউ। নিজেই নিজের নাতবউ।

চা আর খাবার-টাবার আনিয়ে ওঁরা আমাদের খুব আপ্যায়িত করলেন।

দাদু বললেন, 'অবনীবাবু, আপনার মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। দেখা মাত্র আমি এই নাতনীটিকে ভালবেসে ফেলেছি। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।'

বাবা খুবই খুশি হলেন। ছেলেমেয়ের প্রশংসা শুনলে কোন্ বাপ মা-ই বা না খুশি হন ? বললেন, 'আমাদের কলি কিন্তু সব সময় কুসুমকলি নয়, মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকিও হয়ে ওঠে। ভারি জেদ আমার মেয়ের।'

বৃদ্ধ সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা তো হবেই। সোনায় খাদ না থাকলে কি গয়না হয় ?'

সেদিন সেই ভিড়ের মধ্যে দীপুর সঙ্গে আমার প্রায় কোন কথাই হল না। মানুষ কি কেবল মুখেই কথা বলে ? আমি যে ওদের হোটেলের ঘরে এসেছি, বেশ খানিকক্ষণ ওদের সঙ্গে কাটিয়েছি, তাতেই যেন দীপুর আনন্দের সীমা নেই। এত বড় স্বীকৃতি এত বড় মর্যাদা আমি এর আগে কারো কাছ থেকে পাইনি। বাবার বন্ধুদের কাছে যে মনোযোগ পেয়েছি এই প্রাপ্তির সঙ্গে তার তুলনা হয় না, বয়স্করা তারুণ্যের দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হন। বিনা পরীক্ষায় তাঁদের কাছে পাশমার্ক পাওয়া যায়। কিন্তু সমবয়সী যুবকেরা যখন কিছু দেয়, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবে দেয়। তাদের কারও কাছে আসা মানে অনেক অদৃশ্য প্রতিযোগিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হয়ে তবে আসা। সেই ভালবাসার মূল্য আলাদা। বাসায় ফিরে এসেও আমি সেই মুগ্ধ দৃষ্টির অভ্যর্থনার কথা ভুলতে

পারলাম না। সেই দৃষ্টি যেন আমার সর্ব অঙ্গে স্নিগ্ধ প্রলেপের মত লেগে রইল। আমি মনে মনে বললাম, 'তুমি প্রথম তুমি প্রথম। আমার প্রথম বন্ধুত্ব আমার প্রথম প্রেম।'

রাত জেগে সেদিন ডায়েরিতে আমি অনেক কথা লিখলাম। সেই লেখা একটি দিনের জন্যে বরাদ্দ করা একটি পাতার মধ্যে আবদ্ধ রইল না। তরঙ্গের উচ্ছ্বাস পাতার পর পাতা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আর লিখলাম কবিতা। কবিতা অল্পবয়স থেকেই আমি লিখি। কিন্তু সবই গদ্যকবিতা। আমার হাতে ছন্দ আসে না। ছন্দকে অনাধুনিক পুরনো এক উপসর্গ মনে করে আমিও তাকে কাছে ঘেঁষতে দিই না। কিন্তু সেদিন কোন্ গন্ধে গন্ধে ছন্দ নিজেই এসে হাজির। সেবার অনেক কবিতা লিখেছিলাম। বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি লালরঙের মোটা ডায়েরি কাব্যে ভরে উঠেছিল। স্মৃতি মন্থন করে তার কিছু কিছু নমুনা আপনাকে শোনাতে পারি। কিন্তু শুনলে আপনি হাসবেন। আজ আমার নিজেরও হাসি পায়।

তারপর থেকে দীপু প্রায়ই আমাদের সেই ছোট্ট বাসায় আসতে লাগল। খুব চঞ্চল স্ফূর্তিবাজ ছেলে। ও একাই যেন একশ। যতক্ষণ থাকে সারা বাড়িটা যেন শব্দময় হয়ে ওঠে। ও আসে আমার কাছে। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন আমার সম্বন্ধে ওর কোন আগ্রহ নেই, আমার বাবা-মার সঙ্গে গল্প করতে আসাই যেন ওর উদ্দেশ্য। ও কখনও মার সঙ্গে গিয়ে তরকারি কুটতে বসে কখনও বাবার সঙ্গে দাবা খেলে। আমার সঙ্গে কথা বলবার গল্প করবার কোন গরজই যেন ওর নেই।

বাবা একদিন বললেন, 'ছেলেটি তো দাবা খেলতেও বেশ ওস্তাদ। আমার ধারণা ছিল যারা আউটডোর গেমের ভক্ত তারা ইনডোর গেমের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু দীপু দেখছি সবরকম খেলাই খেলতে জানে।'

মা বললেন, 'জানবে না? সবাই কি তোমার মত? একালের ছেলেরা সব দিকেই নজর রাখে।'

বাবা বললেন, 'এ ব্যাপারে একাল সেকাল বলে কিছু নেই। ওটা যার

যার স্বভাব। কেউ একমুখী। কারো উৎসাহ আগ্রহ বহুদিকে ছড়ানো। ছেলেটি চৌখস একথা মানতেই হবে। শুধু পড়াশোনার কথা ওর মুখে বড় একটা শুনিনে।'

তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'এদিকে আমাদের কলির তো বই ছাড়া দিন কাটে না। কিন্তু তোর বন্ধুটি বোধহয় বইপত্রের ধারে কাছেও যায় না!'

আমি বললাম, 'যাক না যাক তাতে আমার কি বাবা। তোমার বন্ধুরাও কি সবাই সমান? সবাই বিদ্বান পণ্ডিত! সবাই পড়শোনা ভালবাসেন?'

মা বললেন, 'উনি নিজেই বা কি। মেডিকেল জার্নাল পড়া ছাড়া অন্য কোন বইপত্রের ধার দিয়ে হাঁটেন নাকি? বরং আমাদের নভেল-টবেল পড়তে দেখলে উনি ঠাট্টাই করেন।'

দীপু পড়াশোনায় ভাল হলে আরো ভাল হত। ভাল ছেলে আমরা তাদেরই বলি যারা লেখাপড়ায় ভাল। দীপু পাশ কোর্সে বি. এ. পড়ছে। পাশ করলে অর্ডিনারি একজন গ্র্যাজুয়েট হবে। এদিক থেকে ওর কোন ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু ওকে দেখে মনে হত না ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুমাত্র ভাবে। আমিই কি কিছু ভবিষ্যতের কথা ভাবতাম? তখন আমারও অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু বর্তমান। অনন্ত কালের সমুদ্রে আমরা দুটি রঙীন বুদ্‌বুদ্। এই ভাব নিয়ে তখন আমি একটি কবিতাও লিখেছিলাম। শুনিয়েছিলাম দীপঙ্করকে। যদিও আমার ধারণা যে কবিতা-টবিতা ও বিশেষ কিছু বোঝে না। কিন্তু আমি যে লিখেছি আমি যে তাকে শোনাচ্ছি এতেই তার আনন্দ। তার খেলার ব্যাপারটাও তেমনি। খেলায় আমার ইণ্টারেস্ট নিতান্তই ভাসা ভাসা। সে যে খেলে আনন্দ পায়, খেলায় যে দলের মধ্যে নাম করেছে, তাতেই আমার সুখ। কাব্য-সাহিত্য খেলাধুলো ছাড়াও এমন অনেক বিষয় ছিল যাতে আমরা সমান উৎসাহী। কী করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গল্প করে কেটে যেত তা আমরা টেরই পেতাম না। প্রথম প্রথম বাবা কি মা সামনে থাকতেন। তারপর তাঁদের না থাকার সুযোগও আমরা পুরোপুরি নিতাম।

দীপুর দাদু কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তবে বাইরে ঘোরাঘুরি তাঁর নিষিদ্ধই রইল। দীপু তাঁর অনুমতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘুরত। আমরা ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখলাম, দেখলাম কোনারকের মন্দির। মন্দিরগুলি এমনিতেই সুন্দর। কিন্তু জায়গাগুলি আরো সুন্দর হয়ে উঠল দীপু সঙ্গে ছিল বলে। অমন প্রাণোচ্ছল উজ্জ্বল চঞ্চল ছেলে এর আগে আমি কখনো দেখিনি। বাবা মা-ও স্বীকার করলেন দীপু সঙ্গে থাকায় আমাদের পক্ষের আনন্দ অনেক বেড়ে গেছে।

বাবারও ক্যামেরা ছিল, দীপুরও ক্যামেরা ছিল। ওর ক্যামেরা অনেক দামি। ও ফটো বাবার চেয়ে ভাল তোলে। পথের ছবি, পথিকদের ছবি, ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মন্দিরের ছবি কত যে তোলা হল তার আর ঠিক নেই। আমারও বহু ছবি দীপু তুলেছিল। কখনো বাবা মার সঙ্গে কখনো আলাদা। কিন্তু কোন একটি মুহূর্তেও কি আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম?

কোনারকের মন্দির দেখতে দেখতে এক সময় বাবা মার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে আমরা দুজন হারিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি হয়তো মুখ টিপে হাসছেন। হাসলে আর কী করব।

মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে মিথুনমূর্তির অন্ত ছিল না। সব মূর্তি, মিলনের সব ভঙ্গিগুলিই যে আমাদের ভাল লাগছিল তা নয়। আমরা ভাল করে তাকাইওনি। স্থাপত্য ভাস্কর্য মন্দিরের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদেব কারোরই তেমন কৌতূহল ছিল না। আমরা শুধু পরস্পরের সঙ্গ সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করছিলাম। দীপু একসময় বলেছিল, 'তুমি এই মন্দিরের মধ্যে রাত্রে একা একা থাকতে পারো?

কেউ আবার তা পারে নাকি? কিন্তু নিজের ভীরুতা আমি কিছুতেই স্বীকাব করলাম না। বললাম, 'তুমি পারো?'

'না, একা থাকতে পারিনে। তবে তুমি সঙ্গে থাকলে—'

হেসে বললাম, 'ফাজিল কোথাকার, তোমার সঙ্গে এই জনমানবহীন পুরীত থাকতে আমার বয়ে গেছে।'

দীপু বলল, 'জনমানবহীন কোথায়? মন্দিরের দেয়ালে খিলানে

খিলানে আমাদের মত কতজন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, কোন রাত্রে আমরা যদি জায়গা বদল করি, ওরা যদি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে হাজারে হাজারে শোভাযাত্রা করে বেরোয়, আর আমরা যদি কারো শাপে পাথর হয়ে ওই রকম দেয়ালের গায়ে আটকে থাকি, কি রকম হয় বল তো?'

হাসতে হাসতেই কথাগুলি বলেছিল দীপু। কিন্তু কেন যেন ভারি অলুক্ষুণে অস্বস্তিকর বলে মনে হয়েছিল ব্যাপারটা।

দীপু তো কাব্য-টাব্যর ধার ধারে না, তবু অমন একটা উদ্ভট কল্পনা সেদিন কেন তার মাথায় এসেছিল কে জানে।

একটু বাদেই দেখলাম বাবা ব্যস্ত হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে বললেন, 'কোথায় ছিলি তোরা? কতক্ষণ ধরে খুঁজছি।'

সেই প্রথম তাঁর মুখে বিরক্তি চোখে বিদ্বেষের লক্ষণ আমি দেখতে পেলাম। আমি বললাম, 'সে কি বাবা, আমরা তো এদিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।' বাবা সে কথার কোন জবাব দিলেন না। দীপুর দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'চল এবার নিচে নামি। সবাই নেমে গেছে। এরপর সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ফিরতে অসুবিধে হবে।'

মা একটা সিঁড়ির ওপর বসে বিশ্রাম করছিলেন। আমাদের দেখে একটু হেসে বললেন, 'এই যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

আমি রাগ করে বললাম, 'কোথায় ছিলাম না?'

পরে অবশ্য বাসায় ফিরে এসে বাবা আমাকে আদর করে কাছে ডাকলেন। হেসে কথা বললেন, গল্প করলেন। তাঁর সেই ক্ষণিকের রাগটুকু বহুক্ষণ আগেই মন থেকে মিলিয়ে গেছে।

পুরী থেকে ফেরার পরেও দীপুদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ যোগাযোগ রয়ে গেল। সাধারণত চেঞ্জে গিয়ে যে আলাপ হয় তা কেউ আর বড় একটা বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনে না। আমরাও তাই করতাম। পথের আলাপ পথেই শেষ করে দিয়ে আসতাম। কিন্তু দীপুদের বেলায় তার ব্যতিক্রম হল। আলাপটা শুধু পথেরই ছিল

না, তা দু'পক্ষকেই ঘর পর্যন্ত পেঁাছে দিয়েছিল।
দীপুকে ডাকতে হল না। সে নিজেই বারবার আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। এদিক থেকে তার কোন অভিমান ছিল না। দীপু জানত সে অনাহূত আসছে না বা যার কাছ থেকে আমন্ত্রণ তার প্রাপ্য, তার কাছ থেকে তা সে নিত্যই পাচ্ছে।
ওই সময় আমি তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতাম, দেখা হলে কথা বলতাম, আর যাওয়ার সময় তার হাতের মধ্যে চিঠির টুকরো গুঁজে দিতাম—তবু মনে হত কিছুই যেন বলা বলা হয়নি।
অবশ্য এর মধ্যে একদিন আমি আর মা দীপুর দাদুকে গিয়ে দেখে এলাম। তিনি টেলিফোনে আমাদের যেতে বলেছিলেন। তাঁর গাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।
সিমলা স্ট্রীটে তাঁর চারতলা বাড়ি। সে-বাড়ি খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। নতুন রঙ করা হয়েছে। লাল টুকটুকে রঙ। বুড়োর শখ আছে খুব। এদিকে মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাদু নিজেই আমাদের হাসি মুখে অভ্যর্থনা করলেন।
আমার হাতখানা ধরে বললেন, 'এস এস। তারপর মার দিকে চেয়ে বললেন 'ডাক্তার কোথায় ?'
মা বললেন, 'উনি ব্যস্ত আছেন। আর একদিন আসবেন।'
বাড়িতে লোকজন বেশি নেই। একান্ত আপনজনের মধ্যে ওঁরা তিনজনই। দীপু আর তার ঠাকুরদা ঠাকুমা। আর আছেন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আত্মীয়া এবং দীপুদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্মসূত্রে আবদ্ধ কিছু কর্মচারী। দীপুর দুজন পিসিও আছেন। তাঁরাও বড় ঘরের গৃহিণী। নিজেদের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত।
বৃদ্ধ ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। তিনতলার একটা ঘরে দীপুর বাবা মার বৃহৎ অয়েলপেণ্টিং দেয়ালে আঁটা। খুব অল্পবয়সে তাঁরা মারা গেছেন।
বৃদ্ধ বললেন, 'বউমা আমার সতী সাধ্বী ছিলেন। বেশি দিনের

বৈধব্য তাঁকে সইতে হয়নি। আমার ছেলে যাওয়ার একমাস বাদেই। আমি পাগল হয়ে যেতাম। হয়ে গেলে বাঁচতাম। পাগলের বোধহয় দুঃখ জ্বালা থাকে না। ভেবেছিলাম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাব। কিন্তু যেতে পারলাম না। দীপু আমার বেরোবার রাস্তা বন্ধ করে দিল। আটকে ধরল পথ। ওর মুখে নিজের ছেলের মুখ ফের দেখতে পেলাম। আমার আর বেরনো হল না। কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।'

কেন যেন ওই শোবার ঘরে আর থাকতে ইচ্ছা করছিল না। পৃথিবীতে দুঃখ আছে শোক আছে। কিন্তু জীবনের সেই পর্বে আমি কোন প্রচণ্ড দুঃখের মুখোমুখি হইনি। হতে চাইওনি। পাশ কাটিয়ে গিয়েছি, মানুষের দুঃখ দুর্দশা অতল আর অনন্ত। আঁজলা ভরে কতটুকু লোনাজল আমি তুলে ফেলতে পারি?

তাছাড়া আমার মনে হচ্ছিল দীপুর দাদু, তার মৃত বাবা মা সবাই যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। সুদূর অতীতে তাঁদের বাস। বর্তমান কালের সঙ্গে তাঁদের যোগ কোথায়? অন্তত আমার জীবনের সঙ্গে কোন সংযোগই নেই। এই পরিবারে অতিমাত্রায় জীবন্ত যে মানুষটির সঙ্গে আমার যোগ, তার কাছে ছুটে যাওয়ার জন্যে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যাওয়ার উপায় ছিল না। সে তিলেকের জন্যে দেখা দিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেছে তার ঠিক নেই।

দীপুর দাদু খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল তাঁর পুত্র পুত্রবধূর ব্যবহার করা আরো সব জিনিসপত্রই এই ঘরে এনে জড়ো করে রেখেছেন। একঘরে কুলায়নি, পাশের ঘরেও তা উপচে পড়েছে। কোন্ জিনিসের কত দাম, কোন্ জিনিস কোত্থেকে কিনেছিলেন সেই সব ইতিবৃত্ত দাদু আমাদের শোনাতে লাগলেন। জানিনে মা তা শুনছিলেন কিনা, আমি তো প্রায় বধিরা হয়ে ছিলাম।

মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন এক যাদুঘরে ঢুকেছি। মৃতের কঙ্কাল আর ভাঙাচোরা পাথরের মূর্তিতে সেই ঘর ভর্তি। স্তব্ধ অতীত থেকে লীলাচঞ্চল বর্তমান কালে ফিরে

আসবার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।
বৃদ্ধ কি তা বুঝতে পারলেন? কিন্তু এই অমনোযোগিনীকে তিনি দুর্বাসার মত অভিশাপ দিলেন না। হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও তো দিদি, সেই বাঁদরটাকে ডেকে নিয়ে এস তো। সে বোধহয় চারতলার ঘরে গিয়ে বসে আছে। সবসময় উঁচু নজর। গাছের মগডাল ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না।'
আমি মার অনুমতি চাইলাম, 'যাব মা? দীপুদাকে ডেকে নিয়ে আসব?'
মা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'যাও না।'
কথাটা যেন যেওনা-র মত শোনাল। আমি সেটুকু উপেক্ষা করে সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেলাম।
মার ওপর আমার একটু রাগই হল। আমি তো না জিজ্ঞেস করলেও পারতাম। ভদ্রতা করে যখন জিজ্ঞেস করেছি তোমার কি উচিত ছিল না হাসিমুখে সম্মতি জানানো? না বলে গেলেই বা তুমি কী করতে পারতে? সিঁড়ির মুখেই দীপুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওর পরনে ডোরাকাটা পাজামা গায়ে নীলাভ রংয়ের হাফ শার্ট।
ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ও যা পরে তাতেই ওকে মানায়।
দীপু হেসে বলল, 'এতক্ষণ বুড়োর সঙ্গে কী বকবক করছিলে বল তো?'
বললাম, 'আমি বকবক করছিলাম নাকি? বাধ্য হয়ে বকবকানি শুনতে হচ্ছিল। তাতে ওঁর কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দাদুই তো তোমাকে খুঁজে আনবার জন্যে আমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন।'
দীপু হেসে বলল, 'বুড়োর তাহলে বুদ্ধিসুদ্ধি আছে দেখছি।'
চারতলায় খানতিনেক ঘর ওর দখলে। একখানা শোবার, একখানা পড়বার আর একখানায় ওর বন্ধুবান্ধব এসে বসে। সব ঘরেই দামি দামি আসবাব পত্র। তবে অনেক ফাঁক আছে। নিচের ঘরগুলির মত জিনিসপত্রে ঠাসা নয় দেখে আমার খুব ভাল লাগল।
আমি বললাম, 'সব তোমার?'

দীপু আমার কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, 'সব তোমার।'
আমি মুহূর্তে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের অর্ধাংশভাগিনী হওয়ার গৌরব অনুভব করে নিলাম। আমি কোনদিন ধনী হবার স্বপ্ন দেখিনি। আমার বাবা মার মুখেও কোনদিন বিষয় সম্পত্তি পাবার কথা শুনিনি। ব্যাঙ্কে হাজার হাজার টাকা জমাবার কথা বাবাও ভাবেন না।
তবু যে অতুল সম্পদের অধিকারী হওয়ার কলপনায় আনন্দ পেলাম তা দীপুর জন্যে। এখানে দীপুর যা কিছু আছে তার স্বত্ব আমারও—এই অভিন্নতা বোধ আমাকে উল্লসিত করে তুলল।
'সব তোমার সব তোমার।' কথাটাকে প্রামান্য করে তুলবার জন্যই যেন দীপু আমাকে কাছে টেনে নিল, সহজে ছাড়তে চাইল না।
একটু বাদে আমি কোনরকমে নিজেকে মুক্ত করে এনে বললাম, 'ছি ছি ছি, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওঁরা হঠাৎ এসে পড়লে কি হত।'
দীপু হাসিমুখে বলল, 'কিছুই হত না, ওঁরা সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজে ফেলতেন। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না। লজ্জা তো সব চোখে।'
আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে মুখখানা পরিষ্কার করে নিলাম। লজ্জার কিছু চিহ্ন মুখেও ছিল।
সেই আমাদের প্রথম অঙ্গীকার। দীপু ওর হাতের হীরে বসানো একটি আংটি আমাকে পরিয়ে দিতে চেয়েছিল।
আমি বললাম, 'কী হবে ওই আংটি দিয়ে? তুমি যা দিয়েছ তার চেয়ে কি ওই আংটি বড় হল?'
দীপু বলল, 'তুমি তাহলে আমার?'
বললাম, 'নিশ্চয়ই।'
দীপু বলল, 'না কি হাতের এই আংটির মত? যখন যার হাতে থাকবে তখন তার হয়ে যাবে?'
ওই ধরণের অলুক্ষুণে কথা ও যাতে আর বেশি না বলতে পারে তাই আমি ওর মুখ বন্ধ করে দিলাম। একটু বাদে দুজনে নিচে নেমে এলাম।

মা আর দীপুর দাদু তখন ডাইনিং রুমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।
ঘরটি বেশ বড়। চেয়ার টেবিলে সাজানো। আমাদের চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু ওঁরা ভুরিভোজের ব্যবস্থা করেছেন। লুচি মাংস চপ কাটলেট সন্দেশ আইসক্রীম।
দাদু আমার পাশে বসলেন। কিন্তু কিছু খেলেন না। দীপুর টাকুমাও কিছু খেলেন না। দীপু সামনে বসে আমাদের সঙ্গ দিতে লাগল। সার্ভ করবার জন্যে ওঁদের লোক আছে, কিন্তু দীপুর ঠাকুমা নিজের হাতে আমাদের খেতে দিলেন। এবার তাঁর ঘোমটা অনেকটা খাটো হয়েছে। পাকা চুলে তিনি সিঁদুর পরেছেন। মুখশ্রী ভারি সুন্দর। পানের মত মুখের গড়ন। অত বয়স হয়েছে, তবু গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখনো ম্লান হয়নি। কিন্তু আমি যেন ওঁর মুখে কিসের একটা দুঃখের ছায়া দেখতে পেলাম। একটু আগে ওঁদের পুত্রশোকের কথা শুনেছিলাম বলেই হয়তো। ছেলের বদলে ওঁরা অবশ্য নাতিকে পেয়েছেন। সে-ইএখন পুত্রতুল্য। কিন্তু একজন কি আর একজনের অভাব মেটাতে পারে? জীবনে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হয় পারে না। আমাদের সুখের ঘরের পাশেই শোকের ঘরের শূন্যতা খাঁ খাঁ করে।
খাওয়ার টেবিলে দাদু তাঁর কৈশোর যৌবনের গল্প করতে লাগলেন। দীপুর মত তার দাদুও খুব ডানপিটে ছেলে ছিলেন। বাবার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর মনের মিল হত না। তাঁর মতের বিরুদ্ধে দাদু ব্যারিস্টারি পড়তে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম বাবা তাঁকে রাগ করে খরচ-পত্র পাঠান নি। সেই সময়টা দাদুর খুব কষ্টে কেটেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে আপোষ করেননি। নিজের উপার্জনে সেখানকার খরচ চালিয়েছেন। পরে অবশ্য তাঁর বাবার মতের পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর আশীর্বাদও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পাশ-টাস করে ফিরে আসবার পর তাঁর বাবা বেশীদিন বাঁচেননি। ছেলের সাফল্য তিনি দেখে যেতে পারেননি। দীপুর দাদু প্রথমে প্র্যাকটিসেই মন দিয়েছিলেন। তাঁর ভাইরা ব্যবসা বাণিজ্য দেখতেন। কিন্তু ছেলে মারা যাওয়ার

পর তিনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দেন। বালিগঞ্জে তাঁর যে বিরাট বাড়ি ছিল সেটাও বিক্রি করে দিয়ে উত্তর কলকাতায় পালিয়ে আসেন। যে বাড়িতে তাঁর ছেলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে সেখানে তাঁর পক্ষে বাস করা অসম্ভব।

সেদিন তিনি যা বলেছিলেন আমি তাঁর চুম্বকটুকু মাত্র দিলাম। জীবন কাহিনী বলতে গিয়ে ছোট বড় নানা ঘটনার কথাও তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন। সেই উপাখ্যানের কোনটিতে কৌতুক কোনটিতে বীরত্ব, কোনটি বা শোক দুঃখ বিষাদে আচ্ছন্ন ছিল। শুনতে শুনতে আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধও একদিন তাঁর নাতির মতই দুরন্ত আর দুঃসাহসী ছিলেন। একথা এখন বিশ্বাস করা শক্ত। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনার কোন বান্ধবী ছিল? তাঁর কথা তো কিছু বললেন না।'

তিনি হেসে বললেন, 'বান্ধবী? আঠারো বছর বয়সে দীপুর ঠাকুমাকে বিয়ে করেছি। সেই থেকে হাত পা বাঁধা। দু চোখে ঠুলি। আর কোন দিকে তাকাবার জো ছিল নাকি?'

কে জানে দাদু সত্য কথা বললেন কি না। অন্তত এই ব্যাপারটিতে মানুষ সত্যকে আড়াল দিয়ে চলে। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারো কাছে হৃদয়ের দ্বার খুলতে চায় না। আপনাকে আমি সেই বন্ধুর আসনে বসিয়েছি। আপনার কাছে আমি কিছুই লুকোব না।

দাদু বিদায় দেওয়ার সময় বললেন, 'দিদি, এস মাঝে মাঝে। এই বুড়োকে একটিবার করে দেখা দিয়ে যেও। তুমি মূর্তিমতী আনন্দধারা। তোমাকে দেখেও আনন্দ।'

দাদুর এই আমন্ত্রণ না পেলেও কি আমি না এসে পারতাম! কলেজে যাতায়াতের পথে আমি মাঝে মাঝে দাদুকে দেখতে যেতাম। দীপুও আসত। সে-ই আসত বেশি। তার পক্ষে আসাটা সহজ ছিল। তার পক্ষে আসাটা সহজ ছিল। অবশ্য বাড়ির বাইরেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হত। আপনাকে বলে দিতে হবে না, সেই গোপন সাক্ষাতেই আনন্দ ছিল বেশি।

সেই দিনগুলিতে আমরা কি করতাম তার বর্ণনা দিয়ে আর কি হবে। ঘটনা যদি কিছু ঘটত সে তো প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তবু প্রতিটি দিন নতুন বলে মনে হত। একঘেয়েমির ক্লান্তি কোন একটি দিনকেও স্পর্শ করতে পারত না।

জীবনের সেই দুটি বছর যেন একটি খণ্ডকাব্য। যদি ছন্দোবদ্ধ কবিতায় সেই দিনগুলিকে গেঁথে রাখতে পারতাম কী চমৎকারই না হত। কিন্তু আমার সেই শক্তি নেই। সেই অপ্রকাশিত অরচিত কাব্য মনের মধ্যেই ধ্বনিত হত, কিন্তু কাব্যময় স্বপ্নময় দিনগুলি তো অফুরন্ত নয়। তার পরিবর্তন হতে লাগল। দীপু দাবি করল, 'এবার আমাদের বিয়ে করতে হবে। দাদু বারবার বলছেন।'

আমি হেসে বললাম, 'দাদু তো আঠরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। তুমিও কি তাই করতে চাও নাকি?'

দীপু বলল, 'আমি পাঁচ বছর আগে আঠারো পার হয়েছি। তুমিও এখন সাবালিকা। আমাদের বিয়ের কোন বাধা নেই। বাধা দিলে আমরা সেই বাধা মানবই বা কেন।'

দীপু বি এ পাশ করে ল-কলেজে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ওর পড়শোনায় মন নেই, কাজকর্মে মন নেই। শুধু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, খেলাধুলো নিয়ে থাকে। আবার একটা ড্রামাটিক ক্লাব করেছে। সন্ধ্যার পর সেখানেও গিয়ে ও আসর জমায়। দেখে শুনে আমার মনে হল দীপু সত্যিই সাবালক হয়নি। ও যেন ওর পনেরো ষোল বছর বয়সেই রয়ে গেছে। সেই বয়সেই আমার মনে অস্পষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল, জীবনের কোন ব্যাপারেই যে সিরিয়াস নয়, সে কি প্রেম সম্পর্কে সিরিয়াস হতে পারে? জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে যে কোন গৌরব অর্জন করতে পারেনি প্রেমকে সে কী করে প্রতিষ্ঠা দেবে?

দাদু বলতে লাগলেন, 'বিয়ে করলেই ওর ঘরে মন বসবে, কাজে মন বসবে, তার আগে কিছুতেই কিছু হবে না।'

আমার বক্তব্য ছিল আগে কিছু হোক তারপর বিয়ে। আমি এম এ পাশ করব তারপর হয় কোন অফিসে না হয় কলেজে কাজ করব। দীপুও ততদিনে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

দীপু বলল, 'তোমাকে আমি চাকরি করতে দেবই না। চাকরি করবে তুমি কোন্ দুঃখে? আমাদের যা আছে তাই যথেষ্ট।'
আমি বললাম, 'চাকরি তো শুধু কটা টাকার জন্যেই নয়, লেখাপড়া যে শিখেছি তার চর্চা রাখতে হবে তো।'
দীপু বলল, 'সে চর্চা ঘরে বসেই করবে। ঘর-সংসারই তো তোমাদের কাজ। তার বাইরে কোন কাজ নেই।'
দীপু তো নয় যেন তার ঠাকুরদা ভিতর থেকে কথা বলছেন। আমি বললাম, 'আমার চাকরির কথা পরে হবে। আগে তুমি তো কিছু কর।'
দীপু বলল, 'তুমি কি চাও কোন মার্চেণ্ট অফিসে কি কোন সরকারী অফিসে গিয়ে আমি কেরাণীগিরিতে ভর্তি হই? অমন কেরাণী আমাদের ফার্মে যথেষ্ট আছে। আরো একশ কেরাণী আমি রাখতে পারি, তা জানো?'
আমি বললাম, 'তুমি পারো না, তোমার দাদু পারেন।'
দীপু বলল, 'একই কথা। দাদু যা কিছু করেছেন সব আমিই পাব। নিজের দখলে সব এলে আমি তখন কি করি দেখে নিও।'
কিন্তু আমি চাইছিলাম দীপু নিজে কিছু একটা করুক—আমি যা নিয়ে গর্ব করতে পারি, দশজনকে ডেকে দেখাতে পারি।
দীপু বিয়ের জন্যে কেন অস্থির হয়ে উঠেছিল আমি যে তা না বুঝতাম তা নয়। ও যা চাইছে বিয়ের আগে আমি ওকে সেই অধিকার দিতে পারিনে। জানি এখনকার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই তা দেয়। অনেকের মনেই ও নিয়ে এখন আর কোন সংস্কার নেই। শুধু সংস্কার নয়, আমি এই ব্যাপারটিকে কাব্য দিয়ে সৌন্দর্য দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম। সেই সৌন্দর্যের আধার হল একটি মনোজ্ঞ মধুর অনুষ্ঠান।
কিন্তু দীপু ভাবত আমার মনে দ্বিধা আছে বলেই আমি ওর দাবী পূরণ করছিনে। যে ভালবাসে সে সব দিতে পারে। সব কিছুর দখল না পাওয়া পর্যন্ত দীপু যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

ওর সঙ্গে আমার যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তা বাবা মার কাছে

গোপন ছিল না। আমরা যতই সাবধান হয়ে চলি না কেন তাঁরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরে খুশি হননি। মা যদি বা একটু আধটু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বাবা মোটেই সে পথে যাননি। তিনি যে মনে মনে খুব অশান্তি বোধ করছেন তা আমি বুঝতে পারতাম। কথায় কথায় তিনি আজকাল চটে ওঠেন, রুক্ষস্বরে কথা বলেন। এমন স্বভাব এর আগে তো ওঁর দেখিনি। বাবার জন্যে আমার মাঝে মাঝে ভারি কষ্ট হয়। বাবা কি আমার কম আদরের? তাঁর জন্যে ছেলেবেলায় মাকে আমি যে কত হিংসা করেছি সে কথা কি ভুলতে পারি?
আমি ভাবলাম বাবার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার। আমি যা কিছু করব ওঁকে জানিয়ে, ওঁকে বুঝিয়ে, শুনিয়ে —যদি সম্ভব হয় ওঁর সম্মতি নিয়ে করব। ওঁকে লুকিয়ে কিছু করব না।
সেদিন বাবা সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে এলেন। সাধারণত তিনি এ সময় বড় একটা ফেরেন না। জামাকাপড় ছেড়ে দোতলার বারান্দায় হাতলছাড়া চেয়ারটায় এসে চুপচাপ বসে রইলেন।
মা বললেন, 'অমন করে ওখানে গিয়ে বসলে যে? বাথরুমে যাও। চান-টান করে এস। খাবে না কিছু?'
বাবা রুদ্ধস্বরে বললেন, 'সবই করব। আমাকে বিরক্ত কর না।'
মা আর কথা বললেন না। সরে গেলেন ওঁর কাছ থেকে।
আমি পড়তে বসেছিলাম। বই রেখে বাবার কাছে এলাম। তারপর তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'বাবা, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'
বাবা বললেন, 'না, শরীর খারাপ হয়নি। মনটা ভাল নেই।'
বললাম, 'কেন বাবা?'
বাবা বললেন, 'সন্তানের নিন্দা সহ্য করা বড় কঠিন।'
'আমার কথা বলছ? কারা আমার নিন্দা রটাচ্ছে বল তো? তোমার হিংসুটে বন্ধুরা নিশ্চয়ই?'
আমি আর আগের মত তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারিনে

বলে বাবার কোন কোন বন্ধু আমার ওপর অসন্তুষ্ট একথা আমি জানতাম। কেউ কেউ আমাদের দুজনকে একসঙ্গে বেড়াতে কি বাসে ট্রামে পাশাপাশি যেতেও দেখেছেন।

বাবা বললেন, আমার বন্ধুরা তোর মত মেয়ের সঙ্গে শত্রুতা কেন করবে! আমার মত তারা সবাই তোর হিতৈষী। কলি, একটা কথা তোকে আজ স্পষ্ট করে বলছি, সব কিছুরই একটা সময় আছে। যে বয়সটা পড়াশোনার বয়স, শিক্ষালাভের বয়স, সেই বয়সে ছেলেমেয়েদের তাই নিয়ে থাকাই ভাল। জীবনে বন্ধুত্ব প্রেম আসবে বইকি, কিন্তু তারা যদি অসময়ে আসে তাহলে সব নষ্ট করে দেয়। বাল্যবিবাহের কথা শুনলে আজকাল আমরা হাসি, সেদিক থেকে বাল্যপ্রেমও নিন্দনীয়। তা মানুষকে বাড়তে দেয় না। সব দিক থেকে খর্ব কবে রাখে।'

বাবা যে এসব কথা কেন বলছেন তা আমার বুঝতে বাকি ছিল না। আমি তখন বালিকাও নই, কিশোরীও নই। যখন আমার আরো কম বয়স ছিল তখন প্রাজ্ঞ প্রবীণদের মত কথা বলে আমি বাবার বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিয়েছি। তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে রাজনীতি নিয়ে সমবয়সীর মতই আলাপ আলোচনা করেছি, তর্ক বিতর্কও করেছি। তখন সবাই আমার তারিফ করেছেন। কেউ বলেছেন প্রিকসাস, কেউ বলেছেন পাকা বুড়ি। সেও আদর করেই। তখন তো বাবা আমাকে শাসন করেন নি। বলেননি—অসময়ে তুই বেশী শিখে ফেলেছিস, বেশি বুঝে ফেলেছিস। এসব উচিত হয়নি।

আজ অল্পবয়সে আমার জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা এসেছে বলেই বুঝি যত দোষ? এই অভিজ্ঞতার কি কাল অকাল আছে? আমি কি জানিনে, আমার বন্ধু দীপা ক্লাস সেভেনে পড়তে পড়তে থার্ড ইয়ারের একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল? আমার হাতের লেখা ভাল, লেখায় মুনশীয়ানা আছে বলে তার লাভ-লেটারগুলি আমাকে লিখে দিতে হত। কলেজে পড়তে পড়তে আমার দু'তিনটি বন্ধু এরই মধ্যে ভালবেসে বিয়েও করে ফেলেছে। তাদের পড়াশোনার পালা শেষ। তা নিয়ে তাদের দুঃখ নেই কিন্তু। আমি তো তাদের

নেই। সব বিষয়ে মিডিওকার। বিলো দি অ্যাভারেজ।'
আমি যাকে ভালবাসি আমি তার সমালোচনা করতে পারি, নিন্দাও করতে পারি। কিন্তু অন্যে যদি আমার ভালবাসার জনকে নিন্দা করে তা সহ্য করব কি করে?
আমার আর তখন লজ্জা সংকোচ রইল না। প্রবল প্রতিবাদ করে বললাম, 'তোমরা ওকে দেখতে পারো না বলেই কেবল ওর দোষ দেখ। ওর যে কত গুণ আছে তা তোমাদের চোখেই পড়ে না। আসলে তোমরা নিজেদের যতই উদার বলে জাহির কর না কেন, তোমাদেরও গোঁড়ামির শেষ নেই। ও যে তোমাদের মত বামুন কায়েত নয়, অন্য জাতের ছেলে সেই হল তোমাদের প্রধান আপত্তি।'
বাবা বললেন, 'মিথ্যে কথা। আমি জাত মানিনে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানিনে। আমি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে জামাতা বরণ করতে পারি।' শেষ কথাটুকু বলে বাবা একটু হাসলেন। তারপর ফের গম্ভীরস্বরে বললেন, 'জাত মানিনে, কিন্তু শ্রেণীভেদ মানি। অত ধনীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে গেলে পদে পদে আমাদের অপদস্থ হতে হবে।'
আমি অবাক হয়ে গেলাম। বাবা যেন তাঁর বাপদাদার মুখ দিয়ে কথা বলছেন। ওঁরা নিজেরা যখন ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন তখন কি পারিবারিক কুটুম্বিতার কথা ভেবেছিলেন না কারো কোন আপত্তির কথা কানে তুলেছিলেন? দুজনে মিলে একটি নীড় গড়ে তোলাই ছিল ওঁদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন ওঁরা সার্থক করে তুলেছেন। আমার বেলাতেই যত আপত্তি।
আমি বললাম, 'দীপু যে ধনী সেটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট। ও গরীবও হতে পারত। রিকশাওয়ালা কি রাস্তার ধারে বসা মুচিকে যদি আমি ভালবেসে বিয়ে করতে চাইতাম তুমি একই শ্রেণীভেদের দোহাই দিতে।'
মা বললেন, 'চুপ কর চুপ কর। অনেক দেখেছি, কিন্তু তোর মত নির্লজ্জ মুখরা মেয়ে আমি দেখিনি।'
বাবার মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। দীপু কেন অন্য কোন

পথ নিইনি। আমি তো প্রেম আর বিবাহকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে রাখিনি। তবু বাবা আমাকে কেন শাসন করছেন? শাসন বইকি! হাতে ধরে মারলেই কি শুধু মারা হল? দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখাটাই কি একমাত্র বাঁধা?

ইচ্ছা করেই বারান্দায় আমরা আলো জ্বালিনি। অন্ধকারই বরং ভাল, বেশ ভাল লাগছিল। আমরা পরিষ্কার কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু অনুভব করছিলাম। পিছনে আরো এক ব্যক্তি এসে দাঁড়ালেন। আমি তাও টের পেলাম। আগে আমার আর বাবার কথার মধ্যে মা এসে আড়ি পাতলে আমি রাগ করতাম। এখন তা করিনে। আমি বুঝতে পেরেছি দুজনে এখন একই দলে। একজন আর একজনের প্রতিচ্ছায়া, কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনি। আমাকে নিয়ে এখন দুজনের একই সমস্যা। সমাধানের পথ সম্বন্ধে ওঁদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

আমি বললাম 'বাবা অভিজ্ঞতা যখন আসে, তখন দিনক্ষণ হিসেব করে ক্যালেণ্ডারের তারিখ মিলিয়ে আসে না। তোমরাও তো ভাল-বেসে বিয়ে করেছ। তোমরাও তো পাঁজিপুঁথি কিছু মানোনি।'

পিছন থেকে মা বলে উঠলেন, 'দেখ কলি, কথায় কথায় আমাদের তুলনা টেনে আনিসনে। তোর চেয়ে অনেক বেশি বয়সে আমরা—'

বাবাও ওই একই সুরে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তোমাদের চাল-চলনের কোন তুলনা হয় না। আমরা আমাদের কাজকে ভাল-বেসেছি, নিজেদের আদর্শকে ভালবেসেছি। তোমাদের মত খেলা করে বেড়াইনি।' 'খেলাটাই বা খারাপ কিসের?'—বলতে গিয়ে চুপ করে রইলাম।

আরো অল্পবয়সে যখন বাবা মার বিবাহ-পূর্ব অনুরাগের কথা আমি তুলেছি ওঁরা কৌতুক বোধ করেছেন। লক্ষ্য করে দেখেছি এখন আর তা করেন না। এখন ভালবাসার কথা তুললে ওঁরা বিরক্ত বোধ করেন। ভাবেন, ওঁদের পূর্বরাগের দোহাই দিয়ে আমি নিজের যথেচ্ছাচারকে সমর্থন করতে চাইছি।

বাবা বললেন, 'তাছাড়া আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ছেলেটি দেখতে সুন্দর আর বড়লোকের বাড়ি—এছাড়া ওর আর কোন যোগ্যতা

ছেলেকেও যদি আমি ভালবাসতাম তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর কোন না কোন খুঁৎ বার করে ফেলতেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বেছে বেছে আমি যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি বাবা তাঁদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। অবজ্ঞা অবহেলা উদাসীনতা দেখিয়ে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছেন। ভালবাসা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী। ঈর্ষা হিংসা একাধিপত্যের কাঁটাতারে ঘেরা।
বাবাকে বুঝতে পারি। কিন্তু মার বিরোধিতাকে বুঝতে পারিনি। বাবাকে দীপু এড়িয়ে যায় কিন্তু মাকে তো দীপু ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, নিজের মায়ের মত ভালবাসে। প্রথম প্রথম মাকেও তো কতদিন বলতে শুনিছি, 'আহা, ছেলেটিকে দেখলে মায়া হয়। কত অল্পবয়সে বাপ মা হারিয়েছে।'
এত সহানুভূতি থাকা সত্বেও মা কেন দীপুর ওপর এত বিরূপ? স্বামীর ঘরের বাইরে কোনদিন তিনি যাননি, যাওয়ার কথা কোনদিন ভাবেননি, সেই জন্যেই কি? তাঁর পতিপ্রেম, স্বামীর প্রতি একান্ত আনুগত্যই কি আমার ভালবাসার পূর্ণতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল? আমরা কি শুধু নিজেদের প্রেমাষ্পদকেই ভালবাসি, অন্যের প্রেমকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে। নাকি মাও আমাকে হিংসা করেন! আমার সৌভাগ্য সম্পদ তাঁরও ঈর্ষার বস্তু? ঘা খেয়ে খেয়ে বাধা পেয়ে পেয়ে আমার চিন্তাভাবনাও কত বাঁকা পথ নিয়েছিল তার নমুনা আপনাকে দেখালাম।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপু একটি গোপন প্রস্তাব নিয়ে এল, 'চল আমরা পালাই।'
আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পালাব? কোথায় পালাব? কেন পালাব?'
দীপু বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি কলকাতায় থেকে তুমি কিছু করতে পারবে না। সব সময় কেবল বাব-মার কথা ভাববে। আমার বাবা-মা বুদ্ধিমানের মত বহু আগে পথ ছেড়ে সরে গেছেন। কিন্তু তোমার বাবা মা পথ আগলে রয়েছেন। যা করবার তাঁদের আড়ালেই করতে হবে।'

বললাম, 'তার জন্যে পালাবার কি দরকার। বাবা মার মত যদি না পাই তাঁদের অমতেই বিয়ে করতে হবে। আর তা এই কলকাতা শহরে থেকেই হবে। এখানে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের তো অভাব নেই।'

দীপু বলল, 'না, এখানে থেকে হবে না। এতদিন দাদু আমার পক্ষে ছিলেন এখন তিনিও বেঁকে বসেছেন।'

'কেন ?'

'বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ায় তোমার বাবা নাকি তাঁকে কি সব অপমানকর কথা বলেছেন। তিনি রাতারাতি অন্য নাতবউ আনার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি, দাদু, তুমি বরং আমার আর একটি কচি ঠাকুমা নিয়ে এস। কিন্তু নাতবউয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না। সে আমার ঠিক করাই আছে।'

বললাম, 'তোমার দাদুরও দোষ আছে। তিনি কেন বাবার কাছে ও-কথা বলতে গেলেন? ব্যাপারটা তো আমাদের নিজেদের। আমার বাপের যদি এ ব্যাপারে কিছু বলবার না থাকে তাহলে তোমার ঠাকুরদারও কিছু বলবার নেই।'

দীপু বলল, 'ঠিক আছে। আর কাউকে আমরা কিছু বলাবলির সুযোগ দেব না। ওদের চোখের আড়ালে গিয়েই যা করবার করব।'

'কোথায় যেতে যাও ?'

'লণ্ডন।'

'অত দূরে ?'

'দূর আর কোথায় ? প্লেনে দেড় দিনের পথ।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও। আমার টেস্ট সামনে।'

দীপু বলল, 'রেখে দাও তোমার টেস্ট। পরীক্ষা তো আর প্লেনে করে উড়ে পালাচ্ছে না। এ বছর না দাও সামনের বছর দিতে পারবে। তুমি তৈরি হয়ে থেকো। টিকিট পাশপোর্ট সব কিছুর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। কিছু চিন্তা নেই।'

আমি চুপ করে রইলাম।

আমরা চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটি রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসে কথা

বলছিলাম। বাড়িতে এসব গোপন পরামর্শ তো হয় না। তাছাড়া বাবা পছন্দ করেন না বলে দীপু ইদানীং আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া কমিয়েও দিয়েছিল। সেই পুরু পর্দাঘেরা অপরিসর কেবিনে দীপু আমার চিবুক তুলে ধরল, হেসে বলল, 'কি অত ভাবছ বল তো? অন্য দেশে গিয়ে আমাদের হানিমুন হবে ভাবতে আনন্দ হচ্ছে না তোমার? যদি পারতাম অন্য প্ল্যানেটে চলে যেতাম।'

আমি বললাম, 'এই কেবিনে বসে-টসে আমরা অন্য প্ল্যানেটে যাওয়ার সুখ কল্পনা করতে পারি।'

দীপু বলল, 'কুঁজোর কল্পনা। তমি কেবল কাগজ কলমে কবি। আমি হাতেকলমে সব করতে চাই। নইলে হাত নিসপিস করে। তোমাকে নিয়ে আমি সারা ইওরোপ চষে বেড়াব। বছরখানেক কিম্বা অন্তত মাস কয়েকের জন্যে আমরা হব যাযাবর যাযাবরী।'

হেসে বললাম, 'আজকাল যাযাবর হতে গেলেও টাকা লাগে। অত টাকা কোথায় পাবে?'

দীপ বলল, 'দাদুর সিন্দুকটা আছে কী জন্যে?'

আমি বললাম, 'ছিঃ, তুমি অন্যের টাকায় হাত দেবে? তোমার নিজের রোজগারের টাকা হত তো আমার কোন আপত্তি ছিল না।'

দীপু বলল, 'তোমার ওই শুচিবায়ুতা ছাড় তো। আমার দাদুই কি তাঁর বাপ দাদার সম্পত্তি কিছু কম উড়িয়েছেন না কি? এখন সাধু হয়েছেন।'

শেষ পর্যন্ত কথা হল আমার বন্ধু শিখাদের বাড়িতে যাবার নাম করে আমি বেরিয়ে আসব, দীপু তৈরি হয়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে আমাকে তুলে নিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে ছুটবে।

ফিরে এসে ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া ভাবতে লাগলাম। আমার পরীক্ষাটাকে দীপু যত সহজে নস্যাৎ করে দিতে পারে আমি তা পারি না। আমার সাহিত্যচর্চা আমার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারকে নষ্ট করবে, মার এই আশঙ্কা আমি সত্য হতে দিইনি। আমার বন্ধুত্ব ভালবাসা লেখাপড়ার বাধা হয়ে দাঁড়াবে, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি

নষ্ট করে দেবে—বাবার এই ভয়কেও আমি মিথ্যা প্রমাণ করব।

আমার যখন তের চৌদ্দ বছর বয়স ছিল দীপু যদি তখন আমার কাছে প্রেমের জন্য দেশান্তরী হবার প্রস্তাব নিয়ে আসত আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠতাম। কিন্তু এখন আমার বয়স বেড়েছে, বয়সের চেয়েও বেশি বেড়েছে বাস্তব বুদ্ধি। আমি ভাবলাম আমরা পালাব কেন, আমরা দেশের মাটিতে থেকেই লড়াই করব। পালিয়ে কদিন আর বাইরে থাকতে পারব। এই ভাবে চলে গেলে দীপুর দাদু আমাদের ক্ষমা করবেন না। তার চেয়ে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাতে পারলে বিপুল সম্পত্তি নিয়ে তিনি আমাদের সহায় হবেন।

তাছাড়া বাবা মার সঙ্গে যতই ঝগড়া করি, তাঁদের মনে দুঃখ দিয়ে ব্যথা দিয়ে দূরে চলে যাব এ কথা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমি তো জানি ওঁদের কাছে আমি কি? আমি ওঁদের বেশি বয়সের একমাত্র সন্তান। আমাকে বাদ দিলে ওঁদের জীবন শূন্য হয়ে যাবে।

আমি ভাবলাম দীপুকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। টেলিফোনে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে এং নাম্বার হল, তারপর যদি বা লাইনটা পেলাম দীপুকে পেলাম না। ওদের বাড়িরই কে বলে দিলেন, সে এখন নেই। কোথায় গেছে তিনি জানেন না।

সারাদিন একটা অস্থিরতা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটল। একবার ভাবলাম, যা হবার হোক, আমি চলেই যাব। দীপু যা বলছে আমি তা-ই করব। ওর ভবিষ্যৎ আর আমার ভবিষ্যৎ তো এক। আমাদের জীবনের পথ অভিন্ন। ও যদি চলে যায় আমি থাকব কী করে।

আবার ভাবলাম এই ধরণের ছেলেমানুষী আর পাগলামি থেকে ওকে নিবৃত্ত করতে হবে। বিদেশে আমরা নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু অন্যের টাকা নিয়ে চোরের মত অমন করে পালিয়ে যাব কেন। স্কলারশিপ নিয়ে, স্টাইপেন্ড নিয়ে বিদেশে যাওয়ার মধ্যে কত সম্মান। আমি কি তেমন কোন গৌরবের অধিকারিণী হতে পারব

না ? আরো কত সুযোগ আসবে বাইরে যাওয়ার। এমন করে পালিয়ে গেলে, পড়াশোনা বন্ধ করে অর্ধশিক্ষিতা হয়ে থাকলে হয়তো জীবনে কোনদিনই আর কোন সুযোগ পাব না।

সেইদিন আরো এক বিপত্তি ঘটল। বাবা অসুস্থ হয়ে সন্ধ্যার আগেই বাড়িতে ফিরে এলেন। আগের বারের মত মন খারাপ নিয়ে আসেননি। আজ শরীরও ওঁর খারাপ হয়েছে। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা।

মা বললেন, 'তুমি সর্বনাশ ঘটাবে। ডক্টর দাসকে ডেকে নিয়ে আসি।'

বাবা বললেন, 'আরে না না। আমি তো ডাক্তার। আমি বুঝতে পেরেছি কী হয়েছে। অত ব্যস্ত হয়ো না।'

মা তবু সুস্থ থাকতে পারলেন না। ডাক্তার ডাকলেন। তিনি এসে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। তবে সাবধান থাকতে হবে।' মাইল্ড স্ট্রোকের মত সেই দিনই হয়ে গেল।

সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর অনেক রাত্রে আবার মনে পড়ল, দীপু আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার সঙ্গে আমার আজ দেখা করবার কথা ছিল। সারা রাত আমি ছটফট করতে লাগলাম। একটুও ঘুম এল না। ছি ছি ছি, দীপু কী ভাববে। এর আগে দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে কোনদিন আমার কথার খেলাপ হয়নি। আজ এই প্রথম হল। তবে আমি মনে মনে আশ্বাস্ত বোধ করলাম, আমাকে দেখতে না পেয়ে দীপু নিশ্চয়ই কোন না কোন বাধা বিপত্তির কথা অনুমান করতে পারবে। আমি যেতে পারিনি বলে সে নিশ্চয়ই রাগ করবে, আমি যাকে বিচার বিবেচনা বলছি তাকে সে ভীরুতা বলে উপহাস করবে, কিন্তু আমাকে ছাড়া সে একপাও নড়বে না।

কিন্তু আমার যুক্তি বুদ্ধির যে ও একেবারেই ধার ধারে না তার পরিচয় পেলাম পরদিনই। সেদিন থেকে দীপুকে আর দেখা গেল না। অবশ্য নিখোঁজ হবার আগে ওর দাদুর কাছে ও একটা চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিল। তাতে বেশি কিছু লেখা ছিল না।—'দাদু আমি চললাম! আপাতত গর ঠিকানা। পরে

আস্তানা ঠিক হলে তোমাকে সব জানাব।'

মনের মধ্যে উদ্বেগ ছিল, সকালবেলায় টেলিফোনে দীপুকে না পেয়ে আমি ছুটলাম ওদের বাড়িতে। দাদু দরজার সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'তাহলে তোমরা ফিরে এসেছ? সুমতি হয়েছে? হতভাগাটা কোথায়?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমি তো তার খোঁজেই এসেছি, সে বাড়িতে নেই?'

মুহূর্তের মধ্যে বৃদ্ধের কাছে ব্যাপারটা সব প্রাঞ্জল হয়ে গেল। তাঁর নাতি একাই দেশ ছেড়েছে। আমি সঙ্গে যাইনি।

সেদিন ওঁদের বাড়ি ভরতি লোক। দীপুর পিসিমারা এসেছেন। তাঁদের একপাল ছেলেমেয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে সারা বাড়ি অস্থির করে তুলেছে। বাড়িতে যে বিপদ সে কথা তারা মোটেই বুঝতে পারছে না।

দাদু নিজে কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর কন্যারা, অন্য আত্মীয়-স্বজনরা কেউ আমাকে ছেড়ে দিলেন না। সপ্তরথিনীর মার আমাকে একা সহ্য করতে হল। নচ্ছার দজ্জাল ডাইনী পিশাচী—আরো অনেক বাছা বাছা উপাধির মালা গলায় ঝুলিয়ে আমি কোন রকমে সেই শত্রুপুরী থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম।

দাদুই আমাকে সাহায্য করলেন। নিজের গাড়ি আর ড্রাইভার দিয়ে আমাকে বাড়িতে পেঁছে দিলেন। একা একা ফিরে আসবার শক্তি যে আমার আর ছিল না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তারপর আরো দু বছর কাটল। এই দু বছরের মধ্যে আমি কিছুতেই দীপুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। ওর বন্ধুদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে কয়েকখানা চিঠিও লিখেছিলাম। কিন্তু কোন জবাব পাইনি।

ওর সম্বন্ধে নানা রকম খবর আসতে লাগল। আমার মামাতো ভাই সুশান্তদা সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। সেখানে মোটা মাইনের চাকরি করে। বিয়ে করার জন্যে মাসখানেকের জন্যে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এল। সে-ই আমাকে দীপু সম্বন্ধে অনেক কিছু

জানাল—দীপু একেবারেই যাতা হয়ে গেছে। সেখানে যে চাকরি করে তা ওর যোগ্য নয়। টাকা যা পায় সব মদে ওড়ায়। ওড়াবার আরো রাস্তা আছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুশান্তদা বিয়ে করে বউ নিয়ে আবার বিলেত চলে গেল। বিয়ে করবার জন্যেই দেশে এসেছিল। যেন সেখানে অভাব ছিল মেয়ের। কিন্তু সুশান্তদা এদিক থেকে ভারি ভাল ছেলে। বাপমার অনুগত। তাঁরা দেখে শুনে যাকে পছন্দ করেছেন সুশান্তদা তাকেই চোখ বুজে বিয়ে করেছে। শুধু শুভদৃষ্টির সময় চোখ খুলেছিল। আমার মামা মামীমা ছেলেকে ঠকাননি, তাঁরা অনেক বাছাবাছির পর পরমাসুন্দরী মেয়েকেই খুঁজে এনেছেন। শিক্ষিতাও।

বাবা বললেন, 'এমন ছেলে আজকাল আর হয় না।'

আমি বললাম, 'হওয়া কি উচিত ?'

বাবা সে কথার কোন জবাব দিলেন না। বেশি বয়সে মানুষ কি তার প্রথম বয়সকে ভুলে যায় ? না কি তাকে একেবারে অস্বীকার করে ?

এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটল। আমি মাকে হারালাম। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন তো কত সহজ অপারেশন। কিন্তু সেই সহজ অস্ত্রোপচারই মার বেলায় কঠিন আর জটিল হয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা যত্ন চিকিৎসা সত্ত্বেও কিছুতেই কিছু করা গেল না। মার শেষ কথা ছিল—'তোর বাবাকে দেখিস। তুই ছাড়া ওর আর কেউ রইল না। তোর কাছ থেকে উনি যেন আর কোন দুঃখ না পান।'

এতগুলি কথা স্পষ্ট করে বলবার তাঁর শক্তি ছিল না। কিন্তু ইশারায় আভাসে মনের এই ইচ্ছাটাই তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

মার চলে যাওয়াটা এতই আকস্মিক আর অবিশ্বাস্য যে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে আমার আর বাবার দুজনেরই সময় লাগল। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি আমার জীবনে সেই প্রথম। কিন্তু বাবার তো তা নয়, তিনি তাঁর বাবার মৃত্যু দেখেছেন, মায়ের মৃত্যু দেখেছেন, আমার এক জ্যাঠামশাইয়ের অকাল-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন, হাস-

পাতালে কত রোগীকে যে মরতে দেখেছেন তারও কোন হিসাব নেই। কিন্তু বাবাকে দেখে মনে হল তাঁর জীবনেও এই যেন প্রথম শোক। বাবা সময়মত নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিলেন। রোগীদের চিকিৎসায় ত্রুটি হতে লাগল। যে নার্সিং হোম তাঁর নিজের হাতে গড়া, তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র, সেখানেও তিনি আর নিয়মিত যান না। অনেক রোগীই তাঁকে ডেকে পায় না। আগে বিনা ভিজিটে তিনি চিকিৎসা করেছেন এখন ভিজিট নিয়েও যথোচিত চিকিৎসা করেন বলে আমার মনে হয় না। আমার আশঙ্কা হতে লাগল মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সুনামটুকু মুছে দিয়ে যাবেন। আমি আবার আমার মাকে হিংসা করতে শুরু করলাম। আমার লোকান্তরিতা মাকে। যিনি জীবিত না থেকেও বাবার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, দিনের পর দিন তাঁকে অকর্মণ্যতার দিকে টেনে নিচ্ছেন। বাবা ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না। নিরীশ্বরবাদী না হলেও অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। ধর্ম আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তিনি কখনো মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর তিনি হঠাৎ ধর্মচর্চার দিকে ঝুঁকলেন। কারো কাছে দীক্ষা নিলেন না, জপতপের দিকেও গেলেন না। শুধু ওঁর পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তন হল। ওঁর টেবিলে সেই প্রথম দেখলাম গীতা উপনিষদ গ্রন্থাবলী রামকৃষ্ণ কথামৃত। বুঝতে পারলাম বাবা অধ্যাত্মচর্চার সাহায্যে নিজের শোককে সংযত করতে চান। এমন কিছু তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন যার সন্ধান তিনি আগে করেননি।

বাবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দিলেন। শুধু দুজন একজন বন্ধু তাঁর রইল। তাঁরা যাতায়াত ছাড়লেন না। তাঁদের মধ্যে একজন ত্রিদিব সেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কাজ করেন। তিনি আমার বাবার বন্ধু। অল্পবয়সে তাঁর সঙ্গে আমি বন্ধু বন্ধু খেলা খেলেছি। এখন বলছি খেলা, তখন কিন্তু খেলা ছিল না। তাঁর কাছে আমি চিঠি লিখতাম, ফোনে কথা বলতাম। অনেক দূরে তিনি থাকতেন। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। সপ্তাহে অন্তত দু-দিন আমাদের বাড়িতে আসতেন। যেদিনই আসতেন আমার জন্যে বই নিয়ে আসতেন। বাবা মা দুজনেই তাঁকে ঠাট্টা করতেন।

বাবা বলতেন, 'ত্রিদিব, তুমি যে কার টানে আসো আমি জানি। আমি আর তো তোমার বন্ধু নই। আমার মেয়ে সেই আসন দখল করে নিয়েছে।'

তিনি বলতেন, 'তার মানে আমার পদের অবনতি হল।'

আমি বাধা দিয়ে বলতাম, 'কেন, আমি বুঝি উঁচুতে উঠে আসতে পারিনে?'

বাবা বলতেন, 'তোর তাহলে কতগুলি ডবল প্রমোশন দরকার?'

আমি জবাব দিতাম, 'তুমি হিসেব কর বসে বসে।'

দীপঙ্করের সঙ্গে যখন আমার ঘনিষ্ঠতা হল, তখন বাবার সেই বন্ধুরা সরে যেতে লাগলেন। আশ্চর্য, ত্রিদিববাবু গেলেন সবচেয়ে আগে। তিনি যে গেলেন তা আমার চোখেই পড়ল না। তাঁর সেই চলে যাওয়াটাকে গুরুতর কোন ঘটনা বলেও মনে হল না। এই ঔদাসীন্যের কোন জবাবদিহি নেই। বিয়ের সময় আমরা গোত্রান্তরিতা হই একবার। কিন্তু পাত্রান্তরিতা জীবনে যে কতবার হই তা কে বসে বসে গুণতে যায়?

মায়ের রোগশয্যায় সেই ত্রিদিববাবু আবার এলেন। মৃত্যুর পরেও গেলেন না। দীপঙ্কর যে এসেছিল চলেও গেছে সে-খবর তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু কোনদিন কৌতূহল দেখাননি। আমিও নিজে থেকে যেচে তাঁকে কিছু বলতে যাইনি।

আবার যখন তিনি এলেন আমি মনে মনে বিরক্ত হলাম। আমার আশঙ্কা হল তিনি বুঝি আবার সেই আসনটিতে বসতে এসেছেন। কিন্তু সেই চেয়ারসুদ্ধ যে লোপাট হয়েছে, হাতল ভেঙে পা ভেঙে কোথায় যে বাতিল জিনিসপত্র রাখার ঘরে পড়ে আছে সে খবর তো তিনি আর জানেন না।

তিনি আমার গোপন ভ্রূকুটি দেখতে পেয়েছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু দেখলাম সেই চেয়ারখানির খোঁজখবর তিনি আর করলেন না, তিনি তাঁর পুরনো বন্ধুর সামনের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার প্রতি যে ভাব দেখাতে লাগলেন তা পুরোপুরি বাৎসল্য। আগে তাঁর স্নেহে এই অবিমিশ্রতা ছিল না।

তাঁর এই রূপান্তরে আমি খুশিই হলাম।

বললাম, 'আপনি অনেক বদলে গেছেন।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে।'

আমি বললাম, 'এ তো বাইরের পরিবর্তন। চুলে কলপ দিয়ে নিলেই পারেন। দাঁত বাঁধিয়ে নিলেই হয়।'

তিনি বললেন, 'তাতে সব ঢাকা পড়ে ?'

আমি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললাম, 'আপনাকে আজকাল বড্ড বুড়ো বুড়ো লাগে। হঠাৎ এমন বুড়ো হয়ে গেলেন কি করে ?'

আগে বুড়ো কথাটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এখন দেখলাম শব্দটি তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর আনল না। বরং তিনি একটু হেসে বললেন, 'বুড়ো অনেক আগেই হয়েছি। কিন্তু সেই বার্ধক্যকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম না।'

'এখন পারছেন ?'

'চেষ্টা করছি।'

বললাম, 'অন্য কাজকর্ম ফেলে হঠাৎ এমন কঠিন চেষ্টায় নামলেন কেন ?'

তিনি স্মিতমুখে বললেন, 'তোমাকে আর একদিন বলব।'

আমাদের বাড়িতে যেমন অঘটন ঘটেছে, যতদূর জানি ওঁর পরিবারে তেমন কিছু ঘটেনি। স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবাই ওঁর আছে। কিন্তু তাঁদের কথা তিনি উল্লেখ করতেন না, আমিও করিনি। তিনি একই সঙ্গে আমাদের পারিবারিক বন্ধু আবার আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু আমি একান্ত ভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু, পবিবারগত কেউ নই। ওঁর পরিবার পরিজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কিছু-মাত্র আগ্রহও আমি কখনো বোধ করিনি।

ত্রিদিববাবু শুধু পিতৃবন্ধু হয়েই রইলেন না, বন্ধুজনোচিত কাজও করে যেতে লাগলেন। বাবাকে তিনি সঙ্গ দেন, তাঁর সঙ্গে দর্শন ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ইদানীং এই দুটি বিষয়ে বাবার দারুন আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। আরো দু-একটি বিষয়ে দুই বন্ধুর উৎসাহ লক্ষ্য করি—ওঁরা দুজনেই আমার বিয়ের সম্বন্ধ দেখবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

বাবাকে বললাম, 'কেন ওসবের মধ্যে যাচ্ছ ? আমি বিয়ে করব না।'
বাবা বললেন, 'কেন ? এতদিন তো পড়াশোনার দোহাই দিচ্ছিলি। এখন তো এম এ পাশ করে গেছিস। এখন আর আপত্তি কিসের ?'
আপত্তির কারণ যেন বাবার অজানা। যেন আমার জীবনে কোন কিছু ঘটেনি। সেই অঘটনের পরেও বিয়েতে রুচি থাকা যেন আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক। আমাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত থেকে দীপঙ্করের নাম বাবা রবার দিয়ে ঘষে তুলে ফেলেছেন। কিন্তু আমি ওই ভাবে মুছে ফেলি কি করে ?
আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লাম। বললাম, 'এত বড় বাড়িতে তো আর অন্য কেউ নেই। তোমাকে কে দেখশোনা করবে বল ? তুমি কি আমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারবে ?'
বাবা বললেন, 'আমার ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব কলি, কিন্তু তোমার বিয়ে না হলে আমি শান্তি পাব না।'
যেন শান্তিটা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আমার ওতে কোন আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই।
আমি ভাবি মানুষের কী পরিবর্তন। বাবার সেই একাধিপত্যের স্পৃহা কোথায় গেল। দীপঙ্কর যেভাবে তাঁর দু চক্ষের শূল হয়ে উঠেছিল তাতে আমার মনে হত প্রাণ ধরে তিনি আমাকে আর কারো হাতে দিতে পারবেন না। এখন দেখছি আর কারো হাতে আমাকে গছিয়ে না দিয়ে তাঁর পক্ষে নিশ্বাস নেওয়া কঠিন।
বাবার বন্ধুরও সেই দশা, ত্রিদিববাবুও আমাকে অনবরত বুঝাচ্ছেন, 'বিয়ে কর কলি—বিয়ে কর কলি।'
আমি হেসে বলি, 'আপনি সত্যিই বুড়ো হয়েছেন।'
তিনি বললেন, 'কী রকম ?'
বললাম, 'বিয়ে ছাড়া যে সংসারে আরো অনেক কিছু করবার আছে তা আপনারা ভাবতেই পারলেন না।'
তিনি বললেন, 'বিয়ে করবার পরেও সেসব কাজ করা যায়।'
তারপর বিয়ের স্বপক্ষে যে সব যুক্তি আছে তিনি সেগুলি কখনো একে একে কখনো ঝাঁকে ঝাঁকে উপস্থিত করতে লাগলেন।

হঠাৎ আমি তাঁকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনি কি ভাবেন একজনকে ভালবেসে পরে আবার আর একজনকে ভালবাসা যায় ?'

তিনি বললেন, 'যায় বইকি। জীবনে ভালবাসা বহুবার আসে বহুবার যায়। থাকে শুধু স্মৃতি। সেই স্মৃতিও নিত্য পলাতকা। সুতো দিয়ে সেই রঙীন ঘুড়িগুলিকে টেনে আনতে হয়। অমনিতে আসে না। মনে রাখবার জন্যে কত স্মারক চিহ্ন কত চিঠি-পত্র, আর অ্যালব্যাম ভরা ফোটো আংটি ঘড়ি কলমের মত প্রীতি উপহার। কিন্তু তাতেও কি মনে পড়ে ? আমরা এক-জনের দেওয়া কলম দিয়ে আর একজনকে প্রেমপত্র লিখি, একজনের দেওয়া আংটি আঙুলে পরে আর একজনের গলা জড়িয়ে ধরি।'

সেদিন তাঁর কথা আমি প্রসন্ন মনে নিতে পারিনি। প্রৌঢ় ভদ্র-লোককে এক নৈরাশ্যবাদী সৈনিক বলে আমার মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, যে যার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় বিশ্বসুদ্ধ জীবনকে দেখে। নিজের বিশেষ এক ধরণের অভিজ্ঞতাকে নির্বিশেষে বলে জাহির করে বেড়ায়।

আমি তো চোখের সামনে আমার বাবা মাকেও দেখেছি। তাঁদের জীবনে তো প্রেম একবারের বেশি দুবার এল না। ডেকে আনবার দরকারই হল না। বাবা যদি একজনের স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন আমিই বা পারব না কেন ? তাঁদের মিলিত জীবন ব্যাপ্তিতে বড়, প্রাপ্তিতে গভীরতর—সেই তুলনায় আমি না হয় খুবই ছোট পরিসরের মধ্যে আমার ভাল-বাসাকে পেয়েছি, আমার জীবনে না হয় স্মৃতির ভাগই অতি দীর্ঘ হয়ে থাকবে। বাবা মার তুলনায় অনুপাতটা আমার না হয় উল্টোই হল, তাতে কী এসে যায়। গণিতের হিসাবই কি জীবনে সবচেয়ে বড় হিসাব ?

কিন্তু আমার হিসাবেরও গরমিল হয়ে গেল। বাবার আরও একটা মাইল্ড স্ট্রোক হল। তবে এ যাত্রাও তিনি কোন রকমে সামলে উঠলেন। কিন্তু শরীর আর সারল না।

আমি বললাম, 'বাবা চল, আমরা বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে

আসি।' মায়ের মৃত্যুর পর বাবা কোথাও আর বেরোননি। আমি জানি কেন বেরোননি, চেঞ্জে যাওয়ার উৎসাহ মারই সবচেয়ে বেশি ছিল। তিনিই সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করতেন। মেডিকেল কমফারেন্স-গুলি ছাড়া জীবনে মাকে ছাড়া বাবা কোথাও যাননি। আজ যাবেন এ কথা কল্পনা করাও যেন তাঁর পক্ষে দুঃসহ।

বাবা বললেন, 'এখন বড় রকম চেঞ্জের ব্যবস্থাই বোধহয় হবে। কিন্তু তার আগে তোর একটা ব্যবস্থা হয়েছে দেখে যেতে পারলে শান্তি পেতাম।'

বাবার শীর্ণ রোগক্লান্ত শরীর, করুণ মুখচ্ছবি, সেই সন্ধ্যার বিষণ্ণ-তাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিল। আমি ছোট মেয়ের মত তাঁর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে অস্ফুট স্বরে বললাম, 'তুমি যাতে শান্তি পাও বাবা তাই কর। তুমি যাতে খুশি হও—'

বাবা বললেন, 'আমি আশীর্বাদ করছি কলি, তুইও সুখী হবি। আজ বুঝতে পারছিসনে, কিন্তু দুদিন বাদে নিশ্চয়ই পারবি। আমি যা করছি তোর ভালর জন্যই করছি।'

বাবার সদিচ্ছা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সন্দেহ ছিল এমন অনাগ্রহ অনাসক্তি নিয়ে বিয়ে করে জীবনে আমি কি কাউকে সুখী করতে পারব? যদি না পারি, যার কাছে যাব, তার জীবনও তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাতে কি আমার কোন অধিকার আছে?

ত্রিদিববাবুকে বললাম কথাটা। তিনি বাবারও বন্ধু, আমারও বন্ধু। তাঁর কথাবার্তার ধরণ যেমনই হোক, বাবার মত তিনিও যে আমার হিতৈষী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তিনি বললেন, 'ভেব না। বিয়ের আগে অনেক ছেলেমেয়ের জীবনেই ও ধরণের ঘটনা ঘটে। আবার তারা ভুলেও যায়। কেউ দু'বছরে ভোলে কেউ পাঁচ বছরে ভোলে। আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা সুখী হওয়া। যা পেয়েছি তাই নিয়ে সুখে থাকা। সুখী তুমি না হয়েই পারবে না কলি।'

ত্রিদিববাবু সুখের যে নেতিবাচক ব্যাখ্যা করলেন তা আমার মনঃপূত হল না। উপায়ান্তর না থাকার নামে যে সুখ তাকে কি

যথার্থ সুখ বলা যায় ? বহু দুঃখ কষ্ট ত্যাগ স্বীকারের ভিতর দিয়ে যে সুখকে আমরা নির্বাচন করি, অর্জন করি, সেই সুখ স্থায়ী যদি না-ও হয়, তাতেই আমাদের আত্মগৌরব।

অন্য কাউকে বিয়ে করার আগে তবু আমি আর একবার দীপঙ্করের সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।
দীপু আমার কোন চিঠির জবাব দেয়নি। কোন সংশ্রব আমার সঙ্গে রাখেনি। তবু আমি ভেবেছিলাম, দীপু যদি রাজি হয় আমি ওকেই বিয়ে করব। কিন্তু সুশান্তদা আমাকে জানাল দীপু ইংল্যান্ড ত্যাগ করে ইটালীতে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। ঢুকেছে ফিল্মলাইনে। সেখানে বিদেশিনী অভিনেত্রীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বলে সুশান্তদা খবর পেয়েছে।
শুনে আমার যে খুব একটা রাগ হল, দুঃখ হল তা নয়। ধীরে ধীরে দীপুর মূর্তি আমার মনের পটে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। তার আচার-আচরণ, বিদেশে তার ওইসব কীর্তি-কাহিনী শোনার পরেও আমি যে তাকে বিয়ে করার সংকল্প করেছিলাম, ভেবে দেখলাম তা যতটা নিজের কাছে এবং আর পাঁচজনের কাছে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে, ততটা তাকে ভালবাসার জন্যে নয়। আমি যাকে ভালবেসেছিলাম সে যে আর এক দীপু। যে অনিন্দ্য-সুন্দর রূপময় পুরুষ আমার হৃদয়-সিংহাসন উদ্ভাসিত করে বসে আছে তার সঙ্গে এই উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী যুবকের তো কোন মিল নেই। আমার মনে হল এখনকার দীপুকে দেখে আমি হয়তো চিনতেই পারব না। দীপু এসে যদি আমার হাতখানা টেনে নিতে চায় আমি সভয়ে হাত সরিয়ে নেব। পানিগ্রহণ কিছুতেই সুসম্পন্ন হবে না।
বিয়েতে রাজি হওয়ার পর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কি রকমের ছেলে পছন্দ ?'
পছন্দ ! আমার পছন্দের কথা কি আর বাবা জানতেন না ! এখন আর সেকথা তুলে লাভ কি ? আমি তাঁকে জানালাম আমার নিজের কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। বাবা যাঁকে ভাল বুঝবেন

তাঁকেই তিনি জামাই করে নেবেন।
আমার নিস্পৃহতা আর বৈরাগ্যে বাবা হয়তো দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। কিন্তু ত্রিদিববাবু পাশ থেকে তাঁকে সমানে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, 'কিচ্ছু ভেব না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'
তারপর অনেক পাত্রের সঙ্গে ওঁরা যোগাযোগ করলেন। কুল শীল বৃত্তি আকৃতি প্রকৃতি সবদিক মিলিয়ে দেখতে গিয়ে প্রথম নির্বাচনেই অনেকে বাদ পড়ল।
আমি দেখতে ভাল। ফিলজফিতে একটা এম এ ডিগ্রী আছে। বাবা তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়েতে প্রায় যথাসর্বস্ব ব্যয় করতে প্রস্তুত। তাঁর বাছাবাছি করবার অধিকার আছে, ক্ষমতাও আছে। আমার বিয়ের ব্যাপারে দুই প্রৌঢ়ের উৎসাহ উদ্যম দেখে আমি অবাক হলাম। একজন হৃতস্বাস্থ্য, আর একজন হৃতলাবণ্য। বাবার চেয়ে ত্রিদিববাবুর বার্ধক্যটাই আমার বেশি চোখে পড়ত। কারণ, বহুদিন পর্যন্ত তাঁর দেহের বয়স আমার চোখের আড়ালে ছিল। দীপঙ্করকে দেখার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাঁকেই যৌবনের প্রতিনিধি বলে মনে করতাম। হঠাৎ যেন তাঁর ছদ্মবেশ খুলে পড়েছে। তাই কি তিনি এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন ? নিজের জীবনে আর কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই বলেই কি তিনি ঘটকগিরি বেছে নিয়েছেন ?
বাবাকে আমি কয়েকটি শর্ত দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'তুমি ছেলেকে কি তার বাবাকে পণযৌতুক দিতে পারবে না। বিয়েতে জাঁকজমক করতে পারবে না, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া কেউ যেন নিমন্ত্রিত না হন। আমাকে যেন বারবার বহুজনের কাছে ইন্টারভিউর জন্যে না ডাকা হয়। আমি শুধু একবার একজনকেই দর্শন দেব।'
বাবা আমার সব শর্তই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের বেলায় কোন কথাই রাখতে পারেননি। আমার মামাবাড়ির দিক থেকে চাপ ছিল। আমার কাকারা কাকীমারা তাঁকে অন্যরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন।
বাবার মনে মনে ইচ্ছা ছিল একজন খ্যাতিমান, অন্তত ভবিষ্যৎ

প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কৃতবিদ্য ডাক্তার যুবককে তিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র এবং তরুণ সহকর্মীদের মধ্যে কারো কারো আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যিনি নির্বাচিত হলেন তিনি ডাক্তার নন, ভূতত্ত্ববিদ।
দীপঙ্করের কথা মনে রেখে বাবা রূপবান জামাতার খোঁজও করেছিলেন। কিন্তু যিনি নির্বাচিত হলেন, তিনি উন্নতদর্শন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। তবে রূপবান নন। তাঁর রং কালো, মাথায় চুলের স্বল্পতা, নাকের গড়নে খুঁৎ আছে, ঠোঁট পুরু। তবু তাঁরও একধরণের রূপ আছে। সেরূপ আত্মপ্রত্যয়শীল উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের।
বাবা আর ত্রিদিববাবু দুজনেই ওঁকে খুব পছন্দ করেছেন। এত অল্পবয়সে অমন ধীর স্থির গম্ভীর স্বভাবের ছেলে নাকি তাঁরা আর দেখেননি। আমার রুচির কথা ভেবেই নাকি তাঁরা এই পছন্দ করেছেন। কারণ ছেলেবেলা থেকে আমিও তো বয়সের তুলনায় পাকা। ছেলেই হোক মেয়েই হোক আমার সমবয়সীরা আমার কাছে শিশু। বিদ্যায় বুদ্ধিতে অভিজ্ঞতায় বয়স্কদেরই আমি আমার বন্ধুর আসন দিয়েছি। সেই অসমবয়সীরাই আমার সমকক্ষ।
প্রথম দেখা সাক্ষাতেই আমার মনে হল এই ভদ্রলোক আকারে প্রকারে দীপঙ্করের একেবারে বিপরীত। প্রথম দর্শনে প্রেম এর সঙ্গে হয় না। কিন্তু চোখের দেখাই যে একমাত্র দেখা নয়, প্রথম দেখাই যে চূড়ান্ত দেখা নয়, সে অভিজ্ঞতা তো আমার জীবনে ইতিমধ্যেই হয়েছে। নিজের মোহরঞ্জিত চোখের চেয়ে পুরু চশমা পরা অভিজ্ঞ অভিভাবকদের চোখের ওপর নির্ভর করাই নিরাপদ।
বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তোর পছন্দ হয়েছে তো?'
আমি পছন্দ অপছন্দের বাইরে দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ বাবা।'
তারপর কেনাকাটা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের পালা চলল। বাবাকে সাহায্য করার জন্যে কাকীমারা এলেন, মামীমারা এলেন, মাসীমারা এলেন—শুধু যে 'মা' শব্দটির আগে আর কোন বিশেষণ নেই, আর কোন বিশেষণের দরকার হয় না, সেই একাক্ষরা আর ফিরে

এলেন না।
মায়ের ছোট ফটোকে এনলার্জ করে বাঁধিয়ে বাবার শোবার ঘরের মাঝের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি। সোনালী রঙের ফ্রেমে নিত্য আমি ফুলের মালা পরিয়ে দিই। বাবাও লুকিয়ে লুকিয়ে দিনে একবার করে সেই প্রতিকৃতির সামনে এসে দাঁড়ান। একবার না বহুবার। তাঁর স্বর্ণসীতা রূপলাবন্যের দিক থেকে নয়, স্বভাবের দিক থেকে।
মায়ের রূপের অভাব আমারও চোখে পড়েনি, বাবার কোনদিন চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। আমি ভাবি আমাদের বহু সম্পর্কের ক্ষেত্রে—বহু কেন একটি বাদে সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই রূপের ভূমিকা গৌণ। আমরা বাবা মায়ের রূপ নিয়ে মাথা ঘামাই না, রূপ না থাকলেও ছেলে মেয়ে আমাদের প্রাণের পুতুল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব যাঁদের আমরা ভালবাসি, যাঁদের ভালবাসা পেয়ে ধন্য হই, তাঁদের রূপ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে রূপের পিপাসা আমাদের অফুরন্ত, রূপের আধিপত্য সেখানে সীমাহীন, রূপই রাজরাজেশ্বর।
যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হবে একটি খাতায় তাঁদের নামের তালিকা তৈরি হল। সে তালিকা রোজই কিছু না কিছু করে বাড়ে।
বাবাকে যেন নেশায় পেয়েছে। তাঁর রোগী দেখা নেই, নার্সিং হোমে যাওয়া নেই, নিমন্ত্রণের চিঠি ব্যাগে ভর্তি করে তিনি সারা কলকাতা ছুটোছুটি ক'রে বেড়ান। কখনো আত্মীয় কুটুম্বদের কেউ তাঁর সঙ্গে থাকে, কখনো ত্রিদিববাবু সঙ্গে থাকেন, কোন কোন দিন তিনি আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যান।
আমি বললাম, 'বাবা, এ তুমি করছ কী? শত্রু-মিত্র কাউকেই বাকি রাখবে না?'
বাবা হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছিস। শত্রুতা আমার কারো সঙ্গেই নেই। তবে যাদের সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হয়েছিল, বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি হাতে তাদের সামনে যখন গিয়ে দাঁড়াই, হেসে বলি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর ভাই, দেখি, মন থেকে মালিন্যটুকু কোথায় চলে গেছে। তারাও এগিয়ে এসে কেউ বা আমার হাত

ধরে, কেউ বা বুকে জড়িয়ে ধরে।

বাবা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'যাদের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, যে সব সম্পর্ককে মনে হয়েছিল মৃত, মূর্ছিত, অসাড়, —দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন আবার নড়ে চড়ে উঠল। কোন কোন সময় মনে হয় দর্শন মাত্রেই সন্দর্শন। যেতে যেতে আমি ভাবি কত রকমের কত সম্পর্কের সুতোয় আমরা জড়িয়ে আছি। কোন সম্পর্ক গভীর, কোন সম্পর্ক অতি গভীর, কোন সম্পর্ক একেবারেই ফর্মাল। তবু ভাবতে ভাল লাগে যে আমি সবাইর সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে সম্পৃক্ত। অসম্পৃক্ত নই।'

মায়ের কথা আমি তুলিনে। ভাবি, বাবাকে মনে করিয়ে দিলে তিনি দুঃখ পাবেন। বাবাও হয়তো সেই কথা ভেবে চুপ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি ঠিক জানি, গাড়িতে পাশাপাশি বসে কথা বলতে বলতে আমরা যখন হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে যেতাম, আমরা দুজনে একই সঙ্গে আমাদের সেই তৃতীয়জনের কথা ভাবতাম। যিনি উপস্থিত না থেকেও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতাম। মাঝে মাঝে আমার মনে হত আমি আর আমার মা একাত্ম হয়ে গেছি। যে আসনে মায়ের বসবার কথা আমি সেই আসনে বসেছি। একই সঙ্গে আমার যেন দ্বৈত ভূমিকা। জায়ার আর দুহিতার।

বাবা একদিন বললেন, 'রামজীবনবাবুকে নিজেরাই গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসা ভাল।'

আমি বললাম, 'ছিঃ বাবা, তিনি তাতে খুব দুঃখ পাবেন।'

বাবা বললেন, 'তিনি যে প্রকৃতির মানুষ নিমন্ত্রণ না করলে আরো বেশি দুঃখ পাবেন। এত সব কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরেও তোর মার অসুখের সময় টেলিফোন করে খোঁজ খবর নিয়েছেন। নার্সিং হোমে একদিন এসেও ছিলেন। তাঁকে না বললে খুব খারাপ দেখাবে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন, 'তাছাড়া তোর তো কোন দোষ নেই। তুই তো দীপঙ্করকেই আগে অফার দিয়েছিলি। আমি তাঁকে সব জানিয়েছি। তিনি বললেন, আমার ভাগ্য। আপনাদের কারোই

কোন অপরাধ নেই।'
কিন্তু বাবা যা-ই বলুন রামজীবনবাবুর বাড়িতে আমার যাওয়ার সাহস হল না। বাবা একাই গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এলেন।

তারপর উৎসবের উদ্যোগ আয়োজন আরো কিছুদিন ধরে চলল। উৎসব তো নয় এক অতিকায় মহোৎসব। আমি সেখানে তুচ্ছ একটি উপলক্ষ মাত্র। সবাই মিলে যেন একটি রক্ত-মাংসের পুতুলের বিয়ে নিয়ে মেতে উঠেছেন। পুতুলের নিজের কিছু করবার বলবার নেই। তার চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না, কান আছে শুনতে পায় না, জিভ আছে কথা বলতে পারে না। কিন্তু হৃদয় বলে যে একটি বস্তু আছে তা তো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। তার অতিমাত্রায় সচেতনতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে সে যে সদা জাগ্রত রয়েছে সেই তো হয়েছে পরম জ্বালা।
কিছুদিন ধরেই আমি ভাবছিলাম আমার পুরনো ডায়েরিগুলি চিঠিগুলি নিয়ে আমি কী করব। আমার মামাতো মাসতুতো বোনগুলির মধ্যে বুলার সঙ্গেই আমার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব। সে আমার সমবয়সী। কিন্তু এরই মধ্যে সে দুই ছেলের মা হয়েছে। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় তার সিনিয়রিটি আমাকে মানতেই হবে।
আমি বললাম, 'যে যা-ই বলুক, ওগুলি আমি ফেলতে পারব না, নিয়ে যাব।'
বুলা হেসে বলল, 'স্বামীকে উপহার দিবি বুঝি? তার দরকার নেই কলি, তার জন্যে অন্য প্রেজেনটেশন রেখে দিস। ওগুলি তুই আমার হাতে দে।'
বললাম, 'তুই এসব নিয়ে কী করবি?'
বুলা বলল, 'তুই নিজের হাতে যা করতে পারবিনে তাই করব। সব এক সঙ্গে জড়ো করে একটি দেশলাই কাঠি জেবলে দেব।'
বললাম, 'না বুলা, আমি তা পারব না।' তারপর বললাম, 'তার চেয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল।'
ছেলেমানুষি কোন সন্দেহ নেই। পোড়ালেও নষ্ট হবে, জলে

ভাসিয়ে দিলেও নষ্ট হবে। তবু কিছুক্ষণের জন্যে আমি যেন সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেলাম। বৃষ্টির দিনে কাগজের নৌকো নর্দমায় ভাসিয়ে দিয়ে ভাবতাম আমার হাতে গড়া আমার নাম লেখা এই নৌকো অজানা উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দেশ বিদেশের বন্দরে বন্দরে সে ঘুরে বেড়াবে। তেমনি দীপুর চিঠিগুলি রুমালে বেঁধে নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি কল্পনা করলাম — চিঠিগুলি একদিন ভূমধ্যসাগরের কূলে গিয়ে পৌঁছবে। চিঠিগুলি তো শুধু তার চিঠিই নয়, আমাকে উদ্দেশ করে লেখা প্রতিটি অক্ষর যে আমারও। আমার আদর সোহাগ আমার ভাবনা কল্পনা ওই পত্রপুটে ধরা রয়েছে। সব তার কাছে গিয়ে পৌঁছবে। সে এখন যে সমুদ্রতীরেই থাকুক না কেন, পুরীর সমুদ্র আবার তার কাছে ফিরে আসবে।

বুলা আমাকে কিছুই রাখতে দিল না। আমার পিতৃবন্ধুদের চিঠিগুলি নষ্ট করল। লেখকদের শিল্পীদের চিঠিপত্র জমিয়ে রাখা এক সময় আমার হবি ছিল—বুলা সেসবও নষ্ট করে ফেলল। অন্য কোন পুরুষের নামগন্ধ রাখা চলবে না। বৃন্দাবনে পুরুষ কেবল বংশীধারী।

বুলা বলল, 'অত মায়া করছিস কেন? ভাবের সঞ্চয় যত পড়ে থাক তীরে। এ কূলের জিনিস ওকূলে নিয়ে গেলে ভুল করবি। সে এক নতুন জন্ম, নতুন জীবন। জানিস, বিয়ের পর বাপমার ওপরও যদি একটু বেশি টান থাকে শ্বশুর বাড়িতে অশান্তি হয়। বাপের বাড়ি। গয়নাগাটি জিনিসপত্র সবই শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু ভালবাসার পাসপোর্ট মেলে না।'

আমাদের বাড়ি ছোট। সপ্তাহখানেক আগে বড় একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল বিয়ের জন্যে। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব কুটুম্বিনীতে বাড়ি ভরে উঠল। মামাবাড়ির কেউ কেউ মার কথা ভেবে চোখের জল ফেললেন। কিন্তু উৎসব অনুষ্ঠানে শোকাশ্রু মঙ্গলের নয় বলে তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেলতেও দেরি করলেন না।

বিয়ের দিন সন্ধ্যার পর সেজেগুজে ঘরের মাঝখানে আমাকে

নায়িকার ভূমিকা নিয়ে বসতে হল। চারদিকে বোন বন্ধু বউদিদের বেষ্টনী। তবু কি রকম যেন একটা নিঃসঙ্গতা আমি অনুভব করতে লাগলাম। কিসের এক অনির্দিষ্ট অশুভ আশঙ্কা আমার মনে ছায়া ফেলতে লাগল।

আমাদের আত্মীয় বন্ধুরা দলে দলে আশীর্বাদ করতে এলেন। বহু প্রীতি উপহার পেলাম। ত্রিদিববাবুকেও দেখলাম এক সময়। তিনিও শাড়ির প্যাকেট হাতে নিয়ে এসেছেন। আমি বললাম, 'শাড়ি কেন, আপনি তো বই দিতেন। আজও বই দিলেই ভাল হত।'

মৃদু হেসে বললেন, 'এর পর বই পড়বার কি আর সময় হবে?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই হবে। খেয়েছেন?'

অন্যমনস্কের মত তিনি বললেন, 'না।'

'খেয়ে যাবেন কিন্তু। না খেয়ে পালাবেন না।'

তিনি বললেন, 'খাব বই কি। মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ।'

কেন যেন শেষ কথাটুকু আমার কানে তেমন সুমিষ্ট লাগল না। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন একটু চাপা নৈরাশ্য আক্রোশ ফুটে উঠল। যদিও জানি এই আক্রোশ আর কারো বিরুদ্ধে নয়, জীবনের অলঙ্ঘনীয় অপরিহার্যতার বিরুদ্ধে।

কয়েকদিন আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। বড় ড্রয়িংরুমে ভিড় ছিল সেদিন। তাই দোতলার ছোট বসবার ঘরখানিতে আমি তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলছিলাম। কথায় কথায় আমি বললাম, 'আপনি কিন্তু আর শরীরের যত্ন নিচ্ছেন না।'

তিনি জবাব দিলেন, 'কি হবে আর শরীর দিয়ে? আমার বরং আজকাল অশরীরী হতে ইচ্ছা করে।'

আমি বললাম, 'ওরে বাবা, সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। আপনাকে দেখা যাবে না অথচ আপনি হাসবেন কথা বলবেন, আমি তাহলে ভয়েই পালাব।' তিনি বললেন, 'শরীরীকে দেখেও তো তোমরা ভয়েই পালাও। বুড়ো বয়সে শরীর তো থাকে না থাকে শরীরের একটা কার্টুন। তখন দেহ ধারণের আনন্দ চলে যায়, সহনাতীত যন্ত্রণা থাকে।'

একটু চুপ করে থেকে তিনি হেসে আবার বললেন, 'মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, দেবতার কাছে প্রার্থনা করি—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি কি দেব দেবী মানেন ?'

তিনি হেসে বললেন, 'বিপদে পড়লে মানি। আলঙ্কারিক অর্থে মানি। দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি—এক বছরের নয়, এক এক মাসের জন্যেও নয়, অন্তত একটি দিনের জন্যে শুধু তুমি আমাকে নবকলেবর দাও। কিন্তু এখনকার দেবতারা আমার মতই অশক্ত অক্ষম। এক মুহূর্তের জন্যেও পূর্ণ যৌবন দেওয়ার শক্তি তাদের নেই। আমি তাই কায়কল্পের বিকল্পের দিকে তাকিয়ে থাকি। তরুণী বান্ধবীদের স্বামীরাই আমার সেই পূর্ণযৌবন, নবকলেবর।'

আমি মনে মনে হাসলাম, শুধু স্বামীরা ? প্রণয়ীরা দোষ করল কি ?

আমার পুরনো সহপাঠিনীদের কেউ কেউ এল নিমন্ত্রণ রাখতে। তাদের মধ্যে দু-একজন এখনও কুমারী। বেশির ভাগই স্বামী সোহাগিনী। স্বামীদের নিয়েই তারা এসেছে। বলবান, স্বাস্থ্যবান দু-চারজন রূপবান পুরুষকেও দেখলাম।

তারপর এলেন রামজীবনবাবু। তিনি এখন বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ। কিন্তু কি সাজটাই না সেজেছেন। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি থেকে আতরের গন্ধ ভরভুর করছে, গলায় কোঁচানো চাদর, পরণে মিহি ধুতি। চুলগুলি সব সাদা। যেন মাথায় রুপোলি টোপর পরেছেন। মুখের মধ্যে দুপাটি বাঁধানো দাঁতও ঝকঝক করছে।

রামবাবু ভিড় ঠেলে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'কই, আমার নাতবউ কই ?'

মুহূর্তের জন্যে আমার ঝুমকো-পরা কান দুটি লাল হয়ে উঠল। বুক টিপটিপ করতে লাগল। তিনি নাতবউ কেন বললেন ? নাতনী বলাই তো শোভন ও স্বাভাবিক ছিল।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন, 'থাক থাক।'

তারপর পকেট থেকে বড় একটি কৌটা বের করলেন। তার ভিতর

থেকে বেরলো এক ছড়া মুক্তার মালা। সেই মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। মাল্যদানের পর দুটি আঙুল তিনি আমার থুতনীর নিচে দিয়ে আমার মুখখানা উঁচু করে হেসে বললেন, 'বাঃ, সুন্দর মানিয়েছে, একেবারে দিব্যাঙ্গনা।'

তাঁর সেই স্পর্শে আমার গা শিরশির করে উঠল। সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মধ্যে আমি তাঁর পৌত্রকে দেখতে পেলাম। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হল বৃদ্ধের খোলস খুলে পড়েছে। তার পরিবর্তে যৌবনধন্য সেই অপরূপ রূপময় মূর্তি আমার সামনে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি কি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম? নইলে আমার পাশে যারা ছিল তারা আমাকে অমন করে জড়িয়ে ধরল কেন?

বুলার গলা কানে এল, 'তোর কি শরীর খারাপ লাগছে? তোকে কি শুইয়ে দেব? একটু রেস্ট নিবি কলি?'

আমি তখন মাথা সোজা করে বসেছি। প্রবল ভাবে আমি দুর্বলতার কথা অসুস্থতার কথা অস্বীকার করলাম, 'না না, আমি বেশ ভাল আছি।'

লগ্ন শেষরাত্রে। রামজীবনবাবু চলে যাওযার পর আরো কত আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব এসে আমাকে আশীর্বাদ করে যেতে লাগলেন। প্রত্যেকের হাতে প্রীতি উপহার মুখে স্মিতহাসি। আমিও সবাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলাম, হাত পেতে তাঁদের আশীর্বাদ উপহার নিলাম।

তারপর ভিড় কমতে লাগল। ছাদের উপর নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানকার কোলাহল থেমে গেল।

বিবাহ সভা বসেছে উঠানে। আমাকে নিয়ে যাওয়ার আগে পুরোহিত প্রাথমিক কাজ শেষ করলেন।

তারপর এক সময় ডাক এল—কনেকে নিয়ে আসুন। অনুষ্ঠান সভায় যাওয়ার আগে একে একে গুরুজনদের আমি প্রণাম করলাম। এত প্রণাম জীবনে আর কখনো করিনি। বিজয়া দশমীর দিনেও না। বাবাকে প্রণাম করলাম সবচেয়ে শেষে। জীবনে তাঁকে আমি খুব বেশি প্রণাম করিনি। বলেছি, 'তোমার সঙ্গে আবার অত

ফর্মালিটি কিসের ? মা কি তোমাকে প্রণাম করবে।'
প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে বুকে চেপে ধরলেন। মনে হল তিনি যেন আমাকে আর ছেড়ে দেবেন না। যদি না ছাড়েন তাহলেই যেন সবচেয়ে ভাল হয়।
বাবা বললেন, 'এবার তোর মায়ের ঘরে একটু চল।'
এ বাড়িতে আবার মায়ের ঘর কোথায় ? বাবা কি ভুল করছেন ?
না, আমিই ভুলে গিয়েছিলাম, বাবার ভুল হয়নি। মায়ের সেই বড় ফটোখানা তিনি এই অস্থায়ী বিয়েবাড়িতেও নিয়ে এসেছেন। এনে টাঙিয়েছেন আলাদা একখানি ঘরে। কে কি ভাববে, আড়ালে মুখ টিপে হাসবে কিনা পরোয়া করেননি। সেই ফটোর সামনে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন। আবার আমরা তিনজনে এক জায়গায় হলাম।
বাবা বললেন, 'মিলি, ওকে তুমি আশীর্বাদ কর।'
আমি সেই ফটোর নিচে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বললাম, 'মা, আমি যেন তোমার মত হতে পারি। তুমি যেমন বাবাকে সুখী করেছ আমিও যেন আমার স্বামীকে তেমনই সুখী করতে পারি। রূপ-কথার সেই রূপসরোবরে ডুব দিয়ে উঠে আমি যেন নতুন রূপ নতুন জন্ম গ্রহণ করি। তিনি আমার প্রথম, আমি যেন তাঁর প্রথমা হই। তিনি আমার একতম, আমি যেন তার একতমা হই। তিনি আমার প্রিয়তম, আমি যেন তাঁর প্রিয়তমা হই। মা, আমি যেন তোমার মত ভাগ্যবতী হই।'
খুব সেকেলে লাগছে, তাই না ? আমার পরণে তখন টুকটুকে লাল বেনারসী, গা-ভরা গয়না, মন ভরা আবেগ। সেকালের না একালের আমি যে কোন্ যুগের মেয়ে তা আমি ভুলে গেছি।
আমার মেশো কাকা আমাকে সস্নেহে হাতে ধরে অধীর প্রতীক্ষায় ভরা বিবাহ সভায় নিয়ে চললেন।

লেখকমশাই, এবার আমার থামতে ইচ্ছা করছে। এবার আপনি লিখুন। বিধাতা আমাকে নিয়ে কি খেলা খেলেছেন সেই খেলার রিলে আপনাকে যদি না শোনাই আপনি কি বানিয়ে বানিয়ে

লিখতে পারবেন না? আপনিও তো দ্বিতীয় বিধাতা। আপনি কেন আর এক বিধাতার পায়ে পায়ে হাঁটবেন? আপনি আমাকে যতটুকু চিনেছেন, বাস্তবে কল্পনায় যতখানি জেনেছেন, তার ভিত্তিতে আপনার হাতে আমার কোন্ মূর্তি গড়ে ওঠে আমার দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

আপনি হাত দেখতে জানেন না, তবু আমার বাঁ-হাতখানা তুলে নিয়ে খেলাচ্ছলে আমার অতীত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথাই না বলেছেন। সব মেলেনি, সব মিলবেও না। তবু শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে আপনি যার কথা বলছেন সেও আমি, সেও আমি।

তেমনি আপনার তীব্র অনুভব শক্তি দিয়ে, তীব্র কল্পনা দিয়ে, আপনার অতি তীব্র আসক্তি আব আবেগ দিয়ে আপনি যার কথা লিখবেন, পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই আমার মনে হবে—সেই আমিই একমাত্র আমি।

আপনার বর্ণিত সেই অবর্ণনীয়াকে আমি দেখতে চাই।

কিন্তু আপনি কি আমাকে ততখানি ভালবেসেছেন?

আমি আপনার প্রথমা নই, একতমাও নই, শেষতমাও নই, অন্যতমা মাত্র।

আপনি অবশ্য কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন—সব প্রেমই জীবনে প্রথম প্রেম।

আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? আপনি কি সত্যিই তা বিশ্বাস করেন? এ কি কথার কথা নাকি সত্যি কথা? জীবনের এক অভিজ্ঞতা যদি আর এক অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে না দেয় সে কি এক ধরণের অকৃতজ্ঞতা নয়? জানিনে, সেই স্মৃতিভ্রংশতা আশীর্বাদ না অভিশাপ।

আমার সব প্রেমই প্রথম প্রেম নয়। কিন্তু প্রথম প্রেমকে বারবার মনে করিয়ে দেয়। আমি তুলনা করি, আমার অনুভূতির যন্ত্রে তারতম্য নিরূপণের চেষ্টা করি। এক হিসেবে সবই এক। ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সবই একাকার। তবু এক নয়।

বলব না বলব না করেও অনেক কথা বলে ফেললাম।